তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ অঙ্কন :
গৌতম্ রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

বারো টাকা

শ্রীবিকাশ বসু
প্রীতিনিলয়েষু

এই লেখকের :

বহুরূপে দেবতা তুমি

সম্মোহন

অবিশ্বাস্য

কে ডাকে আমায়

নীলসায়রে

জীবনের ওপার থেকে

আজও যা ঘটে

অজানার আঙিনায়

জন্মান্তর রহস্য

সর্বে চ পশবঃ সন্তি তলবদ্ ভূতলে নরাঃ।
তেষাং জ্ঞান-প্রকাশায়ঃ বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ।
বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ।

আকাশের অন্ধকার নেমেছে মাটির বুক জুড়ে। সেই অন্ধকারে চলছে তাণ্ডব-নৃত্য। হিংস্র পশুদের উন্মত্ত-উল্লাসের রাজ্যে। শুরু হয়েছে হানাহানির যন্ত্রণা। কি বীভৎস মূর্তি প্রত্যেক পশুর।

আরো ঘন অন্ধকার-কালোর দু'টি হাত এগিয়ে আসছে। রক্তজবার আভা দশ আঙুলের পর্বে পর্বে। ভয়ঙ্কর পশুরা অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। পশুরাজ্য শান্ত।

তিনদিক থেকে তিনটি আলোর রশ্মিরেখা ফুটে উঠল অন্ধকারে। শুচিশুভ্র সুন্দর আলো। এক একটি আলোর শরীরে পরিপূর্ণ রূপ পেল এক একটি রশ্মিরেখা। আলোর তিনটি মানুষ হাসছে।

মধ্যিখানের মানুষটি বলছে, মনের অন্ধকার রাজ্য প্রবৃত্তির ছায়ায় ঢাকা। সেখানে পশুর উৎপাত দিনেরাতে। বাইরের হিংস্র পশু ভেতরেই তো বাসা বেঁধে রয়েছে। নিধনযজ্ঞে বাইরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু ভেতরের হাত থেকে উদ্ধার পেতে গেলে দস্তর মতন শক্তির প্রয়োজন। সংযত শক্তি। বিবেকযুক্ত শক্তি। শক্তি লাভ করতে না পারলে সর্বনাশা কাম-ক্রোধ-লোভের প্রবল পশুপ্রভাব থেকে মুক্তি নেই।

ডানপাশের আলোর মানুষ বলে উঠল, আছে। সৎবুদ্ধি সহায় হলে। বাঁদিক থেকেও ভেসে এলো কথা, সমস্ত কিছু পরাজয় করার বীরভাব মনে জেগে উঠলে, নিশ্চিত অসাধ্য সাধন হবে। তখন বীরভাবের মনই দেবভাবের সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে ফেলে নির্দ্বিধায় উঠতে থাকবে ওপরে। ওপরে, আরো ওপরে।

কে এরা এই তিনটি আলোর মানুষ?

প্রথমটি বিবেক, দ্বিতীয়টি সৎবুদ্ধি, তৃতীয়টি দেবভাবে ভাবিত মন। পশুভাবের, ভূতগ্রস্ত মানুষের এরাই মুক্তির প্রধান সম্বল। এরাই মানুষের ভেতরে অন্ধকার-রাজ্যে আলো। দেবীর 'বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং'

—ত্রিনয়ন—উদয় সূর্যের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রভা। আর অন্ধকারে এগিয়ে আসা—মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং—শ্যামা মায়ের পশুভাব বিনাশের দু'টি হাত—বর-অভয়।

পূজনীয়া শ্রীদেবী মাতা আর শ্রীশক্তি মাতার কাছে তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা শুনে তন্ত্র সম্বন্ধে জানার কৌতূহল আমার বেড়ে ওঠে। মাতৃকাশ্রম-প্রণবসংঘের (কালীঘাট) প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজের মুখে শুনলুম, তনু-মন নিয়েই তন্ত্র। তনু-মনের সাধনা। শরীরকে নীরোগ-সুস্থ করে তোলা। মনকে শুদ্ধ সতেজ করে।

ব্যক্তির শরীর মন তৈরী হলে, সমাজ-জাতির শরীর-মনও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিজে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেলে, মানুষ নিজের মধ্যেই বিশ্বমনের অনুভূতি অনুভব করে। নিজের মনে সব মনের সুর বেজে ওঠে। নিজের মনের সুরে অন্য মনের বেসুরো তারকে বেঁধে নেয়া যায় অনায়াসে।

এখানে সমাজের নিম্নস্তর-উন্নতস্তরে ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন। সকলেই এক জাত। এক মন এক প্রাণ এক ধর্মের। তন্ত্র সকল ধর্মকে বুকে টেনে নিয়েছে। 'পঞ্চায়তন চক্রে' পুজো তারই প্রমাণ। সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত—পাঁচটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের দেবতা—সূর্য-গণেশ-শিব-বিষ্ণু আর শক্তির এক সঙ্গে পুজো।

তন্ত্র মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে নিখুঁতভাবে। দেখিয়েছে বার্দ্ধক্যরোধের—স্থায়ী যৌবন রক্ষার। যোগসাধনার অপূর্ব পরিচয়। কি না আছে এই রত্নসমুদ্রে? ব্যাধিলক্ষণ উপশমের ওষুধ দ্রব্যগুণ রসায়নের ব্যাপার—সব কিছু। জ্যোতিষও বাদ নেই। মানুষের নানা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অন্য মনের ইচ্ছাশক্তিকে কি ভাবে ঘোরাতে ফেরাতে পারে—অদ্ভুত প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

পরিত্যক্তজনকে সমাজে সম্মানের আসনে বসিয়ে তন্ত্র একটি সুসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছে। এখানে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ আর বারবিলাসিনী নারী বলে কোন কথা নেই। এরা দেবতার অংশ। এদের সংশোধন করে দেবভাবে গড়ে তুলতে কি না চেষ্টা।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম—প্রত্যেক কেন্দ্রভূমিতে তন্ত্রসাধনার সুবর্ণসুযোগ এসে গেছল এক সময়। সেই সুযোগের পর বেশীর ভাগ লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রিয়াকলাপের অপব্যবহারে মেতে উঠেছিল। এতে বিপদ ঘটত অনেক ক্ষেত্রে। নিজের যেমন, অন্যের পক্ষেও তেমন।

সদ্‌গুরু-যোগী অর্থাৎ তন্ত্রসাধনায় যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁরা অসৎ-মনোবৃত্তির লোকের হাত থেকে তন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য সাধনায় সাংকেতিক ভাষা (মন্ত্র) প্রতীক চিহ্ন (যন্ত্র—রেখাচিত্র) ব্যবহার আরম্ভ করে দিলেন।

বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে তন্ত্রের বই প্রায় হাজার তিনেক। কিন্তু এসব বইয়ের অনেক আবার পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, পড়ে, সাধনা বা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ দুঃসাধ্য, যতক্ষণ না সদ্‌গুরু-যোগী সাংকেতিকী আর প্রতীকী ব্যবহারের মর্ম বুঝিয়ে দেন। এই কারণে তন্ত্র এখানে সাধারণের কাছে সত্যিই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

এই রহস্যের আবরণ বহু। প্রতিটি আবরণ উন্মোচন করা দুরূহ ব্যাপার। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংসজী ও যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজের সান্নিধ্যে আবরণ উন্মোচনের সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

এঁরা সাধনপদ্ধতি সস্নেহে শিখিয়েছেন। দেশবিদেশে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে ঘুরতেও হয়েছে আমায়। অনেক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রক্রিয়া আর ঘটনার আবার সাক্ষী হয়েও আছি।

সর্বসাধারণের চোখে তন্ত্র যাতে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, আমি সেই ভাবে সাংকেতিক-প্রতীকের রহস্য ভেদ করে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়েছি আমার সুধী পাঠক-পাঠিকাদের।

তন্ত্রকে, তার ক্রিয়াকলাপকে পাঠক-পাঠিকারা দেখেছেন—ভীষণ নয়, অতি সুন্দর। ধাপে ধাপে মানুষের ইষ্ট করার নিদর্শন। মানুষ হয়ে উঠুক মঙ্গলময় আনন্দময়। শান্তির রাজ্য গড়ে তুলুক বিশ্বে—সকলে এক পরিবার হিসেবে।

তাই অহিত ক্রিয়াকলাপের রোমহর্ষক দিকটাও তুলে ধরতে দ্বিধা করিনি আমি। যাতে ভুলেও সে-পথে পা না বাড়ায় কেউ। এই ক্রিয়ায় খারাপের চেয়ে মানুষের কতখানি যে ভালো করা যায়—দুটোই পাশাপাশি দেখিয়েছি। উদ্দেশ্য—সুন্দর চির সুন্দর হয়ে উঠুক, হয়ে উঠুক মৃত্যুহীন মৃতসঞ্জীবনী। অশুভ যা কিছু—মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যাক।

যখন আশ্রমের সুধীর চৌধুরী-র উৎসাহে ও বিকাশ বসু-র তত্ত্বাবধানে উল্টোরথে আমার 'তন্ত্রকাহিনী' লেখা চলছে, তখন আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারাই সে চলার গতি ব্যাহত করতে দেন নি। তাঁদের অসংখ্য অভিনন্দনপত্র দেখা-সাক্ষাৎ কৌতূহল আমাকে আরো লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। মাসের পর মাস বছরের পর বছর লিখে গেছি আমি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক

প্রেরণার অমৃতফল সেই তন্ত্রকাহিনীই 'তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী' নামে প্রকাশিত।

বইটি দ্রুত প্রকাশের ব্যাপারে দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ যে যত্ন-পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য তাঁদের সবাইকে এবং যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাতৃকাশ্রম প্রণবসংঘ
১৫বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২৬

দূর থেকেও আগুনের তাপ লাগছে গায়ে। লকলকে শিখা আকাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। ধোঁয়া পাক খেয়ে ওপর দিকে উঠছে, ভেঙে খান্ খান্ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আবার আশে-পাশে সব জায়গায়। শিমূল-অশথের ফাঁক দিয়ে চিতার আগুন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগুনের কি ভয়ানক দাপাদাপি। শ্মশানটা বাঁড়ুজ্যেবাড়ির নিজস্ব।

চিতায় আমগাছের বড়-বড় গুঁড়ি জ্বলছে। লাল কম্বলের আসনে ভিজে লাল চেলী পরে উত্তরমুখো হয়ে বসে আছে চিতার সামনে সুখরঞ্জন। ডানদিকে গোটা সাতেক কাক নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে। সব ক'টারই দুটো পা এক করে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। মাঝে মাঝে পাখা ঝটপটের আওয়াজ হচ্ছে ওদের। বৃথা ওড়ার চেষ্টা।

পশুপক্ষীও তাদের মৃত্যুর আঁচ পায় বুঝি। কাকগুলোর অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে। ওদের নিয়ে যে একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, এটা যেন বেশ বুঝতে পারছে ওরা। খানিক তফাতে সবচেয়ে মোটা গুঁড়ির বড় আমগাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে সব পরাশর। পাছে টের পায় সুখরঞ্জন, তাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে এসেছে শ্মশানে।

মাসে একটা করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। এইটা নিয়ে তিনটেয় পড়েছে। আগের দুটোয় আসেনি এখানে। এবারে এসেছে। আসতে বাধ্য হয়েছে। আগের দু'মাসে ওই দুটো তিথিতে রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেছে বাড়িতে। কেন ঘটল কেমন করে ঘটল—কূল-কিনারা খুঁজে পায়নি কেউ। দু'দুটো নিষ্পাপ-নির্দোষ প্রাণের করুণ আর্তনাদ শুনেছে গভীর নিশীথে। ঘুমন্ত পরাশরের বুকে সজোরে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়ে কে যেন ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে বিছানায়। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছে

ভেতরে। নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যা শুনল, যা দেখল তাতে বুকের রক্ত জল হয়ে এলো তার।

একবার নয় শুধু, এরকম দু'বার হয়েছে পরাশরের। তৃতীয়বারেও যে আর একটা হবে—এটা সপ্তাহখানেক ধরেই তার মন বলে চলেছিল অবকাশ মুহূর্তে। একটা কালো ছায়াকে যেন ঘোরাফেরা করতে দেখেছে বাড়িময়। আগেকার ব্যাপারে মন খুব দুর্বল হয়ে যাওয়ার কিংবা ভয় পাওয়ার জের কি না—এটা বুঝতে চেষ্টা করেছে। ভেতর থেকে কে যেন বলেছে, যাই হোক না কেন, অতীতেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

অতীতকে রোখা যায় কেমন করে—সেই চিন্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পরাশর প্রত্যেক দিন। ত্রিপুরার এই গাঁয়ের কোন ঘর বাকি রাখেনি পরামর্শ করতে। নানা মুনির নানা মতে আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সাহস দেয়নি কেউ। বরং ভয়ই ধরিয়েছে বেশী করে অনেকে। বাড়িতে যা কাণ্ড ঘটছে, ওসব তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়ার ফল। এসব কাজের অনুসন্ধান করতে যাওয়া মানে মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ-মান-ধন—সব নিয়ে টানাটানি হতে পারে। কোন না কোন তান্ত্রিকের কোপ পড়েছে এই বংশের ওপর নিশ্চয়। তার ক্রিয়াকলাপে বাধা দিয়ে নিজের সর্বনাশকে কেউ কখনো বরণ করে ডেকে নিয়ে আসে নাকি।

যা হবার তা তো হয়েই যাচ্ছে। সর্বনাশ হতে আর বাকি কি থাকছে? তবু যেটুকু বাকি সেটুকু রক্ষে করার চেষ্টা করবে না কেন পরাশর? আহাম্মকের মতন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে না সে কিছুতেই।

নিজেকে সম্বল করে এসেছে পরাশর একাই। কাউকে সঙ্গে নেয়নি, কাউকে বলেনি পর্যন্ত। চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে নিশুতি রাতে। শ্মশানের দিকটাতেই কে যেন ঠেলে-ঠেলে পাঠিয়ে দিল তাকে। লোকমুখে শুনেছে অভিচার-ক্রিয়া বেশীরভাগ শ্মশানেই করে তান্ত্রিকরা।

যা শুনেছে সেটা সত্যিই দেখছে পরাশর। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হয়ে গেছে তার। তবে একটা জিনিস—বিস্মিতও কম হয়নি সে। বিস্মিত সুখরঞ্জনকে দেখে।

চিতায় মড়া পুড়ছে না। পুড়ছে শুধু কতকগুলো কাঠ। নির্জন-নিস্তব্ধ। দূরে কাছে নেই কেউ কোথাও। নিবিষ্ট মনে ক্রিয়া করে চলেছে সুখরঞ্জন। শিউরে উঠল পরাশর। সুখরঞ্জন মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা কাককে আহুতি দিচ্ছে আগুনে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ওদের গলা দিয়ে অদ্ভুত ধরনের বুক

কাঁপানো একটা বিকট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে কেবল। তারপর চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। জায়গাটাও যেন আগের চেয়ে আরো নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। এইভাবে সাত সাতটা কাকই আগুনের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে পরাশর।

ভেতরটা চমকে উঠছে, ধড়াস ধড়াস করে উঠছে সুখরঞ্জনের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে আর এক জনের নাম উচ্চারণ হতে। ধুঁ ধুঁ·· অমরেশ্বর···। সুখরঞ্জনের মন্ত্রের বলি এবার অমরেশ্বর!

এবারে আর কাঠ গুঁজছে না চিতায় সুখরঞ্জন। আগুন জ্বলার প্রয়োজন বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। নিভে আসছে আগুন। সুখরঞ্জন জোরে নিঃশ্বাস টানছে মুখ দিয়ে। একটা ঘূর্ণিঝড়কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন ভেতরে। এই ঝড়ের সঙ্গেও ফিস ফিস করে উঠছে মন্ত্র আর অমরেশ্বরের নাম। নিঃশ্বাস ফেলছে আবার দ্বিগুণ জোরে—দু'নাক দিয়ে। এবারেও ওই মন্ত্র, ওই নাম। চিতার আগুন নিভলো সম্পূর্ণ।

যেখানে কাক ক'টা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছল, সেখানকার ভস্ম তুলে নিল মড়ার খুলিতে। উঠে দাঁড়িয়ে ভস্ম ছড়িয়ে দিতে লাগল মন্ত্র আর নাম উচ্চারণ করে এক এক দিকে।

পরাশরের মনে হচ্ছে, এই নাম বাতাসে সাঁতার কেটে যাবে নামের মানুষের কানে। তারপর তাকে ডেকে তুলে নিয়ে আসবে সুখরঞ্জনের ইচ্ছে-মতন জায়গায়। উদ্দেশ্য-পূরণ হবে। অন্ধকার রাতে আকাশ-আলোয় দেখছে পরাশর। মরা কাকের দেহভস্ম থেকে অসংখ্য জীবন্ত কাক বেরিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কি ভয়ানক হয়ে উঠছে ওরা। সামনে কাউকে পেলে, ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে তাকে শেষ করে ফেলবে চোখের পলকে।

যেদিকে হাত নাড়ছে সুখরঞ্জন সেদিকেই কাকগুলো উড়ে চলেছে। সেই দিকে বাঁড়ুজ্যেবাড়ির ওই ঘরখানা—অমরেশ্বরের শোবার ঘর।

চমক ভাঙল, চেতনা ফিরে পেল পরাশর সুখরঞ্জনের অট্টহাসিতে। সুখরঞ্জন হাসছে প্রাণ খুলে, মন খুলে। হয়তো তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে বুঝতে পেরেছে। পরাশরের সর্বশরীর কেঁপে উঠল। দেরি করলে সমূহ বিপদ। অমরেশ্বর আগের দুজনের পথ অনুসরণ করবে নিশ্চয় এখুনি। মৃত্যুগহ্বর পাতালঘরটার দিকে এগোবে নিঃশব্দে।

যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই পা বাড়াল পরাশর। অমরেশ্বরকে আটকাতে হবে যে-কোন উপায়ে। জীবন দিয়ে হয় যদি তাতেও পেছপা

হবে না। ওর আগে অমরেশ্বর নিজে যাবে পাতালঘরে। সুখরঞ্জন মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে তার এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের ফলাফল।

হনহনিয়ে চলছে পরাশর বাতাসের দ্বিগুণ বেগে।

বাড়িতে এলো।

যা ভেবেছিল তাই-ই দেখেছে। আচ্ছন্নের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অমরেশ্বর। চলছে। ওর দেহটা যেন এখন ওর নিজের নয়। অন্যের। সেই অন্য মানুষ বাতাসে ভেসে ভেসে চলছে বুঝি। দু'চোখ বোজা। তবু চলেছে ঠিক পাতালঘরের দিকেই। একেবারে সিধে। আশ্চর্য, বাঁকাচোরায় পা পড়ছে না মোটে।

স্থির থাকতে না পেরে পরাশর দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল অমরেশ্বরকে। একটা লোহার মানুষকে জড়িয়ে ধরল যেন। পথরোধ করতে পারল না। লোহার মানুষ পরাশরকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে চলতে লাগল আবার। নিরুপায় পরাশরের ধাক্কার ধকল সামলানো মাথায় উঠল। সময় নেই একদম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে অমরেশ্বরের পাশে-পাশে চলতে লাগল। কানের কাছে মুখ এনে চেতনা আনার জন্য ডাকছে নাম ধরে। ডাকছে তো ডাকছেই। অমরেশ্বর ফিরে এসো! ওদিকে যেও না! আমি পরাশর বলছি, পরাশর…।

কে কার কথা শোনে! অমরেশ্বরের কানে কোন কথাই যাচ্ছে না। পরাশরের কথা ছাপিয়ে শ্মশানের নিঃশ্বাসের ডাকটাই জোরালো হয়ে উঠছে। পরাশর এখানেও শুনছে শ্মশানের ডাক। সুখরঞ্জনের নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে অমরেশ্বরের নাম ধরে ডাকাটা। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। অমরেশ্বর একমাত্র ওই ডাকই শুনছে। ডাকের মোহে আবিষ্ট হয়ে আছে। এ মোহের কবলে ও আত্মজ্ঞানশূন্য। এ মোহের কঠিন আকর্ষণ থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই ওর।

সব বুঝতে পেরেও হাল ছাড়ল না পরাশর। বাড়িতে বুড়োবুড়িদের মুখে বহু প্রচলিত একটা কথা অনেকবার শুনেছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সেই কথাটাই বেশি করে মনে পড়ছে বলেই অমরেশ্বরের সঙ্গ ছাড়ছে না পরাশর, আর ডাকাডাকিও না। বরং গলার স্বরটা ধাপে ধাপে চড়ায় তুলে বেশ উচ্চগ্রামেই তুলেছে। শেষ চেষ্টা—যদি হঠাৎ শুনে ফেলে সংবিৎ ফিরে পায়।

অমরেশ্বরের সংবিৎ ফিরে পাবার আগে পরাশরেরই সংবিৎ হারিয়ে

ফেলার উপক্রম হয়ে আসছে। যত জোরে চিৎকার করে ডাকছে, তত ঝাঁক-ঝাঁক কাকের আর্তনাদ কানে ভয়ানকভাবে বাজছে তার। মাথাটা যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতন ডাকছে পরাশর। এ ডাকের ভেতর দিয়েও একটা আর্তনাদই বেরিয়ে আসছে।

এদিকে গভীর রাতে ঠিক এই সময়েই একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে নয়নতারা। পরাশরের সামনে ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁস গর্জন করছে কালনাগিনী। বাতাসে বিষ ঢালছে। পরাশরের লাল টুকটুকে চেহারায় বিষে বিষে নীল করে দেবার প্রয়াস চলছে। ছোবল বসানোর মুহূর্তটুকু বাকি শুধু। পরাশর কাকে যেন ডাকছে। অস্পষ্ট অসহায় স্বর। ঘুম ভাঙল নয়নতারার দুঃসহ যন্ত্রণায়। সত্যিই পরাশরের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

খাট থেকে একরকম লাফিয়েই পড়ল মেঝেয়। দৌড়ল আওয়াজ শুনে-শুনে—পাতালঘরের দিকে। স্বচক্ষে যে-দৃশ্য দেখল, বুক কেঁপে উঠল তাতে। দেখল দুজনের অবস্থা, পরাশর আর অমরেশ্বরের। পরাশরের মুখে শুনল সুখরঞ্জনের ক্রিয়াকাণ্ডের কথা। নয়নতারা স্তম্ভিত হতবাক্। সুখরঞ্জনের এ সর্বনেশে ক্রিয়াকলাপ এখুনি না বন্ধ করতে পারলে মহাবিপদ। দুটো প্রাণই দুনিয়ার বাঁধন ছিন্ন করে বাতাসে মিশে যাবে। শ্মশানের পথে ছুটে চলল নয়নতারা ঊর্ধ্বশ্বাসে! শ্মশানে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে আছড়ে পড়ল সুখরঞ্জনের পায়ে।—বন্ধ করো এ কাজ! নইলে পরাশরকেও আর ফিরে পাওয়া যাবে না এ যাত্রা। কাঁদছে নয়নতারা হাপুস নয়নে।

ধ্যান ভাঙল সুখরঞ্জনের। ধ্যান করছিল পাতালঘরের আর সেই ঘরের দিকে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে অমরেশ্বর। নিঃশ্বাসে মন্ত্রের সঙ্গে নাম ধরে ডাকাটা বন্ধ হলো। এটা সম্মোহনী-উচ্চাটনী ডাক। এ ডাকের এমনই মোহ, এমনই আকর্ষণ—কর্ণগোচর হয় না অন্য কোন দ্বিতীয় ডাক। এ ডাক বন্ধ না হলে চেতনা জেগে ওঠা অসম্ভব। তান্ত্রিকের ইচ্ছেমতন গন্তব্যস্থলে না পৌঁছনো অবধি ক্রিয়ার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষ থামবে না, থমকাবে না একবারের জন্যও। না পারবে এক তিল ঘরে তিষ্ঠোতে, না পারবে বাইরে। বিবেকহীন মানুষটা নিজের অগোচরেই চলবে। চলবে, কেবলই চলবে সে।

নয়নতারার জন্য সুখরঞ্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যজ্ঞ ব্যর্থ হলো। ক্রিয়ার পরিশ্রম পণ্ড হলো। লাল কম্বলের আসনের ওপর থেকে সুখরঞ্জন সরিয়ে নিল দু-পা।

যতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল অমরেশ্বর, সেখানেই চলা স্তব্ধ হলো তার।

আত্মসংবিৎ ফিরে পেয়ে অবাক একেবারে। পাতালঘরের কাছ-বরাবর এসে গেছে দেখে চমকে উঠল। শিরশির করে উঠল রক্তের ভেতর। আগের দুজনের—বড়দা-মেজদার দশা হতে চলেছিল তারও তাহলে !

এর পরের ঘটনা—সুখরঞ্জন নিরুদ্দেশ হয়েছিল আবার আগের মতন। অর্থাৎ বারো বছর আগে তিরিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছল যেমন। তখন পরাশর বছর দশেকের। সুখরঞ্জনের ওই একটা মাত্রই ছেলে।

বাঁড়ুজ্যে-বংশের একটা আশ্চর্য ইতিহাস আছে। দু'পুরুষ অন্তর-অন্তর বাড়ির একজন করে ছেলে তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে। সে বংশের ছোট ছেলে। সুখরঞ্জনের বেলায়ই সেই পালা পড়েছিল। সুখরঞ্জন জ্ঞান হওয়া থেকে বংশের বিশেষত্ব শুনে-শুনে অল্পবয়সেই নিজেকে সন্ন্যাসী ভেবে নিয়েছিল মনে-প্রাণে। তিরিশে সে-ভাবটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বড্ড বেশি। গৃহত্যাগ করল। দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালো বারো বছর ধরে। তন্ত্র-মন্ত্রের অনেক কিছু শিখল অনেক তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর কাছে। তবু ঘরের দিকে মন টানল একদিন। স্ত্রী-পুত্রকে একবার দেখে না এলে সাধনার সময় বিঘ্ন কাটবে না তার। স্ত্রী-পুত্রের মুখ ভেসে ওঠা বন্ধ হবে না হয়তো কখনো।

বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রীর মুখে যা শুনল, তাতে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল বুকের তলায়, আর খুন চাপল মাথায়। চাপল নয়নতারার রক্তঝরা কান্নায় আর প্রতিকারের পথ বাতলে দেয়ায়। ··পথের কাঁটা দূর কইর‍্যা যাও।

স্বামী বিবাগী বলে স্ত্রী-পুত্রকে ভিখিরী ভাবে বাড়ির লোক। বড়জা বড়জার ছেলেরা তাদের মা-ছেলেকে দাস-দাসীরও অধম ভাবে। বিষয়-আশয় সব ওদেরই। নয়নতারা আর সুখরঞ্জনের কানাকড়ির দাবি নেই যেন ওই সম্পত্তিতে। স্বামীকে তো কোন বিশ্বাস নেই, কবে বলতে কবে চলে যায়। যাবার আগে যেন ব্যবস্থা করে যায়। নয়নতারা আর পরাশরকে গলা টিপে মেরে শেষ করে যাক, নয়তো তাদের সুখের রাস্তায় যে-সব কাঁটা রয়েছে, একেবারে নির্মূল করে দিয়ে যাক।

তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী সুখরঞ্জন। শ্মশানে-মশানেই কাজ-কর্ম অর্থাৎ সাধন-ভজন করে বেড়ায়—এটা সবার জানা। স্ত্রীরও। কিন্তু স্ত্রীর কথা শিরোধার্য করে, স্ত্রীর পথের কাঁটা দূর করার সাধনা করছে যে স্বামী প্রতি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে—এটা স্ত্রীর যেমন অজানা, তেমনি সকলেরই। দুটো চতুর্দশীতে যখন বড়জার বড়ছেলে মেজছেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল পাতালঘরের দরজায় সিঁড়ির চাতালে, তখনও অনেক ভেবেছে, মাটির তলায় ওই ঘরটায়

অনেক গুপ্তধন রয়েছে, ওখানে কালনাগিনী পাহারা দেয়—ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় ওদিকে গেলে। যার প্রকৃত পাওনা—সে গেলে কালনাগিনী সরে যাবে। ছেলে দুটো বোধহয় লোভে-লোভে গেছল—ওদের নয়, তাই কালনাগিনীর রোষ এড়াতে পারেনি ওরা। অঘোরে প্রাণ খুইয়েছে। অনেকে কিন্তু আবার অন্য দিকটাও ভেবেছে বিশেষ একটা তিথিতে মৃত্যুর জন্য। বংশের ওপর কোন শত্রুপক্ষ কোন তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীকে দিয়ে অভিচার-ক্রিয়া করাচ্ছে হয়তো। কিন্তু সুখরঞ্জনের ওপরে সন্দেহ করেনি কেউ। না স্ত্রী, না অন্য কেউ।

তৃতীয় বারে পরাশরের ভেতর থেকে কে যেন বলেছিল শ্মশানের দিকে যেতে, শ্মশানের ভেতর যেতে।···

যাবার সময় সমস্ত ব্যাপারটা, এমন কি কিভাবে ক্রিয়াকলাপ করেছে সুখরঞ্জন—একটা লাল খেরো বাঁধানো খাতায় লিখে রেখে গেছে। খাতাটা পড়েছে পরাশর একবার দু'বার নয়—বহুবার। খাতাব প্রতিটি অক্ষর মুখস্থ তার। মুখস্থ অনুতাপ-অনুশোচনার কথা ক'টাও। "যাবন্ন ক্ষায়তে কর্ম শুভঞ্চা-শুভমেব. বা, তাবন্ন জায়তে মোক্ষ নৃণাং কল্পশতৈরপি।" মহানির্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশেষ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সুখরঞ্জনের গুরুদেব কত সময়। শুভ-অশুভ ক্ষয় না হলে মানুষের মুক্তি নেই। লোহার শেকলে বাঁধাই হোক, আর সোনার শেকলে বাঁধাই হোক—দুটোই বন্ধন। এই দুটো বন্ধনের উর্ধ্বে যে, সে-ই স্বার্থশূন্য মুক্ত মানুষ। সে-ই কেবল তন্ত্রের গুপ্তক্রিয়ার অধিকারী। তার ক্রিযায় লোকের ইষ্টই হয়, অনিষ্টের কোন গন্ধ থাকে না। সুখরঞ্জন মনের দিক দিয়ে স্বার্থশূন্য ছিল না। তাই ভালো না করে বংশের সর্বনাশই করেছে। ও-ঘরে স্রেফ বিষমুখী সাপের আড্ডা ছাড়া কোন রত্নেরই যে 'র' নেই—ভালোরকম জানা ছিল। লোকের চোখে ধাঁধা দিয়ে নির্দোষ হয়ে থাকার জন্য মৃত্যু-ঘরের দিকে ক্রিযার প্রভাবে টেনে এনেছে নির্দোষ দুটি তরুণকে। এ অন্যায় থেকে মুক্তি পাবে কি করে সুখরঞ্জন—জানে না। এর প্রায়শ্চিত্ত কি—তাও না।

সকলের সামনে বৃদ্ধ পরাশর সাধু সব ঘটনাই বলে মৃদু হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জায়গাটা অভিশপ্ত। সেটা অবিশ্যি বাবারই জন্য। ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে আমি এই জায়গাটার নাম দিয়েছি তাই মনসাতলী।

আবারো বলল পরাশর সাধু, যে যা বলে বলুক—আমার যত শরীর

খারাপই হোক না কেন, এ কাজ আমি করবই। বাবার কাজের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে, তাতে মৃত্যু হলে—সেটা শাস্তির মৃত্যু, মুক্তির মৃত্যু।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি মৃত্যুশয্যায়। ছেলেকে শেষ দেখার জন্য দর-দর করে দু'গাল বেয়ে নীরবে দু'চোখের জল ঝরে পড়ছে। মাথার কাছে বসে আছে পরাশর সাধু। কথা দিয়েছে, বিধবা মায়ের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে ফিরিয়ে আনাবেই, দেখা করাবেই।

সম্মোহনী-উচ্চাটনী-আকর্ষণী ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে গেল পরাশর সাধু। বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েছে। কথা বলতে কষ্ট হয়। দুর্বল বুক। ডাক্তারদের মতে মৃত্যু দ্বারে করাঘাত করছে সর্বক্ষণ। কখন কি হয় বলা যায় না। ক্রিয়াকলাপ বন্ধের নির্দেশ।

নির্দেশ অমান্য করে পরাশর সাধু ক্রিয়া করছে। যুবকের নাম মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাস টানছে, ছাড়ছে। চোখ বুজে ধ্যানে দেখছে ছেলেকে—মায়ের কাছে এসেছে। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইছে বছর চারেক ধরে একদম না আসার। মায়ের মুখদর্শন না করার।

ওর নিঃশ্বাস টানার সময় বুকখানা ভয়ানকভাবে ফুলে ফুলে উঠছে। এই ভাবে কতক্ষণ ক্রিয়া চলল, কতক্ষণ আমরা দেখেছি আত্মহারা হয়ে—সে খেয়াল নেই কারো। খেয়াল হলো, একজন উস্কোখুস্কো চুলের যুবক ঘরে ঢুকে, মায়ের কাছে এসে বুকে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে।...সাধু পরাশরের সাধনা সার্থক।

কঙ্কাল সাধনার মতন মানুষকে কঙ্কাল করে তোলার ঘটনা নয় এটা, তবুও মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে যাওয়ার দিক থেকে দুটোতে যে কোন তারতম্য নেই—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দুটোর ফলাফল একেবারে যমজ। অন্তত আমার ধারণা তাই। অবিশ্যি পরিণতির আভাস পেয়েছি আমি খানিকটা শুনতেই।

দশ-বারোটা চিরগাছ একসঙ্গে মিতালী করে, ডালপালা বিস্তার করে রেখেছে এমনভাবে যে, আগন্তুকের চোখে-মাথায় স্নিগ্ধছায়ার পরশ ছাড়া রোদ্দুরের আঁচ পর্যন্ত যাতে না লাগে একটুও। চত্বরটা শান্ত নির্জন।

ক্ষীরভবানীর সামনের চত্বর এটা। প্রায় তিরিশ ফুট জায়গা জুড়ে রেলিং-ঘেরা একটা চারকোণা কুণ্ড। দশ-পনেরো ফুট গভীর হবে। তলায় জল। রামধনু রঙ খেলে যাচ্ছে জলে। জলের ওপর থেকেই ক্ষীরভবানী দেবীর ছোট্ট মন্দির গড়ে উঠেছে।

রেলিংয়ের এপারে গাছের ছায়ায় বসে আছি আমরা তিনজনে। আমি, মিহির আর নির্মলানন্দ। নির্মলানন্দ বসে আছেন একটা গালচে-পাতা কাঠের আসনের ওপরে। আমরা দুজনে কম্বলের আসনে। নির্মলানন্দের দৃষ্টি নামা-ওঠা করছে। মন্দিরের চূড়ো বেয়ে দেবী, তারপর কুণ্ড অবধি। আবার কুণ্ড বেয়ে দেবী, তারপর চূড়ো।

উনি দেখছেন, তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। তন্ময়তা ভাঙছে, আবার দেখছেন—আবার তন্ময়।

ওঁর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মিহির। চোখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে বলল, সুযোগ পেয়েছিল পুলক। গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করতে চায়নি। হেলায় হারিয়েছে। এখানে আসার পরই ওর কথা মনে পড়ছে বেশি করে। তার কারণও আছে। এখান থেকেই পুলকের ভবিষ্যৎ পরিণতির শুরু। কলকাতায় শেষ হয়েছে। চরম শেষের কথা ভাবলে, শিরা-উপশিরার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। জমাট বেঁধে যাবার যোগাড়।

আর কোন কথা বলেনি। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বসে নীল আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন কি ভেবেছিল। তারপর জানিয়েছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু পুলকের গোপন সাধনার সমস্ত কথা। কেন সাধনার পথে নেমেছিল একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণ, কি উদ্দেশ্যে—একটুও না রেখে-ঢেকে খোলাখুলিই বলেছে।

একই মেসে একই ঘরে বাস দুজনের। পুলকের দিবারাত্রির বিষণ্ণ-কাতর মুখ আর আনমনা-আনমনা ভাব দেখে ভেতরে-ভেতরে একটা ব্যথার খোঁচা খেতো মিহির। 'কি হয়েছে' জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর পেতো না। বধির নির্বাক।

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জোরজবরদস্তি করে ধরে নিয়ে গেছল একদিন নির্মলানন্দের কাছে। ওর চোখে চোখ পড়তে কি যেন কি দেখে নির্মলানন্দের হাসিখুশি মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেছল নিমেষে। বলেছিলেন, সর্বনাশের পথ থেকে পা দুটো উঠিয়ে নাও এখুনি। এমনিতেই অনেক সময় চলে গেছে। এক মুহূর্ত দেরি নয় আর।

নির্মলানন্দের কোন কথাই মেনে নেয়নি পুলক।

এটা বুঝতে পেরেছিল মিহির একদিন গভীর রাতে।

ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। সে একলা শুধু নয়, গোটা মেস-বাড়িটাই ঘুমে অচেতন তখন। কেবল একজন জেগে। পুলক।

ঘুমোতে ঘুমোতে মনে হলো মিহিরের, কে যেন আগুন ছেটাচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। চোখ দুটো টেনে টেনে খোলার চেষ্টা করছে, পারছে না। ভারী ভারী আগুনের বোঝা দুটো দু'চোখের পাতার ওপর জেঁকে বসেছে। কার গলার আওয়াজ, চেনা কি অচেনা, কিছু বুঝতে পারছে না। তবে শুনতে পাচ্ছে, বিড় বিড় করে কে যেন কি সব দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চারণ করে চলেছে একনাগাড়ে।

অসোয়াস্তির গতি বাড়ছে। দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ। ঘুম ভাঙল। সামনে যে দৃশ্য দেখছে, নতুন। আগে কখনো দেখেনি এরকম। লাল চন্দন আর সিঁদুর মাখানো রুদ্রাক্ষের মালা গলায় বিবস্ত্র হয়ে একটা মেষছালের আসনে বসে আছে পুলক। ওর সামনে হোমের আগুন জ্বলছে।

প্রথমে চারকোণা তামার হোমকুণ্ড। এ কুণ্ডটায় লাল রঙের মাটি ভর্তি। তার ওপরে জল ভর্তি গোল কুণ্ড একটা। ওর ওপর তিনকোণা কুণ্ডতে হোমের আগুন জ্বলছে। মহানিমের ফুল ঘিরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আহুতি দিয়ে যাচ্ছে পুলক নিবিষ্ট মনে। প্রতিবার আহুতি দেবার সময় যে মন্ত্র বলেছে, সে মন্ত্রে ওর নিজের নামের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের নাম যুক্ত করছে। "ওঁ রক্তচামুণ্ডে···স্বাহা।"

মন্ত্রের সম্পূর্ণ বয়ান শুনে, মিহির স্তম্ভিত। বশীকরণ প্রক্রিয়া করছে পুলক। মন্ত্রে নিজের বশে আনতে চাইছে একটি মেয়েকে। ওর মনের ইচ্ছে মেয়েটির মনের ইচ্ছে হয়ে দাঁড়াবে। ওর চোখের দৃষ্টিতে তাঁর গলার স্বরে মেয়েটি লালসা-ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে এমন মোহিত হয়ে যাবে যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজের আলাদা সত্তা হারিয়ে ফেলবে একদম। পুলকের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে শুধু যতক্ষণ পুলকের ইচ্ছে।

এরকম দুর্মতিও হয় মানুষের। সর্বনাশের অতল-গহ্বরে নামবার আর বাকি কোথায় পুলকের! মিহিরকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে অন্ধ হয়ে এগিয়েছে অনেক দূর। মিহিরের অবাক হবার পালা বাকি ছিল আরো। দেখছে, শুনছে। ও যে পুলকের ক্রিয়াকলাপ দেখছে, শুনছে—পুলকের কিন্তু

সেধারে কোন খেয়ালই নেই। দেখে মনে হয়, নিজের সাধনা-সিদ্ধির জন্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হোমের আগুনের তেজ কমে আসছে আস্তে আস্তে। হোম করছে না আর পুলক, ঘি-ও ঢালছে না। আগুনের নিবু নিবু অবস্থা। হাত-ভর্তি ফুল, জপ করছে। "ওঁ হ্রুং...।" যে মেয়ের হাতে উপহার হিসেবে এ ফুল দেওয়া হবে তার মনপ্রাণ পুলকের বশীভূত হয়ে পড়বে চোখের পলকে।

বার সাতেক চলল এই ফুল-জপ। তারপর অতি যত্নে ফুলগুলো রেখে দিল পুষ্পপাত্রের ওপর।

খুব সামান্যই জ্বলছে আগুন। একেবারে নিবতে আর দেরি নেই বেশি। মেষছালের ওপরই সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পুলক। জপ বন্ধ নেই কিন্তু এবারেও। তবে অন্য জপ এবারে। "ওঁ সহবল্লীং...।" ইচ্ছেমতন মেয়েটি ভোগযন্ত্র হয়ে থাকুক পুলকের।

জপ করতে করতে গলার স্বর নামছে ক্রমে নিচের দিকে। মৃদু মৃদুতর মৃদুতম। শেষে বন্ধ। মিহির শুনছে, মুখ বন্ধ হলে কি হবে, নিঃশ্বাসে চলছে। সেই রকমই আওয়াজ বেরোচ্ছে দু'নাক দিয়ে। এ আওয়াজও থামল। ঘুমিয়ে পড়ল পুলক।

ঘুমোতে পারল না আর মিহির। অনেকবার মনে হয়েছে জাগিয়ে তোলে ওকে। বলে, এ কি জঘন্য প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসেছে তোকে ? কেন জানে না, ইচ্ছে করল না আর জাগাতে। একটা দারুণ ঘেন্না কিলবিল করে বেড়াতে লাগল মনটাকে ঘিরে-ঘিরে। এ ঘেন্নার হাত থেকে মুক্তি পাবে না বুঝি মিহির। এভাবে ইচ্ছে-শক্তির এ কি অপব্যবহার !

এরপর ক'রাত আর ঠিকমতন ঘুমোতে পারেনি মিহির। মাঝে মাঝে আচমকা ঘুম ভেঙেছে। আর একেবারে ভেঙেছে পুলকের ক্রিয়াকলাপের সময়। এখন নতুন দুটো শব্দ যোগ করেছে মন্ত্রে আবার। তার অর্থ, সব মেয়ের চোখে তার কুৎসিত-দর্শন চেহারা যেন কন্দর্পের মতন সুন্দর সুপুরুষ কামিনী-মোহন হয়ে ওঠে।

এটা শুনে বিরক্তির একশেষ হলেও মিহিরের একটুও যে সহানুভূতি আসেনি পুলকের ওপর, তা নয়। এসেছিল। এসেছিল ওর অন্তরের ব্যথার সঙ্গে আগে থেকে বিশেষ পরিচয় ছিল বলে। প্রথম শোনার পর থেকে মিহিরের হৃদয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সহানুভূতির আসন করে নিয়েছিল পুলক। সে আসন স্থানচ্যুত হতে বসেছিল ওর ক্রিয়াকলাপে মন্ত্রের

ভাবার্থ বুঝে। আসন স্থানচ্যুত হতে হতে আটকে গেল পরের মন্ত্র যোগ হওয়ায়।

মানুষটার হতাশার ব্যথায় ভরে রয়েছে ভেতর। সে-ব্যথাকে দূর করার এই প্রয়াস। কোন মেয়েই পছন্দ করত না ওকে। করে না ও। ওকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, চোখ ফিরিয়ে নেয়। অপছন্দ। তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির বিদ্বেষ, আর চোখে নেচে বেড়ায় ঘেন্নার ছায়া। অবহেলা আর অবহেলা। সব মেয়ের কাছ থেকেই অবহেলা পেয়েছে ও। অপরাধ বিসদৃশ চেহারা।

অবহেলা-অপমানের জ্বালায় জ্বলছে সর্বক্ষণ। মাঝে-মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছে নিজেকে। দু'চোখের কোণ চিক চিক করে উঠেছে। পরমুহূর্তে জল-ভরা চোখে ক্রোধের আগুন ফুলকি ছড়িয়ে দিয়েছে। খরখরে হয়ে উঠেছে চাউনি। নিজেকে নিজে শুনিয়েই অস্ফুটে বলেছে, আত্মঘাতী হতে পারি, হবো না। যার যার কাছ থেকে তাচ্ছিল্য-লাঞ্ছনা পেয়েছি, তাকে জব্দ করতে হবে। বশীভূত করতে হবে নিজের। তারপর আত্মঘাতী হওয়া না হওয়ার কথা চিন্তা করে দেখা যাবে'খন।

বহুবার এ দৃশ্য দেখেছে, এসব কথা শুনেছে বসে বসে মিহির। সাবধান করে দিয়েছে পুলককে। অপরকে নিজের কবলে আনতে গিয়ে দুষ্টবুদ্ধির কবলে পড়ে নিজেকেই না বিকিয়ে দিতে হয় শেষ অবধি।

সাবধানে সচেতন হয়নি পুলক।

কাশ্মীর থেকে ঘুরে এসে বলেছিল, বরাত সুপ্রসন্ন তার। এক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে গেছে ওখানে হঠাৎ। ওঁর অপরিসীম করুণাও পেয়েছে সে। ব্যথা উপশমের দাওয়াই বাতলে দিয়েছেন উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

দাওয়াইটা কি—প্রকাশ করেনি। ভয় ধরেছিল মিহিরের। পাগলামোয় পেয়েছে ওকে। কি বুঝতে কি বুঝে কি করতে কি করে একটা মহাবিপদ না ডেকে নিয়ে আসে শেষে! নিয়ে গেছল নির্মলানন্দের কাছে।

পুলক যে-সব গোপন করেছিল, সে-সব স্বচক্ষে দেখছে মিহির, স্বকর্ণে শুনছে। কেমন যেন মনে হয়েছে মিহিরের এরকম মনোভাব নিয়ে এরকম ক্রিয়া করাটা ভালো হচ্ছে না। ফল খারাপ। খুব খারাপ। আবার ধরে নিয়ে গেছল নির্মলানন্দের কাছে।

সব শুনে নির্মলানন্দ বলেছিলেন, মানুষকে বশে আনতে গেলে তার মন জয় করার ক্রিয়াটাই আসল। কাউকে জব্দ করার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে

সাধনতন্ত্রের এ-সমস্ত ক্রিয়াকলাপে সাময়িক একটু-আধটু ফল ফললেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিশ্চিত।

তিনি স্নেহঝরা গলায় বলেছিলেন, কাশ্মীরে গেছলে তো। ক্ষীরভবানীর মন্দিরটাই তো সমস্ত কিছু বশে রাখার একটা মস্ত বড় যন্ত্র। তন্ত্রের যন্ত্র-আসন। বিশ্বব্যাপী অদৃশ্যশক্তির প্রকাশের প্রতীক এটা। চারকোণা কুণ্ড পৃথিবীর প্রতীক। তার মধ্যে জল। জলের ওপর মন্দির। মন্দিরের দেবী ইচ্ছাক্রিয়া-জ্ঞানময়ী। ইনি ত্রিকোণের—তেজের প্রতীক। মহাশক্তির পৃথিবীতে জলে তেজে পূর্ণপ্রকাশ! সেই ভাবধারাই দেখানো হয়েছে মন্দিরে। এই শক্তি তোমার আমার সবার ভেতরেই রয়েছে।

একটু থেমে আবার বললেন নির্মলানন্দ, নিজের প্রবল ইচ্ছেয় যে ক্রিয়াই করবে যখন, নিজের বিবেককে জাগিয়ে রাখবে। অন্যথা যেন না হয় কখনো! ভুল করলে পদে পদে বিপদ। অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক পেছনে দাঁড় না করিয়ে তন্ত্র-সাধনার কোন ক্রিয়াকলাপই কারো করা উচিত নয়।

নিজের বিবেককে কি ভাবে জাগিয়ে রাখা যায়, কি ভাবে নিজের মনের কাছে অন্য মনকে বশে আনা যায় দুটো মন এক স্তরের করে গড়ে তুলে—তার ব্যাখ্যা করেও শোনালেন নির্মলানন্দ।

ওঁ বীজমন্ত্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রতীক। ওঁ বলে নিঃশ্বাস টেনে নেবার সময় ভাবতে হবে, তেজ-জল-পৃথিবীর সমস্ত শক্তিই নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করল ভেতরে। হ্রীং-ক্রীং দুটি বীজে নিঃশ্বাসকে ধরে রাখার সময় চিন্তা করতে হবে, মায়ামুক্ত শক্তির প্রতীক হ্রীং আর চেতনা-তেজশক্তির প্রতীক ক্রীং বীজ দুটি মিলে ভেতরটা আলোয় আলো করে তুলেছে। নেই হিংসা, নেই দ্বেষ, নেই প্রতিশোধস্পৃহা। আছে শুধু একটা পবিত্র ইচ্ছে। অন্য মনকে এই ইচ্ছের সমান-সমান করে ধরে রাখার ইচ্ছে। ওঁ হ্রীং ক্রীং ওঁ—চার মাত্রায় নিঃশ্বাস ফেলার সময় মনে করতে হবে নিজের পবিত্র ইচ্ছেটাই বাইরে বেরিয়ে বাতাসে ভেসে-ভেসে অন্য মনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। অন্য মনের ইচ্ছের এই ইচ্ছেটাই প্রভাব বিস্তার করে, পবিত্র করে গড়ে তুলে, দুটো ইচ্ছে এক করে ফেলেছে। এই ক্রিয়াটাই আসল বশীকরণ ক্রিয়া। (লোকের মন জয় করা।) মনে মনে মিলন করা। এ ক্রিয়ার স্থায়িত্ব চিরকাল।

নির্মলানন্দ এত বুঝিয়েছিলেন। নিঃশ্বাস টেনে রেখে ছেড়ে—প্রাণায়াম করেও দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও মন মেনে নেয়নি পুলকের। ভালো লাগেনি।

নির্মলানন্দের নির্দেশ মনে-প্রাণে গেঁথে রেখে অনুশীলন করেছে মিহির। নিজের ইচ্ছে প্রয়োগ করেছে জ্ঞাতিশত্রুদের মনের ওপর, ওদের ইচ্ছের ওপর। আশ্চর্য ফল ফলেছে। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের শত্রুতার মৃত্যু হয়েছে। মিলন হয়েছে পরস্পরের। রাগ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন মিলন। এ মিলনের আনন্দ মুখে বলে বোঝানো যায় না।

আরো আরো আনন্দ পাবার লোভে পরিব্রাজকের পথ বেছে নিয়েছে জীবনে মিহির। সত্যের অনুসন্ধানী সত্যের পূজারী সন্ন্যাসী নির্মলানন্দের সঙ্গ নিয়েছে তাই।

এতখানি অবধি বলে, আবার তাকাল মিহির নির্মলানন্দের দিকে। মন্দির-প্রতিমার দিকেই মুখ ওঁর। দু'চোখ বোজা। ধীর স্থির হয়ে বসে আছেন। বাইরের চোখে দেখছেন না এবার আর উনি। ভেতরের চোখে দেখছেন হয়তো। হয়তো অনুভবও করছেন, পৃথিবীর জলের তেজের শক্তি আর ওঁর ভেতরের শক্তি এক হয়ে মিলে-মিশে রয়েছে।

মিহির আপসোস করে বলল, পুলকের সাধনা-সিদ্ধি হয়েছিল কিছু কিছু। যে-কোন ব্যাপারে একটা প্রবল ইচ্ছেকে ধরে রাখতে পারলে কিছু ফল ফলবেই। ওরও সেই রকমই হয়েছিল। বহু মেয়েকে হাতের মুঠোয় পুরেছিল সত্যি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেনি একজনকেও। একজনকে স্ত্রী ভাবে চাইলে হয়তো সুখী হতে পারতো, কিন্তু সেটা চায়নি একদম চেয়েছিল বহুবল্লভ হতে। ধরা-ছাড়া ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে মেয়েদের আজ ধরছে, কাল ছাড়ছে আবার তাদের।

এইভাবেই নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েছিল পুলক মেয়েদের হাতে। ওদের ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। ওদেরই একদল পুলকের উদ্দেশ্য কীর্তিকলাপ জানতে পেরে, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার তলায় তলায় চেষ্টা চালিয়েছিল।

পুলকের মৃত্যু এগিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি ওদেরই হাত দিয়ে। ওদেরই একজন গোপনে বিষাক্ত আলোকলতা আর তার নির্যাস মিশিয়ে দিয়েছে পুলকের খাবারে। দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে এসেছে ওর দেহ। কোন চিকিৎসাই কোন কাজ করেনি। অসময়ে পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে।
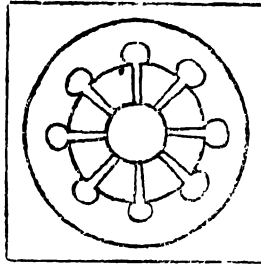
কি বীভৎস দৃশ্য !

কালীধারের চুড়োয়—জ্বালামুখীর মন্দির থেকে বেশ কিছু দূরে—নাদাউনের কাছ বরাবর। রক্তে ভিজে গেছে খানিকটা জায়গা। পা পড়তে শিউরে উঠেছি আমি। অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা হিমশীতল হয়ে এসেছে। গভীর রাতে অন্ধকারে যতটুকু চোখ গেছে, শুধু রক্তই দেখেছি। আঁকাবাঁকা পথে রক্তের ফোঁটা সার বেঁধে চেপে বসে আছে।

চতুর্দিকে গাছগাছালি ঘেরা নির্জন জায়গাটায় দেবী পীঠস্থানের এলাকা বলে তন্ত্রের কঠিন সাধনা বামাচারের ক্রিয়াকলাপ হয়ে গেছে একটু আগে। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে জনা চারেক লোক সাধনচক্রে বসেছিল। এদের একজনকেও আশেপাশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা আসতে আসতে এত শীগগির কোথায় সব উধাও হয়ে গেল—বুঝতে পারছি না। কর্পূরের মতন উবে যাওয়া গোছের। আমার চিন্তাভাবনায় রহস্যের ঘন মেঘ জমছে। তাকালুম আত্মানন্দের দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর দৃষ্টি মাটির বুকে।

জায়গাটার ওপর দিয়ে একটা নিদারুণ নির্দয় ঝড় বয়ে গেছে যেন। কম্বল হরিণছালের আসনগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো। গোল করে পাতা নেই ঠিক। কোন কোনটা সবল পায়ের চাপে দলা পাকিয়ে গেছে একেবারে। ধস্তাধস্তির চিহ্ন বর্তমান। রক্ত-মাখা পায়ের ছাপ এলোমেলো পড়েছে। পুজোর ভোগ থালাসুদ্ধ উবুড় হয়ে পড়ে আছে। কোশাকুশীর কোশাটা উত্তর দিকে, কুশীটা দক্ষিণ দিকে। কারণবারির কাঁচের পেয়ালা ভেঙে খান্ খান্। টুকরো টুকরো কাঁচ আর কাঁচ।

আত্মানন্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সব। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ তুললেন। কোন কথা বললেন না। মুখ কথা না বললেও ওঁর চোখ কথা বলল। ওঁকে অনুসরণ করে যেতে হবে। উনি রক্তের নিশানা দেখে এগিয়ে চলছেন। আমি পেছন পেছন চলেছি প্রবল উৎকণ্ঠার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে।

যত এগোচ্ছি ততই ওঁর মুখখানা থমথমে হয়ে উঠতে দেখছি আরো।

বাতাস ভারী ভারী ঠেকছে। দূর থেকে একটা অজানা জন্তুর ভয়-ধরানো বিকৃত স্বরে বিপদেরই সঙ্কেত শুনছি বুঝি। একটানা চেঁচাচ্ছে জন্তুটা। পাশ দিয়ে সড় সড় করে কী যেন চলে গেল। সাক্ষাৎ মরণ। একটু উনিশ-বিশের জন্য বেঁচে গেলুম। গায়ে পা লাগলে আর রক্ষে ছিল না। পাহাড়ী বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে ফিরে আসে না কেউ। দু'পাশের গাছের ডাল কেঁপে কেঁপে উঠল। ঘুমন্ত পাখির ডানা ঝটপটের শব্দ কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল কানে। মনে হচ্ছে জায়গাটা প্রেতপুরী ছাড়া আর কিছু নয়। আচমকা কতকগুলো প্রেতছায়া গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তা ধরে দৌড়চ্ছে।

সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে এলো আমার। অবঃপতনের জন্য পেছন থেকে আত্মানন্দের ডান হাতখানা ধরে ফেললুম খপ করে।

সুন্দর কমনীয় মুখ কঠিন হয়ে উঠল ওর। সজোরে চেপে ধরলেন আমার কব্জিটা। একটু অপেক্ষা না করে, হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। ছুটে চলছেন উনিও কালো ছায়াদের পেছ পেছু। কায়াহীন ছায়াগুলো যত না ছুটছে, তার চেয়ে লুকোচুরি খেলছে দ্বিগুণ। আত্মানন্দও লক্ষ্য রেখে রেখে চলছেন।

এক একটা ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে পড়ছে এবার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে যেন। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ওই সব জায়গায় মরণ-গহ্বর রয়েছে কি না—কে জানে। ছায়ার পেছু নিয়ে আগেকার নাকেরা ওখানে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে কি না—কে জানে। আত্মানন্দের মতন এইভাবে পেছনে ধাওয়া করার নেশা নিশ্চয় পেয়ে বসেছিল তাদেরও।

এক পা-ও এগোতে ইচ্ছে করল না আর। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললুম আত্মানন্দকে, এবার থামুন। এগোনোর ঝুঁকি নেওয়াটা ভালো হবে না বোধহয়। চমকে উঠলুম আমি। আকাশ-আলোয় যা দেখলুম, আগে দেখিনি। ওঁর দু'চোখে যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। পারেন তো আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে পাহাড়-মাটির এক একটা গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিয়ে চলে যান। এবারে কব্জি ছেড়ে দিয়ে বাহু ধরলেন চতুর্গুণ জোরে। নিজের জিদে অচল অটল উনি। মরবেন তো আমাকে নিয়েই মরবেন বুঝি। চলছেন।

চক্ষের নিমেষে সব ক'টা প্রেতছায়া মিলিয়ে গেল কোথায়। একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু থমকালেন আত্মানন্দ। চন মন করে দেখলেন চারদিকে। তারপর পা বাড়ালেন আওয়াজ ধরে। 'চলার

গতি এত দ্রুত—বাতাসে সাঁতার কেটে চলেছেন যেন আমাকে নিয়ে। আমার ভেতরটা নিস্পন্দ হয়ে আসার যোগাড়। ওঁর কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরোবারও উপায় নেই, পালিয়ে বাঁচবারও না। ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে। গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। হোঁচট খেলেন আত্মানন্দ। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলুল আমরা, মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে পরাশর। আত্মানন্দের প্রধান শিষ্য। সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। প্রাণ আছে। অচৈতন্য!

তফাতে তফাতে এক একজন পড়ে রয়েছে। তবে ওরা আহত নয়, নিহতও নয়। নেশার মাতনে অবসন্ন। চলা-নড়ার শক্তিরহিত। আরো একটু দূরে চোখ পড়তে আঁতকে উঠলুম আমি। মর্মান্তিক দৃশ্য। জাহ্নবীর দেহের ওপর একজন, তার ওপর আর একজন—পর পর উবুড় হয়ে পড়ে আছে। সব ক'টা মরা যেন। নিচের যে সে-ও, ওপরের যারা—তারাও। জাহ্নবী বেহুঁশ, জোয়ানরাও বেহুঁশ। জাহ্নবী মদ না ছুঁয়ে, জোয়ানরা মদে আকণ্ঠ ডুবিয়ে।

জোয়ানদের সরিয়ে জাহ্নবীকে বার করলুম আমরা।...

জ্ঞান হতে জাহ্নবার মুখে সমস্ত শুনে স্তম্ভিত আত্মানন্দ, স্তম্ভিত আমিও।

আত্মানন্দের নিষেধ সত্ত্বেও ভোজকী ব্রাহ্মণের মেয়ে-ছেলেদের চক্রে বসিয়েছে পরাশর। ফল যা হবার তাই হয়েছে। চরম ফল। দুঃসহ পরিস্থিতি, প্রাণান্তকর ঘটনা।

ভেতরের তত্ত্ব না বুঝলে বামাচার সাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংযমী না হয়ে আত্মপরীক্ষা দেওয়া একটা প্রহসন মাত্র। তন্ত্রের ন'টি আচারের মধ্যে বামাচার ষষ্ঠ। এর আগে এক-একটি আচারের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে এগোতে হবে। বেদাচার থেকে বৈষ্ণবাচার, তারপর শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তচার। সিদ্ধান্তাচারের পরই বামাচার। বামাচার বীর সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আগের আচারে ফাঁক-ফাঁকি থাকলে বামাচারে পৌঁছনো যাবে না। বামাচার ব্যভিচারের সামিল হয়ে দাঁড়াবে। নিজের নিজের সমাজের হিত না হয়ে বিপরীতই হবে তাতে। নিজেকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতন জাতকে দেশকেও ধ্বংসের কবলে নিয়ে যাওয়া হবে। যারা পাঁচটি আচারে সিদ্ধ নয়, তাদের নিয়ে বসা উচিত নয় ষষ্ঠ আচারে। এ সতর্কবাণী বহুবারের মতন এবারেও করেছেন আত্মানন্দ। বলেছেন, ভোজকী বামুনদের মেয়ে-ছেলেরা বড় অসংযমী। দেবীর ওপর ওদের শ্রদ্ধাভক্তি থাকলে, ওরা মদ-মাংসপ্রিয় বড্ড। ভোগটা এত বড় হয়ে উঠেছে, যার জন্য চরিত্রের বালাইও নেই একটা।

জ্বালামুখীর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন আত্মানন্দ। ভোজকী ব্রাহ্মণ নিরঞ্জনকে, নিরঞ্জনের দলবলকে, বামাচক্রে বসাতে বারণ করেছিলেন। পরাশরের কাছে আত্মানন্দ গোপন করেননি কিছু। ওর চোখ দেখে যা-যা দেখেছিলেন, জানিয়েছিলেন। মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে কুলুঙ্গীর মধ্যে আগুন শিখা দেখিয়ে নিরঞ্জন যখন প্রতিজ্ঞা করেছিল, তখনও ওর দু'চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন উনি। নিরঞ্জন বলেছিল, এই পবিত্র শিখার সামনে দাঁড়িয়েই একদিন শিখরাজা রণজিৎ সিং আর মহারাজা সংসারচাঁদ দুজনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন গুর্খারাজের দাপট থেকে দেশকে রক্ষে করতে হবে। ছিনিয়ে নিতে হবে দখল করা জায়গা। র'জিৎ সিং প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। এই মন্দিরের গিল্টি করা ছাদ তিনিই করিয়ে দেন। দেড়শো বছরেরও আগের কথা।

একটু থেমে, কুলুঙ্গী স্পর্শ করে বলল নিরঞ্জন, পরাশরজী হামলোক সব আচারমে সিদ্ধ হ্যায়। হম বইঠনেসে আপকি সুবিস্তা হোগী। ম্যায় জবান দেতাহুঁ। প্রতিশ্রুতি দেবার সময়ও ওর চঞ্চল চাউনি দেখেছিলেন আত্মানন্দ। তরল লালসা কামনা উপচে উপচে পড়ছে। পড়ছে ঠিক জাহ্নবীর মুখের ওপর, চোখের ওপর—সমস্ত দেহটার ওপর। একবারও চোখ ঘুরছে না কুলুঙ্গীর দিকে—দেবীর অগ্নিশিখা জিভের দিকে।

ওর ধারণা ওর সব কিছু হয়েছে। আমার বিশ্বাস- কিছু হয়নি। ওকে নিয়ে বসলে, সাধনা পণ্ড। বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন আত্মানন্দ।

গুরুদেবের কথা যে একদম শোনেনি পরাশর তা নয়। প্রথমে নিরঞ্জনকে বসতে দিতে চায়নি। আপত্তি করেছিল। শেষ পর্যন্ত আপত্তি টেকেনি ওর পেড়াপীড়িতে।

মাঝখানে হরিণছালের আসনে বসে আছে এলোকেশী জাহ্নবী। পিঠ-ভর্তি কালো কুচকুচে চুলের রাশ। সারা দেহে এতটুকু আবরণ নেই। নির্বিকার মুখ। দেখে মনে হয়, লজ্জা-মান-ভয়ের উর্ধ্বে বিচরণ করছে ওর মন। এ জগতের মানুষ হয়েও যেন এ জগতের কোন কিছুর অনুভূতি জাগে না ওর ভেতরে। জাহ্নবী মনে মনে ভাবছে, সে দেবী। বিশ্বজননী, বিশ্বপ্রসবিনী। তাকে ঘিরে গোল হয়ে যে সব নগ্ন-স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি বসে আছে—এরা সবাই তার সন্তান। সন্তানের শুভ কামনা বেজে উঠছে জাহ্নবীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে। পূর্বের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকলেও এই মুহূর্তে জাহ্নবী আর পরাশরের —দুজনের মধ্যে মাতা-পুত্র সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। জাহ্নবীর ঠিক সামনা-সামনি

কম্বলের আসনে বসে আছে নিরঞ্জন। এ আসনটা ও নিজেই বেছে নিয়েছে। চক্রে বসার আগে দেবী-পূজোয় দেবী-আহ্বান ভোগ-নিবেদন আর বলিদান অনুষ্ঠান এক এক করে শেষ করেছে পরাশর। বলির পশুটাকেও পাহাড়ী কুকুরের মুখে ধরে দিয়েছে। মহানন্দে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে টেনে নিয়ে গেছে কুকুরটা ঝোপের আড়ালে।

পরাশর আত্মানন্দের আদেশমতন সকলকে সচেতন করে দিয়েছে। বলেছে, মহাপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে আমাদের। খুব হুঁশিয়ার হয়ে। মানুষের চরম ভোগের সব রকম বস্তুই থরে থরে সাজানো রয়েছে। পঞ্চ ম-কারের চারটি ম-ই। মদ্য মাংস মৎস মুদ্রা। আর মৈথুনের প্রলোভন? সে তো পাশাপাশি সামনা-সামনি উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ মূর্তি। দুরূহ সাধনা। প্রকৃতির আকর্ষণকে জয়। নিজের কাছে নিজেকে বিজয়ী করে তোলা। বিজয়ী করে তোলার প্রধান আশ্রয় নারী। নারীকে ভোগের বস্তু ভাবলে চলবে না। শ্রদ্ধেয়া ভাবতে হবে। দেবীর আসনে বসাতে হবে। কোন ত্রুটি হলে পতন অনিবার্য। যাদের মন দুর্বল তারা যেন আসেন—চক্রে না বসে। চক্রে বসেও যদি মনের কোণে কামনার 'ক' উঁকি মারে, তখুনি আসন ছেড়ে সরে যাওয়া উচিত হবে তার এক তিল দেরী না করে। চতুর্দিকে ভোগ আর ভোগ। তার মধ্যে দিয়ে ত্যাগী মনকে জাগিয়ে তুলে নির্বিঘ্নে-নির্লিপ্ত ভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে পরীক্ষায়। সাবধান, সাবধান, সাবধান!

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর আকাশ বুঝি কেঁপে উঠল। গহিন রাতের বাতাসে বাতাসে বজ্রগম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল—সাবধান, সাবধান…! পুরুষদের বুকের কাছটায় হাড়ের মালা থর থর করে কেঁপে উঠল, মেয়েদের রুদ্রাক্ষের মালা। আস্তে আস্তে পা ফেলে মধ্যিখানে গিয়ে বসল পা মুড়ে জাহ্নবী। ওকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে বসল অন্যেরা। জাহ্নবীর আসনের একটু তফাতে ডান দিকে আগে থেকেই বসে আছে চক্রেশ্বর পরাশর।

পরাশর এবার বলল, বামাচার চক্রে মনে-প্রাণে বামা হয়ে যেতে হবে নিজেকে। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নিজের সত্তা দেবী-সত্তা। দেবী আর আমি অভিন্ন। চক্রেশ্বরী জাহ্নবীর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে দেবী-অঙ্গ। রূপে বর্ণে জাহ্নবী দেবীময় হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে সকলের মা—ব্রহ্মাণ্ডের মা ব্রহ্মময়ী। এই মায়ের স্বরূপ আমাদের সকলেরই স্বরূপ হয়ে উঠেছে। মনে মনে মাতৃমন্ত্র জপের সঙ্গে এই চিন্তা এই মাতৃকান্যাস একাগ্রচিত্তে করতে হবে আমাদের সকলকে। এটা আত্মসম্মোহন সাধনা। প্রত্যেকেই এক একজন 'মা' হয়ে

উঠব। বিশ্বের মা। বিশ্বমায়ের অধীনে বিশ্বমন। বিশ্বমনকে পরিবর্তন করে সংযমের পথে আনতে গেলে বিশ্বমায়ের সাধনায় বিশ্বমা হয়ে উঠতে হবে প্রথমে। নিজে জিতেন্দ্রিয় না হলে অপরকে জিতেন্দ্রিয় করে তুলতে পারা যায় না।

যা কিছু বলার সবই খুলে বলেছে পরাশব। আর বলার নেই। জপ করতে ন্যাস করতে শুরু করল দু'চোখ বুজে। কিছুক্ষণ। বেশ তন্ময়তা আসছিল, হঠাৎ বুকের মাঝখানটায় কে যেন সজোরে ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সংবিৎ ফিরিয়ে আনল। চোখ খুলতেই চক্ষুস্থির। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আসছে নিরঞ্জন। জাহ্নবীর কাছ বরাবর এসে গেছে। কোন খেয়াল নেই জাহ্নবীর। গভীর ধ্যানে মগ্ন। এমন ভাবে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে নিরঞ্জন, যেন চোখ দিয়েই জাহ্নবীর সমস্ত শরীরটাকে গিলে খাবে ও নিমেষে। উঠে পড়ল পরাশর। আর দেরা করলে সমূহ বিপদ। বাধা দিতে হবে। না হলে বাঘের মতন থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে জাহ্নবীর ওপর। সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মুখোমুখি নিরঞ্জনও। গর্জে উঠে বলল— তন্ত্রসাধনা অনেক করেছি। বাধা দেবার কি আছে? আমারও তো স্ত্রী রয়েছে। বেকুবের মতন বাধা দিতে যাব না। চেঁচামেচিতে ধ্যান ভাঙল জাহ্নবার।

ওসব বেল্লিকপনা চলবে না। তোমার দলবল নিয়ে চলে যাও এখুনি। তন্ত্রসারের সাধনাটা ভালো করে শিখে তার পর এসো। ধমকের সুরে বলল পরাশর। বলল, প্রকৃতির আকর্ষণকে জয় করতে বলা হয়েছে! ধ্যান না করে বসে বসে বেশ মদ গিলেছ তা দেখছি। দূর হও এখান থেকে।

কামনায় বাধা পড়তে ভাষণ উগ্র হয়ে উঠল নিরঞ্জন। তার ওপর ধমক। বাজখাঁই গলায় বলল, তিন পুরুষের তান্ত্রিক আমরা। আমায় জ্ঞান দেওয়া ভালো করে শিখিয়ে দিচ্ছি তোকে। দলের লোকদের শিস দিয়ে ডাকতেই আসন ছেড়ে উঠে এলো ওরা। গতিক-সতিক সুবিধের নয়। ওরা দলে ভারীও। জাহ্নবীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল পরাশর। মুখ বুজে দৌড়েছিলও দুজনে অনেকটা। পাছে আওয়াজ শুনে ধরে ফেলে।

কিন্তু শেষ অবধি ধরা পড়ল দুজনে। নেশায় টর ওরা, তবু ওদের আসুরিক শক্তির কাছে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ভোগ করতে হয়েছে পরাশরকে বেশী। দৈহিক যত আক্রোশ সকলের তারই ওপর। কিল-চড়-লাথি নখের আঁচড় দাঁতের কামড়—কিছু আর বাকি নেই। জাহ্নবীর ওপর যারা পড়েছে, মদের দাপটে সমস্ত শরীরের শক্তি হীন হয়ে এসেছে তখন তাদের। জাহ্নবী আহত হয়নি। জ্ঞান হারিয়েছে ভয়ে ত্রাসে—ওদের দেহের চাপে।

এদেরই দৌড়াদৌড়িতে এদেরই পড়ে যাওয়াতে দেখেছিলুম আমি প্রেতছায়ার দৌড়াদৌড়ি, প্রেতছায়ার অদৃশ্য হওয়া। আত্মানন্দ দেখেছিলেন ওদেরই। ওনার দূরদৃষ্টি ভুল নয়। তাই নির্দ্বিধায় অনুসরণ করেছেন আমার ভং-ভর দেখেও।

ভর্ৎসনা করলেন আত্মানন্দ পরাশরকে। তিনি যে সময় দিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এসে পৌঁছেছেন। তিনি নিজে সামনে থেকে চক্র-অনুষ্ঠান করাবেন বলেছিলেন, তা সত্ত্বেও সাত-তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দেয়াটা উচিত হয়নি মোটে। এত শীগগির সাধনায় নিজেকে সাবালক ভেবে নেয়া একেবারে যুক্তিযুক্ত নয়। অভিজ্ঞ লোককে সামনে না রেখে বামাচার সাধনা সঙ্গত নয়। বার বার বললেন আত্মানন্দ—তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে প্রথমে এ ক'টাতে সিদ্ধিলাভ করতে হবেই হবে—গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব—এই পঞ্চতত্ত্বে। মন তৈরী করার সাধনায় মনস্তত্ত্ব না জানলে চলবে কেন? লোকের মনের খবর না রেখে, যাকে তাকে নিয়ে যখন তখন সাধনায় বসলে বিভ্রাট তো বাধবেই। নিরঞ্জনের মন পরাশর বোঝেনি। বোঝবার চেষ্টাও করেনি একবারের জন্য। আত্মানন্দের সাবধান করে দেবার পরেও।

পরের দিন অমাবস্যার রাতে বামাচক্রের অনুষ্ঠান করলেন আত্মানন্দ নিজেই। নিজের মনোমত লোকদের নিয়ে। এবারেও চক্রের মধ্যিখানে বসে আছে জাহ্নবী। স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরে উঠেছে মুখখানা। জাহ্নবী বড় হয়ে উঠছে। বড় বড়—অনেক বড়। চক্রের সাধক-সাধিকারা ছোট। খুব ছোট। জাহ্নবীর শিশুসন্তান এরা। অপূর্ব দৃশ্য। সকলে ধ্যানমগ্ন। সকলের নিঃশ্বাস একসঙ্গে একটা নিঃশ্বাস হয়ে পড়ছে একই সময়ে। মিশেছে বাতাসেও। সকলের বুকের ওঠা-নামাটা একটা মাত্র মানুষের বুকের ওঠা-নামা হয়ে উঠেছে। একটা জীবনের একটাই স্পন্দন বুঝি।

নিষ্ক্রিয় দেহগুলো নিশুতি রাতের মহাশ্মশানের মতন এই সাধনভূমির একটাই শব। আর সেই শবের বুকে একটা জীবনের স্পন্দনে তন্ত্রের প্রথমাবিদ্যা কালিকা-শক্তির নৃত্য চলছে যেন বামাচার সাধন-চক্রে।

শুনেছিলুম চক্রে সমবেত সাধনার একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। একই বহু আর বহুই এক—এই ভাবকে অনুভূতির স্তরে স্তরে জাগিয়ে তোলা। সেটা দেখলুম চাক্ষুষ। অনুভবও করলুম প্রাণে প্রাণে।
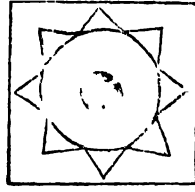
পাতরোলের ঘটনাটা একটা বিভীষিকা।

আজ মনে পড়লে সর্বশরীর শিউরে উঠে আমার। ইন্দ্রনাথ তন্ত্র-সাধনায় যে দিকটা বেছে নিয়েছিল, সে দিকটার গভীরে প্রবেশ করেনি। নিজের মনোমত মানে করে নিয়ে, সাধনা শুরু করে দিয়েছিল। ভেবেছিল, তার ভেতরের সমুদ্র-প্রমাণ বাসনা পূরণের এইটাই শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রেষ্ঠ পথে পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল মহা আনন্দে। রাস্তা এত সরু আর তু'পাশে যে বিরাট খাদ ভয়ঙ্কর-মুখে হাঁ করে রয়েছে, পড়লে গিলে খাবার জন্যে—সেধারে কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি।

আত্মসুখী নেশাপাগল ইন্দ্রনাথ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সুরার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল আরো। চিরদিনের অভ্যস্ত পানদোষ থেকে দূরে সরেনি। সরতে চায়ওনি এতটুকু। ফলে তার অতীত স্মৃতি আর বর্তমান আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছল সাধনার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। অতীত বর্তমান আর ক্রিয়াকলাপের মিলনে ত্র্যহস্পর্শযোগ ঘটেছিল ইন্দ্রনাথের জীবনে। ত্র্যহস্পর্শযোগের নৃশংস প্রতিক্রিয়া-প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে একটা কার্তিকী অমাবস্যার মাঝরাতে।

সমস্ত শ্মশানটাই ভিজে ভিজে। হিমেল বাতাস শুষে হিম বুকে টানছে শ্মশানের মাটি। আর সেই মাটির ওপর বাঘের ছালের আসন পেতে বসে বসে জপ-ধ্যানে নিজের বুকের মাঝখানে টেনে আনতে চেষ্টা করছে নটিনী-দেবীকে ইন্দ্রনাথ। সাধনকাণ্ডের নটিনী সাধনাটাই তার পছন্দ। তাই নটিনী-সাধনা করছে মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে।

বলির বাজনা বাজছে দূরের কালীবাড়িতে। ভক্তদের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি নিশুতি নিস্তব্ধ রাতের বাতাসে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে। প্রবাদ অনুযায়ী পুরনো দিনের ডাকাতে-কালী জীবন্ত হয়ে উঠছে যেন। কালীপুজোর এই বিশেষ দিনটায় এই রকমই হয় নাকি। আকাশচুম্বী মন্দিরের ভেতর ছোট্ট

কালো পাথরের কালীমূর্তি। খুব ছোট্ট। রাশি রাশি ফুল-বেলপাতায় মূর্তির সব অঙ্গই ডুবেছে। মুখটুকু বাকি কেবল। ভক্তরা হয়তো মুখখানা বাদ দিয়েই সাজিয়েছে।

দেবীর ত্ব'পাশে প্রদীপ আর চারকোণে চারটে হ্যাজাক আলো জ্বলছে। ভেতরটা আলোয় আলো। দিন হয়ে উঠছে। বাইরের রাস্তা, রাস্তার ত্ব'ধারে ধানক্ষেত আর দূরে দূরে এদিক-ওদিক ছড়ানো এক একটা খোড়ো চালের কুঁড়েঘর পর্যন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। বড় বড় গাছপালাশূন্য এ জায়গাটা দেখলে, দিনের বেলায়ই ধু ধু প্রান্তর মনে হয়। রাতে মনে হচ্ছে মধুপুরের এদিকটার সমস্ত জায়গা জুড়ে শ্মশানভূমি।

তবু অন্ধকারে চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে আসছে অনেকে। দূরের কাছের। ভক্তিতে ভাটা পড়েনি এদের। টান ধরেনি। খাদ মিশেল হয়নি। বায়ু-পরিবর্তনের যাত্রীদেরও কেউ কেউ এসে পৌঁছেছে মন্দিরে গোধূলী সময়ের ভেতর। ওদের ভাড়া-করা টাঙা দাঁড়িয়ে। রাতভোর থাকবে। সূর্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যাত্রীদের আবার।

আমিও যাত্রী। মন্দিরে এসেছি পূজো দেখেছি। রাত ত্বটোর পূজো শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেবীর মহানিশার পাঠ চুক্তি। এবার আরম্ভ হচ্ছে মহাতিনিশার পূজো। সাধকের পূজো। পূজো করতে বসলেন তন্ত্রভাস্কর বিমলানন্দ। এইটা দেখতেই সবার আসা। বেড়াতে এসে আলাপ হয়েছে আমার মনোলতার সঙ্গে আর তার স্বামী সুতনুর সঙ্গে। ওরা নবদম্পতি। এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেড়াবেও বেশ কিছুদিন। ওরাও মুখে মুখে দেবীমাহাত্ম্য শুনে কৌতূহলী মন নিয়ে এসেছে পাথরের দেবীকে জাগ্রত হতে দেখতে, দেবীর হৃদয়স্পন্দনে বেলপাতা-জবার মালাগুলোর ত্বলুনি দেখতে। ভেল্কি না সত্যি যাচাই বাঝাইয়ের চোখ দিয়েই দেখছে ওরা। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সকলে দেবীর বুকের দিকে তাকিয়ে।

দেবীর গলার সমস্ত ফুলের মালাই এক এক করে খুলে রাখলেন বিমলানন্দ পাশে। উলঙ্গিনী বিশ্বপ্রসবিনী দেবীর বুকে একবার আর নিজের বুকে একবার ডান হাতের আঙুল ছোঁয়ালেন। এই প্রক্রিয়া বার-তিনেক করলেন তিনি। তারপর ধীরস্থির হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ। হঠাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলুম আমি স্বপ্নের মতন অদ্ভুত দৃশ্য। বুকটা বড্ড ওঠা-নামা করছে বিমলানন্দের। রুদ্রাক্ষের মালা তিনটে কাঁপছে থর থর করে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। পড়ল

বেশ খানিক সময় ধরে। তারপর নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দেবীমন্ত্রের উচ্চারণও। রুদ্রাক্ষের মালা তিনটে দুলছে না আর। বিমলানন্দের বুকের বাঁদিকটা স্তব্ধ-নিস্পন্দ।

বিমূঢ় হয়ে গেছি আমি। বিস্ময়ের পর বিস্ময় জেগে উঠল ভেতরে—দেবীর পাথরবুক কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে মা-মা বলে গগনভেদী চিৎকার করে উঠল অতিভক্তের দল। সমবেত সকলের ধ্যান ভাঙল, তন্ময়তা কাটল। আমরা ফিরে এলুম এক শান্ত-নিশ্চিন্ত রাজ্যের সীমানা থেকে অশান্ত পৃথিবীর বুকে।

মন্দিরের আবহাওয়াটা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুতনুও। ভিড় ঠেলে ঠেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে থেকে থেকে। খুঁজছে একজনকে। খুঁজছে একখানা মিষ্টি-মধুর মুখ। মনোলতার মুখ। পাচ্ছে না।

মন্দিরের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পাওয়া গেল না মনোলতাকে। বিদেশ-বিভুঁয়ে বিভ্রান্ত সুতনু বিমলানন্দের দু'পা জড়িয়ে ধরল ছল ছল চোখে। ধরাগলায় জানাল, তার মনে দেবীর প্রাণস্পন্দন দেখে অবিশ্বাসের দানা-যে বাঁধেনি, তা নয়। বেঁধেছিল। বিমলানন্দের বুকের কাঁপুনি দেখতে দেখতে সম্মোহিত হয়ে গেছল সকলে। দেবীর বুক কাঁপতেও দেখছিল তাই উপস্থিতেরা। এটা নিছক সম্মোহনবিদ্যার প্রভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেবতার আগমন নির্গমন নয়। এতে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা চাইছে। রোষ করে তার স্ত্রীকে সরিয়ে, তাকে যেন সাজা না দেন বিমলানন্দ।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করেছেন বিমলানন্দ। বলেছেন, যা ভেবেছ, সব ঠিক। এটারও প্রয়োজন লোকের মনে বিশ্বাস ভক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য। শাসনকর্ত্রী দেবীর অস্তিত্বের প্রমাণ দেখিয়ে মানুষের খুনী মন ডাকাত মনকে বশে আনার একটা চেষ্টা মাত্র।

যুক্তিসঙ্গত সরল সত্যিকথার আবেদন আলাদা। হৃদয়ে পৌঁছয়। এর মূল্যও অনেক। বিমলানন্দের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস এসে গেছল। শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল ভেতর থেকে। মনে হয়েছিল লাল চন্দন মাখানো এক একটা রুদ্রাক্ষ থেকে অপূর্ব জ্যোতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। গলার মালা ক'টা জীবন্ত হয়ে উঠেছে বুঝি। কপালের মাঝখানে চন্দনে আঁকা পর পর তিনটে অর্ধচন্দ্রের ওপরে লাল টকটকে সিঁদুরের তিলকটাও আলোয় আলো হয়ে উঠছে। একটা প্রদীপশিখা যেন।

অনেক সময় অনেক মানুষ যেমন নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রবল হওয়ার জন্য বিপদের আঁচ পায় আগে থেকে, তেমনি কার আশ্রয় নিলে বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারবে—এটাও জানতে পারে। জানার ইচ্ছে করে নয়। ভেতর থেকে কে যেন জানিয়ে দেয়, কে যেন বলে দেয়। সুতনুর ভেতর থেকেও কে যেন বারবার বলতে লাগল—কোন ভয় নেই। বিমলানন্দই বলে দিতে পারে মনোলতা কোথায়। বিমলানন্দই মনোলতাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারে তার কাছে।

ভেতরের অভয় বাইরেও কথা কয়ে উঠল বিমলানন্দের মুখ দিয়ে। বললেন বিমলানন্দ, ভয় নেই তোর। দেখছি কোথায় আছে। ভাবিস নে।

চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন উনি। কয়েক মুহূর্ত। চমকে উঠে চোখ খুললেন। চোখ দুটো রক্তজবা। সর্বশরীরের রক্ত এসে জমেছে যেন চোখে। উৎকণ্ঠা-বেদনার ছায়া পড়েছে মুখখানা জুড়ে। একটু আগের প্রশান্তিঝরা আমেজ নেই আর শিবসুন্দর মুখে।

আসন থেকে উঠে পড়লেন বিমলানন্দ। সুতনুকে আর অনুগতদের অনুসরণ করতে ইশারা করলেন। নিজের মুখে আঙুল দিয়ে টুঁ শব্দ করতে পর্যন্ত নিষেধ করে দিলেন সবাইকে। মন্দির থেকে বেরুলেন পা ফেলে। বেরোলুম আমরাও। এগিয়ে চলেছেন উনি। আমরাও চলেছি ওঁর পেছনে পেছনে। চলেছি উঁচু-নিচু রাস্তা পেরিয়ে, ধানক্ষেত পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে। মাঠের শেষে একটা কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশ-ভরা তারার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে আর মাটিতে পা রেখে রেখে এতখানি পথ হেঁটে এসেছি আমরা। সঙ্গে কোন আলো নিতে দেন নি আমাদের। অন্ধকারে ভূতের মতন এসেছি সব, কিন্তু ভয় করেনি একবারের জন্য, একটুও। উনি আমাদের আলো, সাহস উনি, দিকহারার দিশারীও উনি। ভাবতেও আশ্চয লেগেছে আমার—কি করে এত বিশ্বাস করে ফেলেছি আমরা ওঁকে। কি করে আমরা নিজেদের অবলম্বন করে ফেললুম ওঁকে।

কুঁড়ে ঘরটার সামনে একটু দাঁড়িয়েই ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন তাড়াতাড়ি। যে-ক'জন পারলুম, সে-ক'জন ভেতরে প্রবেশ করলুম আমরাও। বুকের রক্ত জমাট করা দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলুম। খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। কোপ মারার প্রস্তুতি চলছে বোধহয় ভেতরে ভেতরে। বলি দেবার ধারালো চকচকে খাঁড়াটা উঁচিয়েই ধরেছে। ঘাড়ের কাছটায় তাক

করে রেখেছে। বসিয়ে দেবো বসিয়ে দেবো ভাব। মাটির দেয়ালের কোণ ঠেসে বসে আছে মনোলতা। প্রাণভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। মুখে কথা নেই, ওঠবার ক্ষমতা নেই। নেই পালাবারও। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে দেখে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। দেখছে ইন্দ্রনাথকে। মধ্যিখানের মেঝের মাটিতে নিভু-নিভু মশালটা পোঁতা রয়েছে। দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন কি দেখছে ইন্দ্রনাথ যে, পেছনে অত লোক—সেটা উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারছে না। মনোলতার মধ্যে ইন্দ্রনাথ যাই দেখুক না কেন, যাই ভাবুক না কেন ওর বিষয়ে—সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, মনোলতাকে ইন্দ্রনাথের কবল থেকে টেনে বার করে আনা। ইন্দ্রনাথের প্রাণঘাতী খাঁড়ার নিচে থেকে মনোলতার প্রাণটাকে বাঁচানো।

পেছন থেকে বড় বড় চোখ করে ইন্দ্রনাথের ঘাড়ের দিকে চেয়ে আছেন নিমেষনিহত দৃষ্টিতে বিমলানন্দ। টলছে ইন্দ্রনাথ। পড়ে যাবে বুঝি এবার। পড়ে যাচ্ছে, পড়ে গেল মাটির মেঝেয় মুখ থুবড়ে। হাতের খাঁড়াটা ছিটকে পড়েছে দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে। বেহুঁশ হয়ে পড়েছে ইন্দ্রনাথ। এগিয়ে গেলেন বিমলানন্দ। হাত ধরে তুললেন মনোলতাকে। মৃত্যুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে কাবু হয়ে পড়েছিল মনোলতা। স্নায়ু শিথিল, অঙ্গ শিথিল। হিমশীতল পরিবেশে প্রাণটুকু ধুকপুক করছিল শুধু।

মনোলতা পুনর্জীবন ফিরে পেল বিমলানন্দেরই জন্য। যথাসময়ে বিমলানন্দ না পৌঁছলে, একটু দেরী হয়ে গেলে হয়তো মনোলতাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত না। অনুশোচনার অতীত একটা নিদারুণ অন্যায়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারা যেত না আর ইন্দ্রনাথকেও।

একটা ভয়াবহ মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথের একগুঁয়েমির জন্য—নটিনী-সাধনা করতে গিয়ে। নটিনী-সাধনা অতি উচ্চস্তরের। অতি উদার মনের মানুষই এ সাধনার একমাত্র অধিকারী। অন্তরে-বাইরে সাধককে প্রকৃত ত্যাগী হতে হবে। তা না হলে সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে তার। অবিশ্যি নটিনী-সাধনার বিষয় লেখা আছে সাধনকাণ্ডে—অভিধান খুলে মানে করলে—কামনা-বাসনা পূরণের সাধনাই বোঝায়।

সাধনায় সিদ্ধ হলে, দেবী স্বয়ং সুন্দরী নর্তকীর বেশে সাধকের সামনে এসে উপস্থিত হন। সাধককে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক করে মনোবাঞ্ছা, পূর্ণ

করেন। শত্রু-মিত্র বশীভূত হয়ে থাকে সব সময় সাধকের কাছে। সকলের প্রভূ হয়ে আনন্দে কাটায় সাধক সারা জীবন। সাধনকাণ্ড পড়ে অকূলে কূল পেয়েছিল যেন ইন্দ্রনাথ। সহজে বিনা পরিশ্রমে বহু পয়সা আমদানি হবে তার ঘরে দেবীর কৃপায়। সুরা আর সুন্দরী নিয়ে অহর্নিশি মেতে থাকার কোন অসুবিধে হবে না। ভোগ-লালসার সাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে সাঁতার কেটে বেড়াবে সর্বক্ষণ।

নটিনী-সাধনার রূপক ব্যাখ্যাব মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে চলে গেছলেন বিমলানন্দ। নটিনীর আসল রূপ দেখেছিলেন, নটিনী-সাধনার মর্মার্থ অনুভব করেছিলেন। ফলে-ফুলে শস্যে-জলে ভরা যুবতী নটিনী এই পৃথিবী দেবীই। এর বিশাল ঐশ্বর্য সর্বত্র ছড়ানো। প্রসূতি শক্তি পৃথিবী পূজারীর দুঃখ-কষ্ট কোথায়? যার মা এত ঐশ্বর্যশালিনী, সে ছেলের অভাব তো মনেরই অভাব স্রেফ। ঐশ্বর্যের মাঝেই জন্ম যরি, ঐশ্বর্যের মাটি মেখে মানুষ যে, সে চেষ্টা করলেই, মাটির ঐশ্বর্য-ফসলকে উপাসনা করলেই দুঃখদৈন্যের অবসান। ঋতুতে ঋতুতে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে নর্তকীর বেশে দেখা দেয় সন্তানের দিব্যদৃষ্টির সামনে নটিনী-পৃথিবী। নটিনী-মায়ের যে সন্তান সুখে আত্মহারা নয় দুঃখে কাতর নয়—সে-ই সবার প্রভু হয়ে ওঠে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল ইন্দ্রনাথ বিমলানন্দের কথা শুনে। কি শ্লোকের কি মানে করেন বিমলানন্দ!

শিষ্যের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেছিলেন আবার বিমলানন্দ—প্রবৃত্তির দাস মানুষকে সাধনার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে বলে সাধনরাজ্যে টেনে আনে এসব শ্লোক। জ্ঞানী গুরুই শিষ্যকে আলোর পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন এক একটা শ্লোকের আসল অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে, সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিয়ে দিয়ে।

নটিনী-সাধনা নিয়ে বিমলানন্দের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছিল ইন্দ্রনাথের। গুরুগৃহ ত্যাগ করেছিল ইন্দ্রনাথ।

নটিনীদেবীর জপমন্ত্র শ্মশানে বসে বসে জপ করত প্রতি রাতে একা একা। নটিনীদেবী আসবেন নিশ্চয়। সোনার মোহর ঢেলে দেবেন ঘড়া-ঘড়া। কালীপুজোর রাত্তিরে জপশেষে মন্দিরে দেবী দর্শন করতে এসেছিল ইন্দ্রনাথ যখন, মনোলতাকে সামনা-সামনি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার জন্য হাজির হয়েছে এসে নটিনীদেবী মন্দিরে। শ্লোকের ছত্রে ছত্রে নটিনীদেবীর রূপমাধুরী যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক তেমনি। হুবহু মিল।

ইন্দ্রনাথ চোখ ফেরাতে পারছে না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। দু'চোখের পলক থমকে গেছে। নড়ছে না, পড়ছে না। কিন্তু দেবীর হাবভাব এমন—চিনতে পারছেন না যেন তাকে একদম। অথচ তার অন্তরের আকুতি মেশানো আহ্বানেই আসা দেবীর! ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারছে না—এটা ওঁর ছলনা না পরীক্ষা।

দেবীকে ঘরে নিয়ে যাবার প্রবল আগ্রহ জেগে উঠছে ভেতরে। সেই সঙ্গে সম্মোহন করার ইচ্ছেটাও। স্বেচ্ছায় যাবেন না দেবী বোধহয় তার ডেরায়।

ইন্দ্রনাথের সম্মোহন শক্তির প্রভাবই মনোলতাকে মন্দিরের অত ভিড়ের মধ্যিখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে ডেরায়। সে-সময় সকলে পাথরের কালীকে জাগ্রত হতে দেখবে বলে আকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে মূর্তির দিকে। আর স্বতনু? সংশয়ভরা মন নিয়ে দেখছে ব্যাপারখানা কি? স্ত্রীর দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না।

সম্মোহিতা মনোলতাকে ডেরায় এনে পুজোপাঠ করেছে ইন্দ্রনাথ নটিনী জ্ঞানেই। মরার খুলি ভর্তি মদ গিলেছে থেকে থেকে। আকণ্ঠ ডুবিয়েছে। অবাক হয়েছে। নটিনীদেবীর কাছ থেকে বর পেল না, ধনরত্ন পেল না। মাথার ভেতর চিন্তা-বুদ্ধির ওলট-পালট হতে শুরু করেছে। দেবী সম্মোহিতা বলেই হয়তো ফল ফলছে না। সম্মোহনের প্রভাব গুটিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে।

চেতনা ফিরে পেল মনোলতা। চিৎকার করে উঠল সভয়ে। অচেনা ঘরে অজানা পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখছে। কাছে-পাশে কেউ নেই। নেই স্বতনুও। যমদূতের মতন দেখতে লাল চেলি পরা লোকটা আর সে—দু'জনে ভেঙে পড়া কুঁড়েঘরের মধ্যে। কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন। ঠাণ্ডাতেও ঘামছে মনোলতা। হিম হয়ে আসছে সর্বাঙ্গ। কাঁপুনি ধরছে। কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে।

এ কি দেখছে ইন্দ্রনাথ? দৃষ্টিভ্রম, না মতিভ্রম, না সত্যি? সাপটা ফণা বিস্তার করে দুলছে। ছোবল মারার পূর্বলক্ষণ। সাপটা জাতসাপ। শমন। খুব চেনা। এ সাপকে দেখেছিল বছর পনেরো বয়সে। জঙ্গল জলাভূমি পেরিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে আসছিল ছুটে ছুটে। পথে একেবারে সাপের গায়ে পা। প্রাণপণে দৌড়েছে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে সাপের রোষ থেকে বাঁচার জন্য। বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরে—ঘরের চারপাশে হিস-হিস আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে সাপটা। দেখেছে সকলে।

আত্মীয়-স্বজনরা লাঠিপেটা করে সাপটাকে মুক্তি দিয়েছে। মরা সাপটাকে দেখেছে ইন্দ্রনাথ। কামড়ালে নিঃশ্বাস নেবার সময় পেত না একপলও। এ সাপ সেই সাপ। নটিনীদেবী সত্যি আসেনি। এসেছে তাঁর বিভীষিকা নটিনীর রূপ ধরে। মরা সাপের রূপ ধরেছে এবার সময় বুঝে। শোনা গেছে দেবী আসার ঠিক আগের মুহূর্তে অনেক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সাধক। ভয়কে জয় করতে পারলেই দেবী আসতে বাধ্য।

পুজোর বেদি থেকে মন্ত্রপূত খাঁড়াটা তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। বিভীষিকাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এখুনি। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে।

এসে পড়েছিলেন বিমলানন্দ। ইন্দ্রনাথকে সম্মোহন করে অচৈতন্য রেখে উদ্ধার করেছিলেন মনোলতাকে। হাসিমুখে সুতনুর দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যেতে বলেছেন তাড়াতাড়ি।

বিমলানন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন আমার কাছে—মদের প্রতিক্রিয়াটাই ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিভ্রম মতিভ্রম ঘটিয়েছে। সাধক-জীবনে বিপর্যয় এনে দিয়েছে। পঞ্চম-কারের প্রথম ম-কার মদ্য। মদ্য-সাধনা কারণবারি বা কারণজলের সাধনা। কারণজল সৃষ্টির আদি শক্তি। জল থেকেই জগৎ, জল থেকেই জীব, জল থেকেই জীবন। জীবনের জীবন জলই সবের কারণ। আদি শক্তির এই লীলা-মাহাত্ম্য প্রাণে-প্রাণে অনুভব করাই প্রকৃত কারণ সাধনা। বলা সত্ত্বেও কারণ-সাধনার এত সুন্দর ভাবটা গ্রহণ করেনি ইন্দ্রনাথ। করতে চায়ওনি। চাইলে ধীরে ধীরে মদের মাত্রা কমে আসত। শেষ পর্যন্ত নেশার রাজ্য থেকে মদের নির্বাসন হয়ে যেত বরাবরের জন্য। স্বচ্ছ দৃষ্টি স্বচ্ছ মন। মনের আয়নায় তন্ত্ররহস্যের ছবি দেখে দেখে অনাবিল আনন্দে বিভোর হয়ে উঠত।
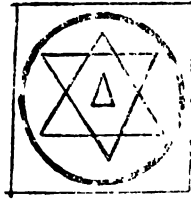
মুখ নেই। মুখের কোন আদলও না। নেই নাক কান ঠোঁট দাঁত ভুরু, আছে শুধু একটা মাত্র চোখ। বেশ বড়সড়। কালো পাথরের দেয়ালে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মানুষ নড়ছে এদিক-ওদিক। ওদের নিঃশ্বাসে প্রদীপের শিখাটা কেঁপে উঠছে। থরথরে আলোয় মনে হচ্ছে নড়ে উঠছে চোখটা, পাতা পড়ছে ঘন ঘন।

এদিকের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জাহ্নবী দেবী। ওঁর দু'চোখ ওই একটা চোখের ওপরই আটকে রয়েছে। অপলক-স্থির দৃষ্টি। শিখার কাঁপনে দৃষ্টি কেঁপে উঠছে না, চঞ্চল হয়ে উঠছে না।

একটা মুখে তিনটের আভাস। জাহ্নবী দেবীর মুখখানায় তাই দেখছি আমি। দুটো ভুরুর মাঝ বরাবর ত্রিশূলের মতন একটা পরিষ্কার রেখা ফুটে উঠছে। রেখাটা যেন সত্যি সত্যিই ত্রিশূল হয়ে উঠছে—ঠিকরে বেরিয়ে, জাহ্নবী দেবীর কোপে পড়েছে যে, তার বুকে বিঁধে হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো করে ফেলবে বলে। চোখের তারায় ভয়ঙ্করীর ছায়া পড়েছে, রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বমুহূর্ত। ঠোঁট চাপা মৃদু হাসি—এ দুটো ভাবের মধ্যে একটায়ও পড়ে না। সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কি রকম আলাদা—সেই চিন্তাই মাথার মধ্যে তোলপাড় করছে আমার।

চিন্তায় ধরতে গিয়েও ধরতে পারছি না। আগের দুটোই এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে কেবল। দাঁড়াচ্ছে জাহ্নবী দেবীর অদ্ভুত রোমাঞ্চকর জীবনের দুটি প্রধান অধ্যায়।

ছিটেবেড়ার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জাহ্নবী দেবী। ভেতরের দরজা দু'ফাঁক করে খোলা। খোলা পাল্লার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখছেন। ঘরের মধ্যে দুজন। আনন্দভৈরব আর সীতা। আনন্দভৈরবের আধচাওয়া চোখে সুরার ঘোর গোলাপী ছোপ। সীতার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে টস টস করে

জাহ্নবী দেবীর চোখেও জল। ভেতরটায় বড্ড বেশী মোচড় দিয়ে উঠছে

মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছেন—ও ঘরের কালীমূর্তির দিকে। পাশে কাঠের জলচৌকির ওপর সিঁদুর মাখানো বলির খাঁড়াটা শোয়ানো রয়েছে।

বাইরের ঘরে বাঘছালের ওপর পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দভৈরব। ডানহাতের মুঠো থেকে তর্জনীটাকেই বার করে রেখেছে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে। আঙুলে একটা লম্বা লাল রেশমী সুতো পাকানো। ঝুলছে নিচে অবধি। মেঝে থেকে একটু ওপরে। মুখটায় একটা হাল্কা সোনার পাত বাঁধা। পাতে খোদাই করা কালী-যন্ত্র। পর পর পাঁচটি নিম্নমুখী ত্রিকোণের ভেতর পাশাপাশি ক্রীঁ আর হ্রীঁ বীজমন্ত্র লেখা।

যন্ত্র দুলছে। ঠিক পীঠাসনের দু'আঙুল ওপরে। ত্রিলৌহের পাতে—সোনা, রুপো আর তামার মিশেলে গড়া—দেবীর আসন—একই কালীযন্ত্র আঁকা। ব্যতিক্রম শুধু প্রত্যেক ত্রিকোণের কোণে কোণে এক একটা কথা সাজানো—লাভ ক্ষতি ভালো মন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষের চাহিদা প্রশ্ন আর উত্তর এই যন্ত্রে জড়ানো। প্রশ্নের উত্তর মেলে অব্যর্থ। যে-কোন অশুভ দূর করার প্রতিকারেরও।

আনন্দভৈরবের নাম-ডাক খুব তন্ত্রের এ গুপ্তযন্ত্রের গণনায়। এসেছে বহু লোক। আসছেও। যারা আসে, তারা ভৈরবকে দেবতাজ্ঞান করেই আসে, দেবীর বাণীকে ভৈরব বাতাস থেকে ধরে নিয়ে আসে তার আঙুলের ডগায়। তারপর সুতো বেয়ে সেই বাণী নামে যন্ত্রে। সোনার পাতটা দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে মিনিট তিনেকের মধ্যে। ঘুরতে থাকে! এক সময় থেমে যায় একটা কথার দিকে হেলে। সেই কথাটাই আগন্তুক-জিজ্ঞাসুর সঠিক উত্তর। পৃথিবীর ওলট-পালট হবে, কিন্তু এ উত্তরের পরিবর্তন হবে না কোনদিন কখনো।

জাহ্নবী দেবী জানেন সব। এ বিদ্যা তাঁর আয়ত্তে। আয়ত্তে বলেই এত অভিমান এত ক্ষোভ। আনন্দভৈরব তাঁকে দিয়েই এ গণনা করাতো আগে। আনন্দভৈরবের কাছেই শিক্ষা তাঁর। এখন দূরে সরিয়ে রাখার কারণও যথেষ্ট আছে। কারো ভবিষ্যৎ শুভ পেলে অশুভ বলবে। ভীষণ ত্রাস ধরিয়ে দেবে। ধন মান প্রাণ খোয়া যেতে আর বেশী দেরী নেই! অতি প্রিয়জনেরও নির্মম মৃত্যু দেখতে হবে চোখের সামনে।

শুনে, দুর্বল মনের মানুষ বিবেকহারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে সর্বস্বান্তের পথে পা বাড়ায়। যেটুকু শেষ সম্বল শেষ কপর্দক—তাও নির্দ্বিধায় এনে আনন্দভৈরবের পায়ের কাছে ধরে দেয়।—যা হয় একটা প্রতিকার কর ঠাকুর। তুমি অগতির গতি, বিধিলিপি খণ্ডাতে পারো একমাত্র তুমিই!

আশ্রিতরা হাপুস নয়নে কেঁদে চোখের জলে ধুইয়ে দেয় আনন্দভৈরবের দু'পা।

এ ব্যাপারে আনন্দভৈরবের চোখের কোণে জল টলমল করে উঠতে দেখেননি জাহ্নবী দেবী একেবারের জন্য। নিজে কেঁদে চোখ মুছেছেন আড়ালে। আড়ালে মোছাটা এখন নিত্যকর্মপদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকের দুঃখদৈন্যের সুযোগ নিয়ে নির্দয়ভাবে তাকে আরো জীবন্মৃত করে রাখার এ খুনী-খেলা খেলতে বারণ করেছেন অনেক। নিরাশ হয়েছেন। নিজের কথার একবর্ণও যে প্রবেশ করাতে পারেননি আনন্দভৈরবের কানে—আচার-ব্যবহারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। নগদ টাকার অভাবে গায়ের গয়না খুলে দিয়েছে কেউ কেউ। সেই সব গয়না হাসিমুখে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ না করেই মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে দু'হাতে। ভেতরে এসে জাহ্নবী দেবীকে পরতে অনুরোধ করেছে বার বার। বলেছে, বহু দুঃখ পেয়েছ। তোমাকে সুখী করবই আমি।

এ সুখ চান না জাহ্নবী দেবী। গয়নাগুলো যে বিষধর সাপের মোক্ষম ছোবল, অঙ্গে অঙ্গে দংশন করে—এটা কেঁদে-কেটে বলেও বোঝানো গেল না। মনুষ্যত্ব হারিয়েছে মানুষটা, পশুস্তরে নেমেছে। হিংস্র পশু। এই মানুষের ভেতরেই পশুর জায়গায় একদিন প্রকৃত মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন আর দেখেছিলেন সেই মানুষের দেবতা-রূপ। দেবতা তার অন্তরের দেবী-সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো ক'রে।

সেই ভয়ঙ্কর রাতে যদি না প্রাণ ঢালা ভক্তি উজাড় করে দিয়ে মাতৃশক্তিকে আহ্বান করত, যদি না তাঁর মধ্যে সেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব ঘটাতে পারত, তাহলে এতদিনে জাহ্নবী দেবীর কোন অস্তিত্বই থাকত না হয়তো পৃথিবীর বুকে। একটা অজ্ঞাত ঘুটঘুটে অন্ধকার পাতালপুরীর একটা নিরালা ঘরে বন্দিনী অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে মরতে হতো।

মরণকে জয় করতে শিখিয়েছিল সে-রাতে আনন্দভৈরব।

খোলার চালে মড় মড় আওয়াজ হচ্ছে। খোলা ভাঙছে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো ভারী পায়ের চাপে। ধপাস ধপাস করে চাল থেকে লাফিয়ে পড়ল বহু লোক। ভাঙল ওরা ঠাকুরঘরের দরজা টাঙি দিয়ে শাবল দিয়ে। ভেতরে তখন কালীযন্ত্রের ওপর বসিয়ে জাহ্নবী দেবীর পায়ে রক্তজবা দিয়ে একমনে পূজো করে চলেছে আনন্দভৈরব।—বিশ্বব্যাপী যে শক্তি, সেই শক্তি তুমিই। তোমার শক্তি এক নিমেষে সকলের শক্তি হরণ করে নিতে পারে। তোমার ভয়ঙ্করী-রণরঙ্গিনী মূর্তি দুর্জনের মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু ··

শুনতে শুনতে জাহ্নবী দেবীর মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল যেন। নিজে যে জাহ্নবী দেবী একথা ভুলে যাচ্ছিলেন। ভুললেন একদম। মনে হলো, কোথা থেকে যেন প্রচুর শক্তি এসে জমা হচ্ছে ভেতরে। মনে হলো, তিনি ভয়ঙ্করী, তিনি রণরঙ্গিনী-কালী। উঠে দাঁড়ালেন। পাশে রাখা কালীর খাঁড়াটা তুলে নিলেন। তারপর সামনে দাঁড়িয়েছিল যারা, যারা দিনে দেবতা রাতে ডাকাত —তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দভৈরবের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে—তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে কি যে হয়ে গেল কেউ বুঝে উঠতে পারল না। একটা মর্মছেঁড়া আর্তনাদে সচেতন হয়ে উঠল সবাই। খাঁড়ার গায়ে সর্দার গোছের লোকটার ডান হাতখানা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে খসে পড়েছে মাটিতে। রক্তে রক্ত। কাটা হাতখানা তুলে নিয়ে দৌড়ল লোকটা। ওর অনুগামীরাও সকলে মিলে দৌড়ল পেছু পেছু একতিল দেরী না করে।

নিস্তব্ধ রাত আরো নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে উঠল।

জাহ্নবী দেবীকে আবার পূজো শুরু করল আনন্দভৈরব। কোশার জল পায়ে ঢালছে। ঢেলেই চলেছে স্তবমন্ত্রের সঙ্গে।—ত্রিজগতাং তুষ্টা সতী বরেণ্যা কুমারী বীরা···জননী কালিকা শিবা···। তুমি সতী তুমি কুমারী তুমি মমতাময়ী মা। তুমি শান্তসুন্দর প্রসন্নময়ী। তুমি শান্ত হও। ফিরে এসো মানবী রূপে আবার। ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো···।

ফিরে এসেছিলেন জাহ্নবী দেবী স্বাভাবিক অবস্থায়।

একটাও কথা বলেননি মুখে, শুধু তাকিয়েছিলেন আনন্দভৈরবের দিকে। দেখার অর্থ বোঝে আনন্দভৈরব। চোখের এ নীরব ভাষার মর্মও বুঝেছিল।

ওরা যে জাহ্নবী দেবীকে এই ভাবে নিয়ে যেতে আসবে এটা তো অজানা ছিল না দুজনেরই। কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল ক'দিন ধরে। সাবধান হতে বলেছিলেন জাহ্নবীদেবী। মুঙ্গের শহরে বা কোন দূর গাঁয়ে তাঁকে নিয়ে চলে যেতে বলেছিলেন। এমনিতেই জায়গাটা পাণ্ডব-বর্জিত। লোকজন নেই বললেই চলে। দিনের বেলাতেই চণ্ডীস্থানের মন্দিরে একা আসতে ভয় পায় লোকে, রাতে তো কথাই নেই। দস্যিদানার অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এখানে আবার ডেরা বেঁধে মরার জন্য স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকে নাকি কেউ? এখুনি স্থানত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত।

জাহ্নবী দেবীর সমস্ত যুক্তিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল আনন্দভৈরব একটা

কথায়।—ভয় পেলেই ভয় পেছু পেছু দৌড়য়, ভয়কে জয় করাই আসল সাধনা—ভয়ের মৃত্যু এখানে।

ভয়ের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখলেন জাহ্নবী দেবী। তবুও নতুন করে ভয় ধরতে লাগল তাঁর। বললেন, এ যাত্রা না হয় গেল ওরা, আবারো আসতে পারে তো?

আর আসবে না ওরা কখনো এ ডেরার ধারে কাছে। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। হাসতে হাসতে বলেছে আনন্দভৈরব।

সত্যিই ওরা আর চড়াও হয়ে এখানে আসেনি কোনদিন। কিন্তু ওদের মন ওদের প্রবৃত্তি এসে জেঁকে বসেছে আনন্দভৈরবের মনে, প্রবৃত্তিতে। আনন্দভৈরব একাই ওদের বহুজনের সমান হয়ে উঠেছে। ভয় আর বাইরের লোককে নয়। ভয় ঘরে আনন্দভৈরবকে।

বয়েসের হিসেব-নিকেশ নেই বটগাছটার। এই একটা মাত্র বটগাছ এখানে। লোকে বলে ওটা শত-আয়ু পেরিয়ে চলেছে। এই গাছের তলায় ধুনি জেলে বসে থাকত আনন্দভৈরব। একমাথা জটা, একমুখ দাড়ি। পরনে লাল কপনি। সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা জ্যোতি ফুটে বেরোত। মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস হতো না কারো। দূর থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে পালিয়ে যেত সবাই। কে জানে গম্ভীর ধ্যানমগ্ন সাধুর ধ্যানভঙ্গ হলে অভিশাপে না পড়তে হয় শেষে।

সেই শিবতুল্য সাধু গাছতলা ছাড়ল। ঘর তৈরী করল। যা ছাড়ল যা করল—সব জাহ্নবী দেবীর জন্য। সোণার ব্যবসাটাও। অমন নির্বিকার-নির্লিপ্ত সাধুর এ কী মোহ এ কি দশা! নিজনে একলা বসে ভাবেন জাহ্নবী দেবী। তাঁকে সুখী করার প্রয়াস চলেছে আনন্দভৈরবের। সেটা আবার—অন্যকে সুখী করার চেষ্টা তো দূরের কথা—তাদের সবকিছু আত্মসাৎ করে—ছলে-কৌশলে—সাধনার দিক থেকে দূরে সরে গিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে।

ক'দিন ধরে আসছে সীতা। সীতাকে দেখলে জাহ্নবী দেবীর বুকের তলায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা গুমরে গুমরে ওঠে। লছমীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে নিজের কথা। সীতা লছমীর মতন দেখতে অনেকটা। সীতা অভাবের তাড়নায় এসে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে আনন্দভৈরবের কাছে। ভৈরব ভাগ্য ফেরাবে। কাজকর্ম যোগাড় করতে না পেরে সীতার স্বামী আত্মঘাতী হতে গেছল বার দুয়েক। এ দুর্মতি যেন স্বামীর মাথায় চেপে না বসে আর। এর জন্য মা-কালীর কাছে যদি বুক চিরে রক্ত দিতে হয় সীতাকে—তাও

দিতে প্রস্তুত। মনের কথা গোপন করেনি, আনন্দভৈরবকে খুলে জানিয়েছে সীতা।

পাষাণে বেঁধেছে যে বুক, তার কাছ থেকে দয়ার নরম ছোঁয়া পাওয়া মুশকিল। আনন্দভৈরব দয়ামায়ার মাথা খেয়ে বসে আছে। অন্ধ হয়ে আছে, বধির হয়ে আছে। চোখ-কান বন্ধ রেখেছে একটা মোহের ঠুলি এঁটে। জাহ্নবী দেবীর মোহ।

দরজার পাশ থেকে দেখছেন জাহ্নবী দেবী।

রেশমী সুতোয় বাঁধা ঝোলানো যন্ত্রটা দুলছে, কাঁপছে। আনন্দভৈরবের ডান হাতের তর্জনীটা ধীর-স্থির। একটুও নড়ছে না। ওই আঙুল জড়িয়েই নেমেছে লম্বা সুতোটা। পীঠাসনের একটু ওপর থেকে ঘুরছে যন্ত্র। থামল। 'শুভ' কথাটা লেখা আছে যেখানে সেই দিক হেলে।

ভেতর থেকে দেখলেও, কোন্ দিকে কি লেখা আছে জাহ্নবীর নখদর্পণে। জাহ্নবী দেবী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যন্ত্র-গণনার ফলাফল। আনন্দে বুক ভরে উঠল। সীতার স্বামীর চাকরি হবে। দুঃখ ঘুচবে।

কিন্তু জাহ্নবী দেবীর এ আনন্দ স্থায়ী হলো না বেশীক্ষণ। আনন্দভৈরবের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে ভয়ানক। সীতার ওপর দয়া হয়নি, হবে না। চলবে এবার নিদারুণ প্রবঞ্চনা—হৃদয় টুকরো টুকরো করে দেয়ার খেলা। ছটফট করছেন জাহ্নবী দেবী। এ খেলা আর দেখা যায় না। অসহ্য। এখুনি এই মুহূর্তে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে হবে। আনন্দভৈরবের এখানে আর একদণ্ড থাকবেন না। একবার তাঁকে মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে নিয়ে এসেছিল আনন্দভৈরব। সেই কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে কথা শোনা উচিত হবে না আর। মানুষটা দিনকে দিন নরকের পথে নেমেই চলেছে—নেমেই চলেছে। মোহগ্রস্তকে মুক্ত করাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জানানো হবে।

কানে হাতচাপা দিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। আনন্দভৈরব বলছে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য খরচ করতে হবে। মৃত্যুযোগ। শিউরে উঠল সীতা। কান-নাকের সোনার গহনা খুলে, হাতে দিয়ে কান্না-ভেজা গলায় বলল, বাঁচান ওকে —আর আমার কিছু নেই।

মাটির কালীমূর্তিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সারা হচ্ছেন জাহ্নবী দেবী।

গাঁও থেকে পেটের ধান্ধায় এসেছিলেন স্বামী-স্ত্রীতে শহরে। কাজ জুটল না। এলেন চণ্ডীস্থানে। গঙ্গার জল হাতছানি দিয়ে ডাকছিল দু'জনকে ঢেউয়ে-

ঢেউয়ে। একসঙ্গে সহমরণ-মৃত্যু বেছে নিলেন দু'জনে। মেয়েটার জন্য চোখে জল এলো জাহ্নবী দেবীর। কি-ই বা সুখ দিতে পেরেছেন লছমীকে তাঁরা মা-বাবা হয়ে? খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, দু-মুঠো অন্ন পর্যন্ত জোটাতে পারেননি। ছোটভায়ের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী জলে, পড়তে যাচ্ছিলেন জাহ্নবী দেবী, পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল আনন্দভৈরব। পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে বলেছিলেন, কেন বাঁচালে বাবা? আমি যে বড় দুঃখিনী। মাথায় হাত রেখে বলেছিল আনন্দভৈরব, তুই আমার ধর্মমেয়ে, কথা দিচ্ছি সুখী করব।

তন্ত্রসাধনায় একজন শক্তিমান সাধক—তার কাছে ক্রিয়াকলাপ শিখে যতটুকু বুঝতে পেরেছেন জাহ্নবী দেবী—সুখী করার এই পন্থা যে বেছে নেবে—ভাবতেও বিস্ময়। আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে মদে দিনরাত। অথচ সাধনা শেখানোর সময় বলেছিল, পতনের মূল মদ। মদ সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে সাধনায় বিশেষ করে। মদের ওপর তিনজনের অভিশাপ রয়েছে। শুক্রের, ব্রহ্মার আর কৃষ্ণের। মদে মতিভ্রম ঘটিয়েছিল শুক্রের। শিষ্য কচের মৃত্যু জানতে পারেননি। মদে মাতাল হয়ে কন্যা সন্ধ্যাকে স্ত্রী ভেবে বসেছিলেন ব্রহ্মা। আর মদের মাদকতায় যদুকুল তো ধ্বংসই হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে।

এই যার উপদেশ, সেই লোক নিজেও যত গিলছে, শিষ্যদেরও তত মদই গেলানোর চেষ্টা করছে। এ বাঁচুক। মরেও যদি এ রাস্তা থেকে মুক্ত হয়—তাও হোক। কালীমূর্তি ছেড়ে দিয়ে সরে এলেন জাহ্নবী দেবী। খাঁড়াটা তুলে নিলেন। চোখদুটো আগুনের ভাঁটা হয়ে উঠেছে। ভেতরে শক্তির দুর্দান্ত নৃত্য চলছে। ডাকাতদের সময় যেমন হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি রণরঙ্গিনী হয়ে উঠেছেন আবার। যে-হাতে যন্ত্রবাঁধা রেশমী সুতো ঝোলে, সেই ডান হাতের ওপর কোপ বসিয়ে দিয়ে, হাতখানাকে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে।

সংবিৎ ফিরে পেলেন আনন্দভৈরবের ডাকে। সীতার নাক-কানের গয়না দিতে এসে, সমস্ত শুনেছে ভৈরব। মূর্তিকে শোনানোর জন্য মনের কথা বিড়বিড় করে বলছিলেন জাহ্নবী দেবী।

ঘুরলেন। উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপছে তখনো। বেশীক্ষণ আর দাঁড়াল না আনন্দভৈরব। যাবার সময় মাথা নিচু করে বলে গেল, তুমি শান্ত হও। তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। মোহমুক্তির আর আত্মশুদ্ধির পথ আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছি।

চণ্ডীস্থানের এ মন্দির মাটির তলা অবধি। মাটির তলায় পাথরের দেয়ালে চোখ জ্বলছে যেন এবার প্রদীপের আলোয়। আমি দেখছি জাহ্নবী দেবীর দু'চোখও জ্বলছে। উনি আসেন মাঝে মাঝে এখানে। আনন্দভৈরব চলে যাবার পর থেকে আর দেখা যায়নি কোনদিন এ তল্লাটে। জাহ্নবী দেবী তাঁর ধর্মপিতা গুরুদেবকে—গুরুদেবের শেখানো ক্রিয়ায় শক্তিময়ী হয়ে উঠে—মোহমুক্ত করে আবার আগেকার পথে এগিয়ে দিয়েছেন চেতনা জাগিয়ে—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করে।

মন্দিরের একজন ভক্ত থালায় কর্পূর জ্বেলে, থালা ঘুরিয়ে আরতি করল দেবী-চোখের। আরতির থালাটা এধারে দেয়ালের দিকে ঘুরল—যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন জাহ্নবী দেবী। জাহ্নবী দেবীরও মুখের আরতি করছে ভক্ত। আমি দেখছি জাহ্নবী দেবীর মুখখানা ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী কালীর মুখ একেবারে। চাপা ঠোঁটের হাসি বুঝতে পারছিলুম না এতক্ষণ—এখন স্তবগান হতে বুঝতে পারছি। ওটা মমতাময়ী জননীর করুণাঘন হাসি।

আরতির সঙ্গে স্তবগান গাইছে ভক্ত মধুরকণ্ঠে।—ত্রিজগতাং তুষ্টা সতী·· বরেণ্যা কুমারী বীরা···জননী কালিকা শিবা···।

নির্মলানন্দ তান্ত্রিক না কাপালিক?

প্রশ্নটায় ফণা ধরা কালনাগিনীর হিস হিস শব্দ শুনল যেন যশোধর কানের কাছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। মরা জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া দেখে শিউরে উঠল। কালনাগিনীর মতন ফণা দোলাচ্ছে। ভেতরের প্রশ্নটা বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছে ওর আক্রোশে ফেটে পড়া হিস হিস শব্দে বুঝি।

বেপরোয়া-দুর্দান্ত যশোধরের ভয়-ডর বলে লেখা নেই কিছু কুলুজিতে। দ্বারভাঙার এই লগমা গাঁয়ের এই রাস্তাটা অপরিচিত নয় মোটে। বহুবার যাতায়াত করেছে মাটি ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে। দিনেও গেছে, রাত্তিরেও। অমাবস্যা রাতের ঘন অন্ধকারেও একবারের জন্য এতটুকু গা ছমছম করে নি। আজ কিন্তু করছে, বেশ ভয় ধরছে। থমথমে হয়ে উঠেছে জায়গাটা। অপঘাত মৃত্যুর নির্জন রাজ্য মনে হচ্ছে।

যখনি এই সড়কটার ওপর দিয়ে যশোধর গেছে, সঙ্গে থেকেছে নির্মলানন্দ। আজো আছে, তবু ব্যতিক্রম। পর পর বটগাছ তিনটে এমনিতেই কেমন চুপচাপ, গুঁড়ি তিনটে জগদ্দল পাথর যেন, এখন পাথুরে গুঁড়ি তিনটে বড্ড বেশী নড়ছে। রাক্ষুসে খিদেয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে-কোন একটার তলা দিয়ে গেলেই ডালপালার বাহুবিস্তার করে জাপটে ধরবে। বুকে চেপে বুক দিয়েই বুকের সমস্ত রক্ত শুষে নেবে।

পুকুরের সবুজ জল পাতালপুরীর মিশমিশে কালো পরদায় ঢেকে গেছে। হাওয়ায় রক্তকরবী গাছের পাতাগুলো কেঁপে উঠলে নূপুর বেজে উঠত। সেটা বদলে গিয়ে একসঙ্গে অনেক গলায় অট্টহাসি হাসছে কারা সব।

এত রাজ্যের ভয় কি মনে পুষে রেখেছিল যশোধর, না সত্যি কিছু?

নির্মলানন্দের ডান হাতের দিকে চোখ ফেরাল। খাঁড়াটায় তাজা রক্ত মাখানো, দু'এক ফোঁটা ঝরছে আগের মতন। বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় যশোধরের ডান হাতের কব্জিটা ধরে রয়েছে, পাছে না পালিয়ে যায়।

যশোধরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। রাগটা মাথার রক্তে টগবগ করে ফুটছে, রক্তচক্ষুতেই মালুম হচ্ছে। এই রক্তচক্ষু তার রক্তপাত ঘটানো পযন্ত ঠাণ্ডা হবে না বুঝি। সাদা হয়ে উঠবে না। হাতের খাঁড়াটা উঁচু করে ধরা। বুকের কাছ অবধি মাথা তোলা। দুম দুম করে চলার তালে তালে ভয়ানকভাবে নেচে উঠছে ধারালো খাঁড়াটা। ঘাড় থেকে মুণ্ডটা নামিয়ে দেবার তাক খুঁজছে যেন।

নিটোল-নীরোগ কুচকুচে কালো ছাগলের দিকে দৃষ্টি ছিল না নির্মলানন্দের, ছিল যশোধরের দিকে। নিষ্পলকে তাকিয়েছিল। আর তাকিয়েছিল ওর চেলা চামুণ্ডারা। তারা প্রহরীর মতন পাহারা দিচ্ছে চতুর্দিক ঘিরে আসামীকে। আসামীর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নিশীথে নীরবে খুন করতে ঢুকেছিল যশোধর নির্মলানন্দের ঘরে। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। পড়েছে স্বয়ং নির্মলানন্দই। বৃদ্ধ নির্মলানন্দের গায়ে যে দৈত্যের বল, হাত দুটো চেপে ধরতে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। হাতের ছোরা খসে পড়েছিল মেঝেয়! মুখ দেখে শিউরে উঠেছিল। অবশ হয়ে পড়েছিল শরীরের সমস্ত স্নায়ু।

মানুষটার মুখের আদল বদলে গেছল। গলার স্বরটাও। প্রতিশোধের আগুন ছড়ানো মুখ থেকে বেরিয়ে আসা একটা কথার একটা ভয়ঙ্কর শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছল। তোর বাড়টা দেখে যাচ্ছিলুম, কাল তোর সব শেষ জানবি! অনুগত শিষ্যদের দিকে চেয়ে, যারা এসে

পড়েছিল সে সময়—বলেছিল কথাটা। ওরা মারমুখো হয়ে তেড়ে এসেছিল লাঠিসোঁটা-বল্লম-টাঙি নিয়ে। খুনীকে শেষ করে মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে বলে।

দু'হাত দিয়ে আটকেছে সবাইকে নির্মলানন্দ। বলেছে, কালকের রাতটা আসতে দে না তোরা। আমি কি করি দেখবি 'খন। এখন ঘরে যা। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করে গুরুর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে ওরা যশোধরের বিচারের ভার। তবে এ দুঃসাহসিক অবিশ্বাস্য কাণ্ডের জন্য যশোধরকে আর বিশ্বাস করা যেতে পারে না এক মুহূর্ত। ওরা পাহারা দিয়েছে রাতভোর। পরের দিন মাঝ-রাত অবধি চোখে চোখে রেখেছে। ওদের নিশ্চিন্ত হবার জন্য বিদায় করার জন্য যশোধরের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে নির্মলানন্দ বেশ শক্ত বাঁধনে। ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, কিছু করারও না। তবুও মন মানেনি ওদের। বাঁধন ছেঁড়া অসম্ভব নাও হতে পারে যশোধরের। কখন কি করে বসে কে জানে। ফিরে যায় নি ওরা তাই কেউ।

পরের রাতে বলি হলো।

উৎসর্গ করা ছাগলটাকে জল্লাদের চেহারার জেলে এসে বলি দিল দেবীর সামনে। কালীদেবী এখানে মূর্তিমতী চতুর্ভুজা নন। সাতটা গাঁয়ের ক্ষেতের মাটি মিলিয়ে তৈরী সিঁদুর মাখানো বড় ডেলা একটা কালীদেবী। পুজোপাঠ-বলি—সব কিছুই এই দেবীকে ঘিরে করে সকলে।

এই পুজোপাঠ-বলির স্থান। আসল সাধনার জায়গা আরো খানিক দূরে। নির্মলানন্দ সেখানে একা যায়, একা সাধনা করে, গভীর রাতে। সেখানেই জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যশোধরকে। বলির পর জেলের হাত থেকে রক্তমাখা খাঁড়াটা একরকম ছিনিয়েই নিয়ে নিয়েছে নিজের হাতে।

রণং দেহি মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে যশোধরের কাছে। নিরুপায় যশোধর আত্মরক্ষার জন্য দশ ফেরে বাঁধা হাতে-পায়ের দড়ি বৃথা কাটতে চেষ্টা করছে দাঁত দিয়ে। কারো কোন কথা কানে না নিয়ে—শিষ্যরা বারণ করেছিল শয়তানের দড়ি কাটতে—খাঁড়া দিয়ে হাতের পায়ের দড়ি কেটে দিয়েছিল কচ্ কচ্ করে। তারপর যশোধরের ডান হাতটা ধরে টেনে তুলেছে। কব্জিটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বলেছে, এই যা ধরলুম—আমার হাত থেকে ছাড়ান-ছিড়েন নেই আর তোর। যাকে দরকার পড়ে শেষ করার—পুকুর-পাড়ের ঘরটায় নিয়ে গিয়ে তাকে শেষ করি আমি। কারো কোন সাধ্যি নেই যে

তোকে রক্ষে করে। তুই নিজেকে নিজে বাঁচানোর লাখো চেষ্টা করেও পারবি নে!

হাতটা ধরে যশোধরের দেহের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছিল বুঝি নির্মলানন্দ। মনের শক্তিও। অত সাহস অত শক্তি অত দুর্দান্তপনার এক নিমেষে কি করে মৃত্যু ঘটল—ভেবে কুলকিনারা পেল না কোন যশোধর। কেবলি মনে হতে লাগল, দেহটা হাল্কা পালকের মতন হয়ে গেছে। বাতাসে ভাসছে। হাত ধরে ভাসাচ্ছে ওই মানুষটাই। হাতটা ছেড়ে দিলেই ভাসতে ভাসতে শূন্যে কোথায় হারিয়ে যাবে, কোথায় মিলিয়ে যাবে কে জানে।

হাত ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে বার করল নির্মলানন্দ। সঙ্গে আসতে চেয়েছিল ওর অনুগতদের মধ্যে থেকে অনেকে। নির্মলানন্দ নিষেধ করেছে। পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছে ওরা যতদূর চোখ যায়। চোখ যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঝাপসা দেখার পর অদৃশ্য হয়ে গেছে দু'জনে। নির্মলানন্দ আর যশোধর।

শত্রুদের দৃষ্টির আওতায় থাকলেও, নিজেকে অনেকের মাঝে মনে হয়েছে যশোধরের। এবার নিঃসঙ্গ ঠেকছে নিজেকে। নির্মলানন্দের সঙ্গে থেকেও কারো সঙ্গে নেই যেন। চতুর্দিকে ভয়ের ছায়া দেখছে। আর সে ভয় মৃত্যুর। মরণে ভয় ছিল না কোনকালে। মরার জন্য প্রস্তুতই হয়েছিল। তাকে মেরে ফেলার জন্য বাড়িতে যেমন, বাইরেও তেমন ষড়যন্ত্র চলছিল। এটা জানতে বাকি ছিল না তার। বাবা দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, রাজী হয় নি। বেড়িয়ে আসার নাম করে শেষে দিয়ে গেল নির্মলানন্দের আশ্রয়ে।

নতুন ধরনের পরিবেশে এসে নতুন ধরনের মানুষটাকে দেখে যশোধরের মনে হয়েছিল এ এক অন্য অজানা দুনিয়ায় উপস্থিত হলো সে। ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি। তার পক্ষে অসম্ভব এখানে খাপ খাইয়ে থাকা। বাবার সঙ্গেই ফিরে যেতে চেয়েছিল। নিজেকে না শোধরাতে পারলে বাবার বাড়িতে যে কোনদিন স্থান হবে না—আর এটা যাবার সময় পরিষ্কার জানিয়ে গেছল বাবা। আরো রূঢ় কথা বলেছিল ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে—ভালো না হলে তোমার মতন ছেলের মুখদর্শন করাও পাপ।

পাপ! কার মুখ দেখলে কার পাপ? যশোধরের দেখলে বাবার, না বাবার দেখলে যশোধরের? যশোধরের চোখের কোণে ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রূপের

হাসি ঝলসে উঠল! বাবাকে জালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেও বোধহয় তার বুকের জ্বালা মাথার জ্বালা ঠাণ্ডা হবে না।

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস।

মায়ের মতন মাকে হারাতে হলো। মায়ের মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করল বাবা—মায়ের স্মৃতি ছেলের মুখে জ্বল জ্বল করছে—হুবহু মায়ের মুখ—ছেলেকে মানুষের মতন মানুষ করে তুলবে সারা জীবন ধরে। ছেলের মুখখানা বুকে চেপে হাউ-হাউ করে কেঁদে পাগল হয়েছে। সে-সময় সবে উনিশে পা দিয়েছে যশোধর।

এর পর থেকে একসঙ্গে বাবার কাছ থেকে বাবার আর মায়ের আদর পেতে লাগল। মায়ের অভাব-বোধ করেনি ছু'বছরের মধ্যে একেবারের জন্যও। মায়ের খাটে মাকে বসে থাকতে দেখত সদাসর্বদা। এমনভাবে ছবিকে শাড়ি পরিয়ে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, বালিশ ঠেসান দিয়ে বসিয়ে রাখত বাবা যে, মনে হতো না ছবি। মনে হতো সাক্ষাৎ মা-ই।

মা মরেছিল, মরেও বেঁচেছিল তার মনে তার চোখে। কিন্তু সে-মা মরল একদিন সত্যিসত্যিই। বাবার জন্য মরল। বিছানা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মায়ের ছবি। সেই জায়গায় এসে বসল নববধূ। বাবা বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। সবচেয়ে দুঃখের আর আশ্চর্যের ব্যাপার যশোধরের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল বাবা নিজেই, সেই মেয়েকে। ঘরে এনেছে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে।

বন্ধুমহলে জ্ঞাতিমহলে যশোধরের মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছিল বাবার কাণ্ড-কারখানায়। বাবার কিন্তু কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দিকেও নজর নেই। সর্বক্ষণ আনন্দে ডগমগ।

বিতৃষ্ণা বিরক্তি অশ্রদ্ধা। বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করত না মোটে যশোধরের। বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই একটা অবাধ্য পাগলা ভূত মাথায় চেপে বসত তখুনি। কানের কাছে মুখ এনে বলত, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দে! পুড়িয়ে মার এদের। ভেঙে-চুরে তছনছ করে দে। যা কিছু আছে লুটেপুটে নিয়ে ছড়িয়ে দে রাস্তায়, ফেলে দে পুকুরে পাতকুয়োয়। ফেলে দে, ফেলে দে—

ছু'কানে হাত চাপা দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেত যশোধর।

শান্তি শান্তি করে চিৎকার করে উঠত। সর্বস্তরে সকল রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেও শান্তি খুঁজে পায়নি কোথাও। নেশা ধরেছে, উচ্ছৃঙ্খল

হয়ে পড়েছে, তবুও না। গুণ্ডা বদমাস ডাকাত দুশ্চরিত্র—সব বদনামই কুড়িয়েছে এক এক করে। ঘরে বাইরে। ঘর-বার চেয়েছে মৃত্যু। এরকম ছোঁড়াকে যমও ভয় পায়? ম'লে যে হাড় জুড়োয় সবার।

অসৎ পথের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী গজিয়ে উঠেছে যশোধরের। অল্পদিনে এত অপগুণ এভাবে ছড়িয়ে পড়েনি তাদেরও। নাম শুনলে বুকের তলায় গুড়-গুড় করে ওঠে, এমনতরও হয়নি তাদের নামে কারো। অসহ্য! ওকে সরিয়ে ফেলতে না পারলে, তাদের কোন প্রতিপত্তি থাকবে না পড়শীদের কাছে।

বাবার কানে এসেছিল যশোধরকে সরানোর চেষ্টা চলছে তলায় তলায়। ব্যর্থ হয়েছে গোঁয়ার ছেলেকে বাড়িতে আটকে রাখতে, ব্যর্থ হয়েছে ডাক্তার-বদ্যির চিকিৎসায় সুস্থমনের মানুষ করে তুলতে। সাধু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে অসাধ্য সাধন হয় শুনে, যার মুখে যখনি যেখানে যে-সাধুর অলৌকিক কীর্তি-কলাপের কথা জানতে পেরেছে, তখনি ছুটে গেছে সেখানে। ধর্না দিয়ে থেকেছে কিছুদিন। ফল বিপরীত ফলেছে। যশোধর উগ্রমূর্তি হয়ে উঠেছে আরো।

শেষে শেষ চেষ্টা বাবার। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নির্মলানন্দের কাছে এনে ফেলেছে। যদি কিছু হয়। গরদের ধুতি পরে দাঁড়িয়েছিল নির্মলানন্দ। গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। খালি গা, খড়ম পায়ে। কপালের সিঁদুরটিপটা প্রদীপের শিখার মতন সরু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। ওটার দিকে চোখ পড়তে জ্বলন্ত প্রদীপশিখাই দেখল যেন যশোধর। এটা দেখল বাবার শেল-বেঁধানো কথায়।··· ছেলের মুখদর্শন করাও পাপ! সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যাবার ইচ্ছেয় ইতি পড়ল আর দৃষ্টি ফিরল অন্য দিকে—নির্মলানন্দ দাঁড়িয়ে আছে যেখানে।

নির্মলানন্দের মাথা-ভর্তি ধবধবে সাদা চুল ফুর-ফুরে হাওয়ায় এলো মেলো উড়ছে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শোনা পুরাণের ঋষিকাহিনীর ঋষিবর্ণনার মিল দেখছে যশোধর নির্মলানন্দের চেহারায়।

ঠোঁটে স্নিগ্ধ মৃদুহাসি। দৃষ্টিতে দু'চোখ বেয়ে স্নেহ উপচে পড়ছে। এগিয়ে এলো যশোধরের কাছে। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল। অশান্ত মন শান্ত হয়ে গেল যশোধরের।

শান্তটা রইল না কিন্তু বেশী দিন। মাস দুয়েক পরমায়ু ছিল মোটে। ভাগ্যের লিখন হয়তো এই রকমই। যে-কে-সেই। পূর্বের অবস্থা ফিরে পেল আবার। ফিরে পেল তাকে নিয়ে নানান কানাঘুষা চলছে শুনে। সে নাকি ভিজে বেরাল সেজে রয়েছে। আসলে অতি ধূর্ত। সাধুর সাধন-সম্পত্তি এমন সম্পত্তি—সমস্তই গ্রাস করার তালে। সদাসর্বদা সাধুর মন যুগিয়ে চলে

তাই। সাধু শরীর ছাড়লে, সবার মাথা টপকে সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে বলে। নির্মলানন্দের শিষ্যরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

এসব আশায় আসেনি যশোধর এখানে। এখান থেকে চলে যাবে, তার আগে সকলকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে যাবে। নেশা ধরল। দৃষ্টি বদলাল। অশোভন ব্যবহার। চোখের সুমুখ দিয়ে কোন স্ত্রীলোক যেতে পারত না। দেখলে, হাজার হাত দূরে পালিয়ে যেত। এ খবর শুনে চিমটেপেটা করেছিল নির্মলানন্দ। শিষ্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। মনোবাঞ্ছা-পূরণ হয়েছে বলে ফিক-ফিক করে হাসছিল।

সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—রাত্রি এলে সব ক'টাকে শেষ করে যাবে। প্রথমে, পালের পাণ্ডা নির্মলানন্দ। তারপর এক-একজন চেলা।

কার্যসিদ্ধি হয়নি একটাও। ধরা পড়ে গেছে। নির্মলানন্দ নিয়ে চলেছে শেষ করার জন্য। এটা মিথ্যে নয়। অজান্তে মনে পোষা ভয় নয়। নির্ভেজাল সত্যি। তবে একথাও সত্যি, নরবলি দিত কাপালিকরা। নির্মলানন্দ সত্যিকারের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নয়। কাপালিক—মানুষখেকো নররাক্ষস।

…পুকুর পাড়ে এসে থামল নির্মলানন্দ। ঘরটার দিকে তাকিয়ে কি যেন কি দেখল ভালো করে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মাটির দেয়াল আর টালির চালে যেন শতসহস্র মৃত মানুষের হাঁ-করা মুখ অপেক্ষা করছে যশোধরের জন্য। প্রতিযোগিতা চলছে ঘরে ঢোকার মুখে কে আগে গিলে ফেলতে পারে। মনে মনে চীৎকার করছে যশোধর—কেউ যদি থাকো তো বাঁচাও, বাঁচাও।

নির্মলানন্দ হো হো করে হেসে উঠল। টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। মনের চীৎকার শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়। বলল, কাকে বলছিস বাঁচাতে? কে আছে যে বাঁচাবে? ডান পাশের লাল কম্বলের আসনে ধরে বসিয়ে দিল যশোধরকে। ধরে না বসালে, ছেড়ে দিলে, শক্তিহীন যশোধর পড়েই যেত মেঝেয়। গলা-জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আগে থেকে কথা কইতে চেষ্টা করেও পারছে না। মূর্তির মতন বসে আছে। নির্মলানন্দই জানে কি যেন কি করে ফেলেছে তাকে। যশোধর হতভম্ব হতবাক। এবার সম্পূর্ণ হত হবার পালা।

একটু তফাতে সামনা সামনি একই রকমের আসনে বসল নির্মলানন্দ। মধ্যিখানে লাল-নীল-সাদা রঙে রঙ-করা তিনথাক মাটির বেদীর ওপর ত্রিকোণ আকারে পর পর হোমের কাঠ সাজানো। খাঁড়াটা তুলে ধরে কঠিন গম্ভীর

গলায় বলল, এই খাঁড়া দিয়ে তোর সর্বাঙ্গের হাড় কেটে কেটে হোমের কাঠের ওপর এক একখানা করে সাজিয়ে রাখা হবে। কর্পূরের আগুনে জ্বলে উঠবে কাঠ, জ্বলে উঠবে হাড়।

এ কি ভয়ানকভাবে মৃত্যু হবে তার? মৃত্যুর আগে মরেই যাচ্ছে বুঝি সে। একটা কোপেই তো নির্মলানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যেত। এত টুকরো টুকরো করা হবে কেন তাকে?

নির্মলানন্দ এবারেও শুনতে পেল তার মনের কথা। বলল, এভাবে মরতে ভয় পেলে চলবে না। মরতেই হবে তোকে।

ওই ঘরের ভেতরে বসে আছি আমি। আমার মতন বসে আছে আরো অনেকে। ছোট থেকে বড় অবধি। সব বয়সের নারী-পুরুষ। সিদ্ধস্থান বলে ঘরটার খ্যাতি খুব। সিদ্ধস্থানের তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ক্রিয়া-কলাপ দেখব, দেখব সন্ন্যাসীর মহিমা—বড় আশায় বুক বেঁধে, পথের কষ্ট তুচ্ছ করে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি তাই।

সকলের মতন আমারো দু'চোখ মাটির বেদীর ওপর। হোমের আগুন জ্বলছে। সামনে—কুশাসনের ওপর গেরুয়া রঙে ছোপানো কম্বলে বসে আছে সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বুকের সমান সমান আগুনের শিখা উঠছে লক লক করে। স্থিরদৃষ্টি ওর আগুনের ওপর। আগুনের ভেতর কি যেন দেখছে। নিজের রূপে মুগ্ধ লোকেরা আয়নায় যেমন নিজেকে দেখে তন্ময় হয়ে যায়, কোন কিছুতে খেয়াল থাকে না, এও সেইরকম করে দেখা। আগুনের আয়নায় দেখছে বুঝি সন্ন্যাসী নিজেকে নিজের ধ্যানে অত মগ্ন হয়ে।

ধীরে ধীরে আগুন নিভে এলো। নিভে গেল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম আমি—আমি কেন উপস্থিত সকলেই—সন্ন্যাসীর আসনে সন্ন্যাসী নেই। সেখানে এক টুকরো কর্পূরের আগুন জ্বলছে স্রেফ। এই দেখাটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল আমাদের। সংবিৎ ফিরল আসনের আগুনটাকে ধীরে ধীরে কাছে আসতে দেখে। চমকে উঠলুম মাথায় একখানা হাতের নরম ছোঁয়া লাগতে। চেয়ে দেখি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক—সমস্ত শরীর বেয়ে একটাই চোখ-জোড়ানো আগুনের শিখা ওঠা-নামা করছে যেন।

আমি চেয়ে আছি। প্রথমে ক্রিয়ায় বসার সময় নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে যে

অগ্নিবীজ 'রং' মন্ত্র উচ্চারণ করছিল, তারই প্রতিধ্বনি শুনছি। সন্ন্যাসীর সমস্ত মুখখানা ছেয়ে গেল প্রসন্ন প্রসাদে। বলল, এটা তন্ত্রের মানসযজ্ঞ—আমিত্বনাশের সাধনা। নিজের প্রতিটি অস্থি যজ্ঞের কাঠের সঙ্গে সমিধ হয়ে জ্বলছে এক এক করে। জ্বলছে কর্পূরের আগুনের মতন প্রাণ—প্রাণের তেজশক্তি। কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্থি পুড়েও দেহের অস্তিত্ব রইল না আর কোন। রইল কেবল প্রাণ—প্রাণের অবিনশ্বর তেজশক্তি। সেই তেজশক্তিই আসল আমি। এ ধ্যানে মানুষের মান-অভিমান-ক্ষোভ আর রাগ-দ্বেষ-প্রতিহিংসায় মিশেল আমির মৃত্যু ঘটে। বেঁচে থাকে শুধু একটি আমি। সে আমি প্রাণ—নিজের প্রাণ, অন্যের প্রাণ—সকলের প্রাণের প্রাণ। দিব্যদৃষ্টিতে দৃশ্য একটি অনির্বাণ শিখা।

পাশের লোকটির কাছে গেল সন্ন্যাসী। আমি দেখছি উপযুক্ত গুরু নির্মলানন্দের উপযুক্ত শিষ্য সন্ন্যাসী যশোধরকে। যশোধরের মুখে জীবনী শোনার সময় ওর সাধনার গুপ্তক্রিয়ার কথাও শুনেছিলুম। কর্ণের বিবাদভঞ্জন হলো আমার দর্শনে।
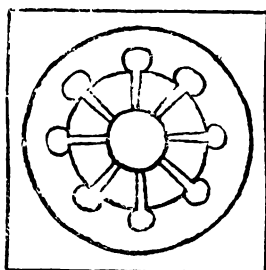
একটা চার-পাঁচ হাত সালুর টুকরো কত শক্তি ধরে, কত রক্তের বন্যা বওয়াতে পারে, অম্বর পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি আমি।

চৈতের বাসন্তী-অষ্টমী।

জয়পুর থেকে চলে এলুম অম্বরে। পাহাড়ের ওপরে জিলেবীচকে বহু লোক জমায়েত হয়েছে দেখলুম। ভিড়ে ভিড়। নারী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো বাদ নেই কেউ। নিচের ঘরবাড়ি উজাড় করে এসেছে সব। কাছের এসেছে যেমন, তেমনি দূর-দূরান্তর থেকেও আমার মতন এসেছে অনেকে।

জিলেবীচক একেবারে শীলাদেবীর লাগোয়া। পেছনের দিকে। এখানে আসার আগে শীলাদেবীকে ভালো করে দেখে এসেছি। রাজপুতদের দেবী—রাজসিক সাজেই সাজানো হয়েছে। কালো অষ্টভুজা। কষ্টিপাথরে খোদাই

করা মূর্তি। মাথায় সোনার মুকুট। পরনে লাল বেনারসী শাড়ি। আট হাতই গয়নায় ভর্তি। শোনা যায় তন্ত্রের পীঠস্থান বাংলাদেশেই আদি বাস ছিল দেবীর। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে। তখন এঁর নাম ছিল যশোরেশ্বরী। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল মানসিংহের। মানসিংহই দেবীকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে রাজস্থানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

চকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ান রাজপুতরা। প্রত্যেকের হাতে খাপখোলা তলোয়ার ঝকমক করছে চোখ-ধাঁধানো বিজলী আলোয়। লাল-নীল—রঙবেরঙের পাগড়ির ঢেউ খেলেছে এপাশ-ওপাশ মাথা ফেরানোর সময়। আঁট-সাট ধুতি-মির্জাই পরা এক-একটা মজবুত দেহ ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠেছে। সকলেরই খালি পা। পাকানো গোঁফের সুজন সিং রীতিনীতি পালনে তৎপর হয়ে আছেন। উনি সর্দার হিসেবে কাজ করছেন। খুব সজাগ খুব সতর্ক উনি। ওদিকের একটা বটগাছের তলায় আমি। আর একটার তলায় ভৈরবীমাতা। লালপেড়ে গেরুয়া শাড়ি আর পিঠ-ভর্তি রুক্ষ এলোচুলে ওঁকে দুর্গাপ্রতিমার মতন দেখাচ্ছে। কপালে বেশ বড় আর গোল সিঁদুরের লাল টিপ। এমন জ্বল জ্বল করছে, যেন একটা চোখ। ত্রিনয়ন। ওইখান দিয়েই ওঁর দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছু দেখছেন বুঝি ভৈরবীমাতা। মাঝে মাঝে দু'চোখ বুজে কি যেন কি ভাবছেন।

ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা হতে যে-সব কথা শুনলুম, তাতে আমি অবাক! উনি প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছেন, এ-সময় একদম কারো কাছে প্রকাশ করা যেন না হয়। স্থান ত্যাগ করার পর, বললে আপত্তি নেই কোন। পর পর দু'বার এসেছেন উনি। এবার নিয়ে তিনবার হলো। এবারটাই শেষ আসা। আর আসবেন না। কারণ ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে ঘটে গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে! আসার প্রয়োজন ফুরোবে তাই।

আমি সুজন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছি একবার আর ভৈরবীমাতার দিকে একবার। বুকের ভেতর একটা অস্বস্তির দাপট শুরু হয়ে গেছে। কেবল ভয়—ভৈরবীমাতার উদ্দেশ্য না পণ্ড হয় শেষ অবধি।

রাত্তির বেশ হয়ে গেছে। বারোটার কাছ-বরাবর। তবুও এক-একজন আড়াল থেকে এক-একটা মোষকে সিংয়ে বাঁধা দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। অবিশ্যি একসঙ্গে আনছে না সকলে। পালা করে। একজনের কার্য সমাধা হয়ে যাবার পর আনছে অন্যজন।

সামনের যুবক লাল সালু হাতে অপেক্ষা করছে। মোষটা এসে পৌঁছবার

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে সালুটা চওড়া করে ধরে, একটু তফাতে সরে গিয়ে দোলাতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। সালুটা থেকে যেন ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত এসে পড়ছে মোষের দু'চোখে।

ক্ষেপে উঠছে মোষ। তেড়ে যাবার উপক্রম করতেই সব শেষ। ক্রোধে ফেটে পড়ে ফোঁস শব্দে জোরে নিঃশ্বাস ঝরে পড়ার মুহূর্তে, সুজন সিংয়ের নির্দেশে পাশের হিম্মতদার তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিল ঘাড়ে সজোরে। চোখের নিমেষে খসে পড়ল ধড় থেকে মুণ্ডুটা। পড়ল লোহার কড়ার মধ্যে। দেবীকে নিবেদন করার জন্য কড়াসুদ্ধ মুণ্ডুটা নিয়ে ছুটল অন্য জন। অন্য জায়গায় রাখা হলো আর একটা কড়া আবার।

এইভাবে অষ্টমী পুজোর বলি-পর্ব শেষ হলো রাত একটায়।

সুজন সিং বীরের মতন সদর্পে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এলেন। এলেন বটগাছতলায়। ভৈরবীমাতা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, বসেছেন সবে। ওঁর দেখাদেখি আমিও বসেছি অবসন্ন পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য। দু'চোখই ও-গাছতলায় কিন্তু। দেখছি সুজন সিংকে, দেখছি ভৈরবীমাতাকে। দেখছি ওঁদের মনের কোন ভাব পরিবর্তন হয় কিনা। দু'জনের চাউনিতে গহনের বস্তুটা ভেসে ওঠে কিনা, ধরা পড়ে কিনা।

ধরা পড়ার মতন আমার নজরে কিছু এলো না। উল্টোটাই দেখলুম বরং। সুজন সিং মাথা নোয়ালেন। মাটিতে ঠেকালেন দু'হাত। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন, প্রণাম জানালেন ভৈরবীমাতাকে। একবার নয়, তিনবার। ভৈরবীমাতা নির্বিকার চিত্তে নির্লিপ্ত মুখে দেখলেন খানিক। মৃদু হাসলেন। করুণা করলেন বুঝি অনুগত-ভক্ত সাধককে দেবী।

দেবীর কৃপালাভে ভক্তও ধন্য হলেন। অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে ভেতরটা। জলে চোখের তারায় হাসির বিদ্যুৎ খেলছে।

যাবার আগে আবার শ্রদ্ধাপ্রণাম জানালেন তিনবার। দেবীর আশীর্বাদে আশীটার মধ্যে একটা বলিতেও বাধা পড়েনি। তিন বছর আগে হতো। দেবী অষ্টমীতে দর্শন দিতে শুরু করার পর থেকে হচ্ছে না। এবারটায়ও হলো না।

সুজন সিং চলে যাবার পর হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বসিয়েছেন ভৈরবী-মাতা। বলেছেন সুজন সিংয়ের খুশি হবার কারণ। সুজন সিংই গত বছর বলি শেষ হবার পর হাসতে হাসতে এসে বলেছিলেন, মাতাজী! দু'বছর ধরে আপনার কৃপা হচ্ছে আমাদের ওপর। আপনি ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ান। কে— বুঝতে বাকী নেই কারো। বলে, মন্দিরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন।

ভৈরবীমাতা জানেন বীরাচারী বীরউপাসক এরা। ভোগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ খোঁজেন। নিজের সামর্থের মধ্যে বিশ্ব-জননীর আদি শক্তির খেলা অনুভব করেন। শক্রর রক্তে কাতর না হবার জন্য বলির রক্ত দেখে দেখে সবল করে তোলেন মনকে। মা যখন শক্রনাশিনী বীরাঙ্গনা, ছেলেকেও তখন আত্মরক্ষার জন্য শক্র নিধন করতে হবে অনায়াসে। বীর সন্তানের পরিচয় দিতে হবে নিজেদের। প্রাণ থেকেই প্রাণের পুষ্টি করতে হবে। তাই-প্রাণের স্রোত যেখানে যত বেশি, শরীর রক্ষের জন্য সেই সব জন্তু-জানোয়ারকে গ্রহণ করাই এঁদের রীতি। তন্ত্রের এটা রাজসিক উপাসনা। কিন্তু এটাই সব নয়। সাত্বিক উপাসনার ভিত বললে একে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। আসক্তির মধ্যে দিয়েই আসক্তিহীন হতে হবে মানুষকে। অবিশ্যি তেমন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক চাই। যিনি ভোগের অস্থায়ী আনন্দের সঙ্গে ত্যাগের স্থায়ী আনন্দটাকেও জাগিয়ে তুলবেন ভেতরে। উপদেশ, পরিবেশ সৃষ্টি করে, প্রেরণা দিয়ে।

আগের সুজন সিংকে দেখেছেন ভৈরবীমাতা। দেখেছেন ওর সঙ্গে আর একটি নারীকে। এ নারী কারো কুলবধূ নয়। নয় ওঁর স্ত্রীও। সে এক বার-বিলাসিনী। বুলারাণী। কলকাতার কুখ্যাত গণিকাপল্লীর সেদিনকার নায়িকা সে। খুব রূপসী না হলেও রূপের একটা চটক ছিল। মিষ্টি মুখ আর মিষ্টি-গলা দিয়েছিলেন ঈশ্বর। ব্যবসায় দু'পয়সার মুখ দেখেছিল সহজে। বেগ পেতে হয়নি মোটে।

উঠতি দশা শুরু হয়েছিল আঠারো থেকে। চলেছিল একটানা বিশ বছর। অর্থাৎ আটত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত। টাকাকড়ি বাড়ি-গয়না—সবই হয়েছিল। কোন্ জ্যোতিষী নাকি বুলারাণীর হাত দেখে কুষ্ঠি তৈরি করে বলেছিলেন মা-কে, এসব মেয়ে খুব আদরের বস্তু। খুব যত্নে রেখো। লগ্নচাঁদা মেয়ে। যেখানে যাবে—ডুব উথলে পড়ার মতন তার সম্পত্তি ভরে রাখার ভাঁড়ারঘর খুঁজে পাওয়া যাবে না—উথলে উথলে পড়বে চতুর্দিকে।

জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল সত্যি, কিন্তু বুলারাণীর মন ভরেনি। 'আরো চাই আরো চাই' বলে উঠত তার মন। পাওয়ার পরও চাওয়ার নেশা পেয়ে বসেছিল এত যে, পাগল হবার উপক্রম। পাগলামি কাণ্ড করেছে বহু। সেগুলোকে নিছক পাগলামি না বলে শয়তানী বললেই ঠিক বলা হবে।

নিশাচররা এসেছে রাতে। মদের নেশায় চুর হয়ে পড়ে থেকেছে।

পেয়ালার পর পেয়ালা মুখে ধরে ধরে চুর করে ভুলেছে বুলারাণী নিজেই। নিজের সর্বনেশে আশা পূরণ করার জন্য। হুঁশ আসতে রাতের অতিথিরা দেখেছে, তাদের সোনার বোতাম নেই, নেই হীরের। পকেটে মনিব্যাগটা পর্যন্ত নেই। নিরাভরণা বুলারাণী ছুটে এসে আছড়ে পড়েছে লাল কার্পেটের ওপর। হাউ হাউ করে কেঁদেছে। সর্বস্বান্ত হয়েছে সে। কি কুক্ষণেই ছোট গেলাস মুখে ঠেকিয়েছিল! পোড়া চোর অন্নপ্রাশনের আংটিটা অবধি রাখেনি আঙুলে।

বেশ চলছিল। আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ল একদিন। এবারে সত্যি সত্যিই পাগল হতে হবে বুলারাণীকে। একলা ঘরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। কারো কথা কানে না তুলে নতুন ভাড়াটে মেয়েটাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে কাল করেছে। মেয়েটার বয়েস কম। রূপ আছে। গলা নাকি মিছরির টুকরো।

বুলারাণীর পসার কমেছে, আয় কমেছে। কমতে কমতে বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে আসছে। কি করে পূর্বের অবস্থা ফেরানো যায়, কি করে খদ্দের অকর্ষণ করে নজর ফেরানো যায় তার দিকে। টেনে আনা যায় ঘরে। চিন্তায় চিন্তায় বর্ণ কালা হতে লাগল।

পথ মিলল। মায়ের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে গিয়ে যাকে দেখেছিল, তাঁর খোঁজখবর নিয়ে কাছে গেলে কেমন হয়!

সে রাত বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাতই ছিল। দুঃসময় যখন আসে, তখন মহাগুরুদেরও চলে যাবার সময় হয় বুঝি। তা না হলে পড়তি দশায় মা-ও চলে গেল। শ্মশানে মড়া ঢুকল যখন, দু' চোখ ঝাপসা। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল বুলারাণী, অদূরে একজন একটা চিতা থেকে হাড় বেছে বেছে তুলছে। জড়ো করে রাখল। তারপর চন্দনজলে এক একখানা করে ধুয়ে, হলদে কাপড় চাপা দিয়ে বটপাতায় লালচন্দনে মন্ত্র লিখল। পাতাটা রাখল হাড়-ঢাকা কাপড়ের মাঝ-বরাবর। তার ওপর বাঘছাল বিছিয়ে বসল।

পরে শুনেছে বুলারাণী, তান্ত্রিক সাধু ওই ভাবে চিতাসাধনা করেন। এঁরা সাধনার গুণে অসাধ্য সাধন করতে পারেন। অসাধ্য সাধন করানোর জন্য, বরাত ফেরানোর জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে শ্মশানে মশানে। সাধুর সন্ধান পেয়েছে, ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গুণানন্দের ডেরায়।

বুলারাণী আসতে আকাশের চাঁদ হাতে পেল যেন গুণানন্দের চেলারা। এই রকমই একজনকে যেন খুঁজছিল তারা। সাধনার অঙ্গহানি ঘটছে তাদের।

কুলনায়িকা মিলছে না। কারো স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে পরপুরুষের পাশে কিংবা মধ্য বসে সাধনা করতে রাজী হচ্ছে না। শাস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে, পুণ্যসঞ্চয়ের মহিমা প্রচার করেও আনতে পারা গেল না কাউকে। আনতে পারা যাচ্ছেও না। গেরস্থ মেয়েদের যুক্তি—ওসব নোংরামি, ওসব ভণ্ডামি। ওতে সাহায্য করা মানে নিজেকে একা শুধু নয়, সেই সঙ্গে চোদ্দপুরুষকে নরকে পাঠানো।

সকলেই ভেবেছে বুলারাণী দেবীপ্রেরিতা। তা না হলে সাধনায় আশাভঙ্গের মুখে, এভাবে এসে হাজির হলো কেন ?

বুলারাণীকে সাধনা চক্রের কুলনায়িকা হিসেবে বরণ করে নেবে তারা। নিজেদের শক্তি—দেবী বলে পূজো-অনুষ্ঠান করবে। প্রস্তাব শুনে খুব বিব্রত বোধ করেছে বুলারাণী। ভাগ্য ফেরাতে এসে এ কি বিড়ম্বনা! এসব কোন্ দেশী কথা শুনছে সে! এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে দেবী বলে পূজো করবে তাকে!

কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখে, স্পষ্ট বলে দিয়েছে গুণানন্দকে—আমার দ্বারা এসব সাধনা-টাধনা সম্ভব নয়। লোকের মন কেড়ে নিয়ে, মন জুগিয়ে চলা আমার ব্যবসা। সেটার বিহিত করতে এসেছি আমি।

সেটার বিহিতই হবে তোর। আসল বিহিত হবে—বুঝলি? হেসে বললেন গুণানন্দ।

বুলারাণী ভাবল, সাধুর দয়া হয়েছে তার ওপর। এতগুলো অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে আসে এখানে। এরা তার খদ্দের হতে পারে—সম্ভবত এই ইঙ্গিতই করলেন সাধু। বুলারাণী খুব খুশী।

প্রথম সাধনা-চক্রে যোগ দিয়েছিল বুলারাণী অমাবস্যার রাতে—গুণানন্দেরই নির্দেশে। চক্রে বসার আগে মনের কোণে একটা আতঙ্ক উঁকি মেরেছে বার বার। গুণানন্দকে প্রশ্ন করে নির্ভয় হয়েছে। বলেছে জানেন তো আমাদের জাত-ব্যবসা—পূজোপাঠ আর ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার—আমায় নিয়ে চলবে তো ?

চলবে চলবে চলবে। গুণনান্দের কণ্ঠে অভয়বাণী শুনেছে। গুণানন্দ বলেছেন, তন্ত্রে বেশ্যাকেও সাধনার অঙ্গ কুলনায়িকা বলা হয়েছে। দেবী জ্ঞানে পূজো করার বিধি রয়েছে। সমাজ যেখানে আস্তাকুঁড় দেখেছে, তন্ত্র সেখানেও দেখেছে দেবীর প্রকাশ।

বুলারাণীর পূজো চলতে লাগল প্রতিরাতে। প্রথম প্রথম কোন আলোড়ন ওঠেনি ভেতরে। কেবলি মনে হতো, লোকগুলো তার বশীভূত হোক। কিন্তু

কিছুদিন পর মন থেকে এ ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছল আশ্চর্য ভাবে। কি করে গেল, কখন গেল, নিজেই বুঝতে পারে নি। তার জায়গায় এলো নতুন ভাবনা। কোন্ স্তরের মানুষ হয়ে কোন্ স্তরে উঠেছে সে। বেশ্যা হয়ে দেবীর সম্মান। সত্যি সত্যিই যদি সে ও-পথ ছেড়ে দেয়—দেবভাবে ভরে ওঠে তার ভেতরটা—না জানে কি আনন্দই না পাবে সে। এসব চিন্তা করার সময় এমন আনন্দ পেতে লাগল, যে আনন্দের তুলনা পাওয়া ভার পৃথিবীতে। এ আনন্দ পায় নি বুলারাণী টাকা-পয়সায়, পায় নি বাড়ি-গয়নায়। পায় নি তার রূপ-গলা নিয়ে স্তাবকদের আকাশ-ছোঁয়া স্তুতিতেও।

লোক বশীভূত করার আর ভাগ্য ফেরানোর কথা ভুলল বুলারাণী। একদিন প্রকৃতই মা হয়ে উঠল সে সকলের। মাতৃমন্ত্রে—'মা-মা' বলে পূজো করা সার্থক হলো গুণানন্দের। বুলারাণীর নতুন জীবনে নতুন নামকরণ করলেন তিনিই। ভৈরবীমাতা।

ভৈরবীমাতা কেন আর অম্বরে আসবেন না—গোপন করেন নি আমার কাছে। খোলাখুলিভাবেই জানালেন। তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে প্রথম যেদিন এসেছিলেন এখানে—সেটাও চৈতের বাসন্তী-অষ্টমী ছিল। বলি চলছিল তখন। অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ থাকলেও সুজন সিংকে চিনতে অসুবিধে হয় নি। সুজন সিং কলকাতায় গেলে তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। দিনে নয়, রাত্তিরে। তাঁর ঘরেই রাতের আস্তানা ছিল ওঁর।

নিজের কাছে নিজেকে বিস্ময়ের বস্তু মনে হয়েছে। সুজন সিং চিনতে পারেন নি তাঁকে। তাঁকে দেখে প্রণাম করেছেন। আশীর্বাদ চেয়েছেন। সম্বোধন করেছেন মাতাজী বলে।

আত্মপরীক্ষা দিতে দ্বিতীয় বার ভৈরবীমাতা এসেছেন—সুজন সিংকে দেখে মনের কোণে কোন বিকার আসে কিনা দেখার জন্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তৃতীয়বারেও হলেন। আর আসবেন না। প্রয়োজন নেই।

একটা জিনিসেরও প্রমাণ হয়ে গেল এখানে এসে ভালো করে। অনেকে বলেছে তাঁকে—তাঁর মুখে আগের লালসা-জাগানো প্রলেপ নেই আর। ধুয়ে-মুছে কোথায় চলে গেছে। এখনকার মুখ-চোখ নাকি আলাদা। সেটা সত্যি। সুজন সিং চিনতে পারলেন না তাঁকে তিনবারেও।
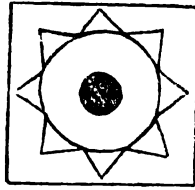
মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত। শুধু মুণ্ডু আর মুণ্ডু। উত্তরদিকের দেওয়ালটা দেখা যাচ্ছে না। মুণ্ডুরই দেওয়াল যেন। চামড়া নেই মাংস নেই—হাড় বের করা প্রত্যেক মুণ্ডুতেই টকটকে লাল সিঁদুর মাখানো। ঘরটা আলো-আঁধারি। একটা প্রদীপ জ্বলছে বাঘছালের ডানপাশে। শিখাটা কাঁপছে। কাঁপছে মুণ্ডুর দেওয়ালে দু'দিকে আলোছায়াও। মনে হচ্ছে, মুণ্ডুগুলোও নড়ে নড়ে উঠছে যেন। এক সঙ্গে সমস্ত। নিচে থেকে ওপর অবধি লম্বালম্বি পর পর আঠারোটা তাকে সাজানো। পড়ার ভয় নেই। তবু রাতে প্রদীপের আলোয় এমন একটা মোহ এসে দু'চোখে ভর করে যে, মনে হয় মুণ্ডুগুলো ষড়যন্ত্র করে লাফিয়ে পড়ে বসা মানুষটাকে ঢেকে ফেলার সুযোগ খুঁজছে।

ঘরটা কেমন যেন হয়ে ওঠে রাত্তিরে। দুটোর পর। পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ। ঘরের বাতাস থমথমে হয়ে যায়। এক একটা মড়ার মাথা জীবন্ত হয়ে নিজের মাথাতেই চেপে বসে বুঝি। এই বোধটাই জেগে ওঠে কেবল। এ-মাথা থেকে ওরা পৃথক নয়। এ-মাথা ও-মাথা দুটোই এক। ওরা আসল—ভেতরের নগ্ন রূপ। নিজেরটা রক্ত-মাংস জমানো বাইরের। ওইটারই বাইরের আবরণ।

এ বিচিত্র অনুভূতি এসেছিল আমার এই ঘরে এসে, মহেশানন্দের সঙ্গে আসনে বসে। আমার মতন একই অনুভূতি রমেন মুখুজ্যের ভেতরেও জেগে উঠেছিল। উনি বলেছিলেন আমায়।

রমেন মুখুজ্যেকে বছরখানেক আগে এই ঘরেই দেখেছিলুম। তখন উনি অন্য মানুষ, অন্য ধরনের। এই ঘরেই আবারো দেখছি আমি ওঁকে। এ আর এক জগতের আর একজনকে। তরুণী-বিধবা পাঁচ বছরের ছেলেটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটাকে ঠিক মতন মেনে নিতে পারছেন না উনি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে ওঁর মন। চাউনিতে ভেতরের ছবিটাই উঁকি মেরে যাচ্ছে থকে থেকে। মুখুজ্যেমশাইয়ের স্ত্রী বিমলাদেবী মহেশানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে। চুপচাপ। হতভম্ব মূর্তি।

মুখুজ্যেমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমারও অবাক হবার পালা চোখের সামনে কি ঘটছে, কি ঘটতে যাচ্ছে—সবই বুঝতে পারছি। তবুও স্থানকালপাত্র ভুলে যাচ্ছি। মনে করার চেষ্টা করলেও ভুলতেই ভালো লাগছে। মন কোথায় কোন্ অজানা দেশে পালিয়ে যেতে চাইছে। ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য বলেই হয়তো এই দশা আমার। অন্যদেরও অস্বাভাবিক অবস্থা বোধহয় একই কারণে।

মহেশানন্দ শুধু ব্যতিক্রম। ওঁর প্রকৃতি অনুযায়ী উনি স্বাভাবিকই। ধীর-স্থির। মনে চঞ্চলতা নেই। দৃষ্টিতেও নেই। উনি খালি দেখছেন মুখুজ্যেমশাইকে নির্লিপ্ত মুখে।

এইরকমভাবে দেখেছিলেন সেদিন সন্ধ্যেয়ও। দুর্যোগ মাথায় করে এসে হাজির হয়েছিলেন মুখুজ্যেমশাই। আদ্দির পাঞ্জাবি আর দিশী কাঁচির কালাপাড় ধুতি ভিজে সপসপ করছে। মোটর থেকে হর্ন দিয়ে ছাতাটা আনিয়ে নিতেও তর সয়নি মুখুজ্যেমশাইয়ের। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসেরও এলোমেলো দাপট কম নয়। মুখ থুবড়ে ফেলে দেবার উপক্রম।

গাড়ির দরজা খুলেই লাফিয়ে পড়লেন গলির মুখে। তারপর ছোটার শুরু পাগলের মতন ছুটছেন। এক, দুই, তিন···চোদ্দ, পনেরো, ষোল। ষোল নম্বর বাড়ির দরজায় থামালেন। ভেতরে এলেন। এলেন এই ঘরে—মহেশানন্দের কাছে।

পরদিন সকালেই মুখুজ্যেমশাইয়ের বাড়িতে গেছলেন মহেশানন্দ।

খাটের ওপর শুয়ে আছেন বিমলাদেবী। বিমর্ষ মুখ। দুর্বল খুব। স্বামীর চোখে চোখ পড়তে মুখ ফেরালেন। মুখুজ্যেমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। যাবার সময় মহেশানন্দের কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিস করে বললেন, ওর বিষয় সব জানিয়েছি তো কাল। ওর বক্তব্যটা আপনি শুনুন এবার। আমি থাকলে, বলবে না। আমি ওর দু'চোখের বিষ। এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছে না আমাকে।

মহেশানন্দ শুনেছেন নিবিষ্ট মনে। জীবন-যন্ত্রণার কথা বলেছেন বিমলাদেবী এক এক করে। লোহা লক্কড়ের ব্যবসার সঙ্গে তেজারতী কারবারটাও চালিয়ে যাচ্ছেন স্বামী। অনেক অন্যায় করেছেন, করছেন, করবেনও ভবিষ্যতে উনি। হাতে-পায়ে ধরে অনেক কেঁদে-কেটে, ও পথ থেকে ফিরে আসতে বলেছেন বিমলাদেবী। অরণ্যে রোদনই সার হয়েছে ওঁর। স্বামী ফেরেন নি। ওঁর

কথা কানে নেন নি। স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, স্বামীকে ওঁর বাধা দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য অনশন শুরু করেছেন। জলস্পর্শ করবেন না আর।

স্বামীকে ফেরাবার জন্য যে তান্ত্রিকের কাছে বিমলাদেবী গেছলেন, তাঁকে স্বামীর অবিশ্বাস। বিমলাদেবী তাঁর কাছে যান জানতে পেরে, কুরুক্ষেত্র করেছিলেন বাড়িতে। বাড়ি থেকে বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ একেবারে। সাধুকে উনি সাধু বলে মনেপ্রাণে মেনে নিতে না পারলেও, মেনে নিয়েছেন বিমলাদেবী। মানার প্রমাণও আছে যথেষ্ট। নিজের চোখে দেখেছেন বিমলাদেবী তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ।

তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কার ওপর স্বামীর আকর্ষণ বেশী। কার কুবুদ্ধিতে ওঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন। কে স্বামী-স্ত্রীতে মিল করাতে দিচ্ছে না।

মহেশানন্দ জিজ্ঞেস করেছেন, কে ?

একজন দুষ্টু স্ত্রীলোক।

বিমলাদেবী দেখেছেন দুষ্টু স্ত্রীলোককে।

দেখিয়েছেন সেই সাধু। হোমের আগুনের তাপে খাতার পাতা ছিঁড়ে ধরেছেন। বিস্মিত চোখে দেখেন বিমলাদেবী, সাদা কাগজে ফুটে উঠেছে পরিষ্কার একটি নারীর রেখাচিত্র। সাধু বলেছেন, এই মেয়েই বিমলাদেবীর মস্তবড় দুশমন।

এ ছাড়াও বিমলাদেবী দেখেছেন সাধুর অলৌকিক শক্তি। মাটির কালী প্রতিমাকে নিবেদন করা মদ চোখের নিমেষে দুধ হয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাধু, ক্রিয়াকলাপ করে দুশমনকে হটিয়ে দেবেন। খরচপত্তর চেয়েছিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য—যাওয়া আর হয়ে উঠল না। ড্রাইভার যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ওঁর সঙ্গে—এটা ভাবতে পারা যায় নি। বলে দিয়েছিল স্বামীকে সব। সেই থেকে গৃহবন্দিনী নজরবন্দিনী বিমলাদেবী। মানসিক নির্যাতন ভোগ করে চলেছেন। এবারে অনশনব্রত করে বাঁচতে চান।

বিমলাদেবীর মনে সাধুর দেখানো নারী-শত্রুর ছবি এমনভাবে এঁকে বসেছিল যে, শত বুঝিয়ে, নানান যুক্তি দেখিয়েও মহেশানন্দ মুছে ফেলতে পারেননি। ওঁর ভুল ভাঙাতে পারেন নি। ওসব কিছু না, ওসব ভেল্কি-ম্যাজিক বলেও না।

তান্ত্রিক সাধুদের ওপর ক্রিয়াকলাপের ওপর স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস দেখে, অনশন ভাঙানোর জন্য বন্ধুর কাছ থেকে প্রকৃত তন্ত্রক্রিয়ার অভিজ্ঞ প্রকৃত

সাধুর সন্ধান পেয়ে ঝড়বাদলের দিনেও মহেশানন্দকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন মুখুজ্যেমশাই স্ত্রীর কাছে।

মহেশানন্দের বোঝানোয় অনশন ভাঙেনি বিমলাদেবীর। বরং ভীষণ উগ্র হয়ে উঠেছেন উনি। তীব্র-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছেন, জ্ঞান দিতে আসবেন না আমায়। আমি নিজে যা দেখেছি-বুঝেছি—ঠিকই। ওনার কথায় আমার বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করে কেউ—এটা পছন্দ করিনে মোটে আমি।

মহেশানন্দ বুঝেছিলেন, বিমলাদেবীর মন পঙ্গু-ব্যাধিগ্রস্ত। এ মনকে সুস্থ করে তুলতে গেলে, অন্য পন্থা ছাড়া উপায় নেই।

অন্য পন্থার জন্য ওঁকে অন্য ধরনের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে—জাদুর খেলায় নিপুণ যে। ভেল্কি দেখিয়েই বিমলাদেবীর মন থেকে শত্রুর চিন্তা সরিয়ে দিয়েছেন মহেশানন্দ। লেবুর রসে ডুবিয়ে সাদা কাগজে স্ত্রীলোকের রেখাচিত্র এঁকেছেন নিজের ঘরে। কাগজটা শুকনো হলে, অদৃশ্য হয়েছে রেখাচিত্র। অদৃশ্য রেখাচিত্রকে হোমের আগুনের সামনে ধরে দৃশ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন বিমলাদেবীর ঘরে। তারপর সেই কাগজটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে হোমের আগুনে আহুতি দিয়ে বলেছেন, বেটী বিমলা! তোমার শত্রু জন্মের মতন বিদেয় নিল। উৎসর্গ করা মদকে দুধ করে দেখিয়েছেন শালিধানের বড়ি ফেলে দিয়ে অলক্ষ্যে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছেন বিমলাদেবী। খুশির ঢল নেমেছে মুখে। বলেছেন, মহারাজ! আপনার হাতেই মায়ের প্রসাদী ফল খেয়ে অনশন ভাঙব আমি এখুনি।

অনশন ভাঙার পর হোমের আগুন স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন মহেশানন্দকে। মহেশানন্দ মুখার্জীমশাইকে ফেরাবেন। অসৎ-উপায়ে রোজগার করা বন্ধ করাবেন।

কথা দিয়েছিলেন যেমন, কথা রাখার চেষ্টাও করেছিলেন মহেশানন্দ তেমনি। আসতে বলেছেন মুখার্জীমশাইকে রোজ রাতে একবার করে। এসেছেন মুখার্জীমশাই। এই ঘরেতেই এনেছেন মহেশানন্দ। বাঘছাল ঢাকা পঞ্চমুণ্ডী-আসনের ওপর নিজে বসে, মুখার্জীমশাইকে সামনে পাতা কম্বলের আসনে বসতে আদেশ করেছেন।

মৃদু হেসে বলেছেন, নিজের ভেতরটাকে দেখার জন্য মুণ্ড-সাধনা! এই পঞ্চমুণ্ডী আসনের ওপর বসে বসে ধ্যান ধারণা করা। শবাসনের—শবদেহের

ওপর কম্বলের আসন বিছিয়ে সাধনা করাটাও তা-ই। রক্তমাংসের মানুষটাই যথাসর্বস্ব নয়। একটা হাড়ের কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে শুধু।

এই সাধনায় একটা মানুষ তিনটে হয়ে যায়। দর্শক, রক্তমাংসের শরীর, কাঠামোর শরীর। দর্শক-আমি, দেহ-আমি, কাঠামো-আমি। দর্শক-আমি নির্লিপ্ত-নির্বিকার। দেহের ভেতর রাগ-দ্বেষ-হিংসা-মোহ-বাসনাকে দেখছে সে। সে দেখছে এসব ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতে যা কিছু ক্ষণস্থায়ী—সব হারিয়ে যেতে লাগল। হারিয়ে গেল রক্ত-মাংস-মজ্জা-স্নায়ু-শিরা-উপশিরা মস্তিষ্ক-চামড়া! রইল খালি হাড় আর হাড়ের স্তূপ। হাড়ের স্তূপে হিংসা দ্বেষ-মোহ-রাগ-বাসনা—কোনটারই চিহ্নমাত্র নেই।

দর্শক-আমিই আসল মানুষ। কেবল মানুষই নয়—মহামানুষ। দর্শক-আমি হাড়ের কাঠামো নয়, রক্ত-মাংসের দেহ নয়। স্বতন্ত্র। দর্শক-আমি শবের ওপর বসে নিজের শবকেই দেখে, নিজের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎকে দেখে।

পঞ্চমুণ্ডর আসনে বসে শেয়াল-সাপ-বানর আর ব্যাঙের মুণ্ডুর সঙ্গে মানুষের মুণ্ডু দেখে। নিজের রক্তমাংসের দেহে এই সব পশুর অপগুণ বর্তমান। সমস্ত অপগুণের ওপর দর্শক-আমি। দর্শক-আমি সব মানুষের দর্শক-আমির সঙ্গে একাত্মা। একাত্মার চিন্তা করার জন্যও মুণ্ড-সাধনা। পর পর সাজানো মুণ্ড দেখে দেখে, একটা ছাপ পড়ে যায় মনে। নিজের অজ্ঞাতেই মুণ্ড-সাধনার গোপন-সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোড়ন হতে থাকে ভেতরে।

সাধনার যথার্থ অর্থ বুঝে মুখুজ্যেমশাই সাধনা করে গেছেন প্রতি রাতে মহেশানন্দের সামনে—মহেশানন্দের সাধন ঘরে।

সাধনার সুবিধের জন্য, তাড়াতাড়ি মন তৈরি করার জন্য মহেশানন্দের আদেশ মতন 'অঘমর্ষণ' ক্রিয়াটাও নিয়মিত করে গেছেন মুখুজ্যেমশাই রোজ। বাঁ হাতের তেলো থেকে দু-তিন ফোঁটা জল টেনে নিয়েছেন বাঁ নাক দিয়ে। ভেবেছেন, সেই জলবিন্দু বিশাল হয়ে উঠেছে ভেতরে। বিশাল জলতরঙ্গে বিদ্যুতের ঢেউ তুলে তুলে উঠেছে। ভেতরের মত কালিমা একটা ছোট কালো পুরুষ হয়ে বিদ্যুতের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এসেছে ডানদিকের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ডান হাতের তেলোর ওপর গরম জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার সঙ্গে। জল সুদ্ধ অসুরকে কালো পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে মেরে ফেললেন—চিন্তা করতে করতে হাতের জল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন মুখুজ্যেমশাই।

মহেশানন্দ বলেছেন, ভালো কল্পনা মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার

প্রেরণা যোগায়। ভেতরের কালিমা ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতে সত্যিই একদিন কালিমাশূন্য হয়ে যায় মানুষ। অন্যায় করার প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কখনো তার ওপর।

সুন্দর চিন্তা সুন্দর কল্পনা সুন্দর ধ্যান।

সাধনায় ধ্যানে ক্রিয়ায় নিষ্ঠার কোন ত্রুটি ছিল না মুখুজ্যেমশাইয়ের বছর খানেক ধরে। মুখুজ্যেমশাই নিজেকে তফাত তফাত দেখে চিনছেন ভালো করে। চিনেছেন নিজের ভেতর নিজের বার। নিজে কত নৃশংস কত নিষ্ঠুর কত সদয় কত মহৎ। আবার এ দুটো দিকের ওপরেও—সকলের আপনার।

নিজের অন্যায়কে আলাদা করে দেখতে শিখেছেন, রাখতে শিখেছেন। বাঁচতে শিখেছেন অন্যায় করা থেকে। অন্যায়ের খড়্গে বলি হওয়ার মুখ থেকে মানুষকে টেনে এনে বাঁচিয়ে তোলার নীতিজ্ঞান এসে গেছে।

প্রমাণ হতে বসেছে এই ঘরেই সেইটা।

বিমলাদেবীর সংশয়—স্বামীর অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তন সত্যিই কি এলো বেঁচে থাকতে থাকতে—সুখস্বপ্নের মতন? কাজটা হাতে-কলমে না হওয়া অবধি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না উনি।

হবেনই বা কেমন করে? উনি যে নিজে দেখেছেন সব। বিধবা তরুণীটির হেনস্থা হতে দেখেছেন। মুখুজ্যেমশাইয়ের দু'পায়ে কেঁদে আছড়ে পড়েছে মেয়েটি। পায়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছে, বাঁচান অন্তত ছেলেটাকে। বাড়ি-জায়গা নিয়ে নিলে, পথে দাঁড়াতে হবে। অন্য কোন সম্পত্তি নেই আর। না খেতে পেয়ে বাচ্চাটা শেষ হয়ে যাবে। একটু দয়া করুন। মা-ছেলে—দুজনে মিলে আপনার বাড়িতে চাকর-ঝির কাজ করে, সুদ আসল শোধ করব না হয় সারাজীবন ধরে।

পাথরের বুকে ঘা পড়েনি। পাথর গলেনি, টলেনি, মুখুজ্যেমশাই জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে, হাসতে হাসতে চলে গেছেন পাশের ঘরে। বিমলা-দেবীর অনুরোধ-প্রার্থনা-কান্না মুখ থুবড়ে থুবড়ে পড়ে গেছে সব মুখুজ্যে-মশাইয়ের অট্টহাসির ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।

সেদিনের সেই মানুষ আর এই মানুষ! বিমলা দেবীর দৃষ্টি আটকে আছে স্বামীর মুখে। মানুষটা বিধবা মেয়েটিকে নিজেই ডেকে এনেছে।

চোখের নিমেষে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। বাড়ি ঘর যা নিয়েছিলেন মুখুজ্যেমশাই দলিল দস্তাবেজে সইসাবুদ করে বিধবা তরুণীটির হাতে তুলে

দিলেন। ওর সম্পত্তি ফেরত দিতে পারায় খুশি খুব! আগের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলেন জোড় হাত করে।

হাসির জোয়ার বিমলা দেবীর চোখে-মুখে।

বিমলা দেবীর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন মহেশানন্দও। ভাবখানা—স্বামী এবার মনোমত হয়েছে তো?

আমার মনে হচ্ছে, ঘরের প্রতিটি মুণ্ডুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। প্রতিটিই মহেশানন্দের মুখ। শতমুখে হাসছেন মহেশানন্দ।

কি করুণ কান্না
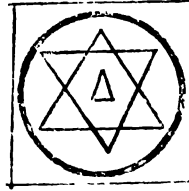
একটা চৈতের সংক্রান্তিতে।

সারাটা দিন ধরে গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই মিলে গাজন উৎসবে মাতামাতি করেছে। কলসী কলসী তাড়ি শেষ করেছে ওরা গিলে গিলে। এমন অভ্যস্ত যে, নেশা ওদের কাবু করতে পারে নি তবু। ঘাড়ে মুখ গুঁজড়ে মাটির বুকে শয্যা নেয় নি কেউ। এতটুকু ক্লান্তি নেই শরীরের কোনখানে।

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরো আসুরিক শক্তি বাড়ছে গাজনের সন্ন্যাসীদের। এরা 'কালিকার পাতা' অর্থাৎ শিবভক্ত—শিবের চেলা। মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলটায় জেমোকান্দি গাঁয়ের অনেক প্রাচীন লোকের এদের সম্বন্ধে এই রকমই ধারণা।

এদের ক্রিয়াকলাপ চোখে দেখা যায় না। বিশেষ করে শেষরাতের কাণ্ডকারখানা। পৈশাচিক ব্যাপার। দেখলে, পিশাচেরও হৃৎকম্প হবে। লজ্জায় মাথা হেঁট করে দূরে পালাবে।

শিবমন্দিরের সামনেটা একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। ওরা ধ্যান করছে। আত্মা আসছে—মৃতদেহের আত্মা। পচাগলা শবদেহ—একটা নয়, গোটা চারেক। একটা জানা, বাকি তিনটে কোথা থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। আবির ঢেলেছে শবদেহে। আবিরে আবিরে ভরিয়ে দিয়েছে। এক একটা মৃতদেহকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে গোটা আষ্টেক করে সন্ন্যাসী। রাত পোহাতে তখন অনেক বাকি। শেষ প্রহর শুরু হয়েছে সবে মাত্র।

ধ্যান ভাঙল সন্ন্যাসীদের। ওদের উন্মত্ত-উল্লাস আর অট্টহাসিতে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। আবহাওয়া আর পরিবেশটা ভয়াবহ থমথমে হয়ে উঠল। রাতের অন্ধকারে ওদের মধ্যে দিয়ে মৃতদেহের অতৃপ্ত আত্মা আর শিবের ভূতপ্রেতই জেগে উঠল বুঝি।

সন্ন্যাসীরা উঠে দাঁড়াল।

ওদের মুখের আদল পালটেছে। ভয়ঙ্কর রক্তজবা দু'চোখ। এক এক চক্রের প্রধান সন্ন্যাসী সেই চক্রের আবির মাখানো থসথসে শবদেহটাকে কাঁধে তুলে নিল। আরম্ভ হলো তাণ্ডবনৃত্য। নাচের দাপটে মরার মাংস খসে খসে পড়ছে চতুর্দিকে। দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস।

আমগাছটার নিচে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল মমতারাণী। নীরবে দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল শুধু গাল বেয়ে। এবারে চোখে হাত চাপা দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতন ককিয়ে কেঁদে উঠল।—শীগ্‌গির নাচ থামাও। খোকার হাত-পা —সব খসে খসে পড়ে গেল যে গো!

উঠতে বারণ ছিল একদম। ভুলে গেল। উঠে পড়ল। পাগলের মতন দৌড়ে এসে আছড়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে। সংবিৎ ফিরে পেল সন্ন্যাসী। ক্রোধে ফেটে পড়ল। ঘাড়ের মৃতদেহটাকে এক হেঁচকায় টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মমতারাণীর কোলের কাছে। তোর জিনিস তুই নে। বাঁচানোর দায়দফা নেই আর আমার। মা হয়ে বাধা দিলি নিজেই।

মরা ছেলের পচা দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলেছে মমতারাণী, ক্ষমা কর, ভুল করেছি। দয়া করে প্রাণটা ফিরিয়ে নিয়ে এসো খোকার।

মমতারাণীর মুখের দিকে একবার আর ছেলের শবের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সন্ন্যাসী। স্থানত্যাগ করেছে তখনি। ওর দেখাদেখি অন্যেরাও মরা ফেলে রেখে স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। বাতাসে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছে।—সকলের সাধনাটা পণ্ড হয়ে গেল স্রেফ মমতারাণীর হঠকারিতার জন্য।

দূরে দাঁড়িয়েছিল চিদানন্দ। গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে সমস্ত। চিদানন্দ এসেছে এদের ক্রিয়াকলাপের ভেতর থেকে—যদি কিছু সত্যি থাকে—খুঁজে বার করার জন্য। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে আগমন তার এখানে।

মমতারাণীর কাছে এলো। সান্ত্বনা দিল।—জগতে সবারই এই দশা হবে

একদিন। যে মৃতদেহে তাজা রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক নেই, সেই মৃতদেহে প্রাণ আসবে কেমন করে? এক ছেলে গেছে তোমার, অনেক ছেলে আসবে।

কথা শুনলে, মরা মানুষও জেগে ওঠে। এ প্রবাদ-বাক্যটা মমতারাণীর বেলায় খাটল। মরা মানুষ জেগে না উঠুক, জ্যান্ত মানুষ মমরাতারাণী চমকে উঠল। সজাগ হয়ে বসল। বড় বড় চোখ করে নির্বাক মুখে চেয়ে রইল খানিক। দেখল চিদানন্দের চোখ-মুখ। উপহাস করছে কিনা। না, এ মুখ দেখে মনে হয় না তা। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। আর সবের মতন নয়। স্বতন্ত্র ধরনের।

কথা কইতে ইচ্ছে করছে না। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। শোকে কাতর তবুও চিদানন্দের ভুল ভাঙানোর জন্য কথা কইল মমতারাণী।

শিবরাত্রির সলতে ওই একটি মাত্র ছেলে। আশা-ভরসা করতে বারণ করেছে সবাই। অত মুখ-চাওয়া হলে হারিয়ে যাবার ভয় বেশী। শেষ অবধি হলোও তা-ই। ছেলেটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে—বিছানায় শয্যাগত তখন—মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে হাসত মিটিমিটি। ডাক্তার-বদ্যিকে কপালের রেখা কোঁচকাতে দেখে, বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয় কালব্যামোর হাত থেকে নিস্তার নেই তার। আট বছরের ছেলে আটাশ বছরের বুদ্ধি ধরত। বলত, তুমি ভেবো না। যাব না কোথাও। গেলেও আসব। বাপীর মতন করব না। আমায় ডাকলেই আমি আসব।

দু'বছর হলো বাপ চলে গেছে। ছেলে অনেক ডেকেছে। আসে নি। মা ডেকেছে, আসে নি। ছেলেকে দিন দশেক সন্ন্যাসীরা মাটির তলায় পুঁতে রেখে, সেই মাটির ওপর আসন করে বসে সাধনা করল। ওরা বলেছিল আসবে। মমতারাণী বাধা দিয়ে ফেলেছে।

কাঁদছে মমতারাণী। কাঁদছে আর বলছে। সে বিধবা। অনেক ছেলে আসার কোন উপায় নেই তার। সিঁদুর মোছা সিঁথি দেখিয়ে, কপাল চাপড়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল।

আশ্বাস দিল চিদানন্দ।—ছেলেকে কাছে আনতে হলে তোমাকেও প্রস্তুত হতে হবে সেইভাবে। দেহহীন আত্মার সংস্পর্শে আসতে গেলে, নিজের দেহ থেকেও দেহ নেই, আছে কেবল আত্মা—এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে ধৈর্য-নিষ্ঠা নিয়ে—মরা দেহটাকে এভাবে জড়িয়ে ধরে নয়।

চিদানন্দের আদেশ-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে মমতারাণী। তারা-সাধনায় নিজের মন-প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে। সবাই যখন ঘুমে মগ্ন,

সেই নির্জন রাতে। ঘরের ভেতর একলা তারামূর্তির সামনে বসে বসে সাধনা করেছে। তারামূর্তি আর নিজে এক হয়ে গেছে। কখন রাত কাবার হয়েছে খেয়াল নেই।

ভোরের রোদ্দুর জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছে ঘরে। খট খট করে খড়মের আওয়াজ এসেছে কানে। ঘরে ঢুকেছে চিদানন্দ। মমতারাণীর মাথায় কোশার জলের ছিটে দিতে দিতে বলেছে, তারিণীং অভিষিঞ্চামি, তারিণীং অভিষিঞ্চামি, তারিণীং অভিষিঞ্চামি।

মমতারাণী চোখ খুলেছে। চিদানন্দের মুখের দিকে তাকিয়েছে। ফর্সা মুখে তার। প্রতিমার নীলরঙেরই ছোপ দেখেছে যেন। ধীরে ধীরে ধ্যানের দৃষ্টি মিলিয়েছে মমতারাণীর। পৃথিবীর আলোর ছোঁয়া লেগেছে চোখে।

পরদিন রাতে আবার বসেছে সাধনায়।

শত কুশপত্রে তৈরি করেছে শবদেহের অনুরূপ একটা পুরো কুশপত্রের মানুষ। একে ভেবে নিয়েছে প্রকৃত শব। বসেছে এই শবের ওপর। তারপর শুরু হয়েছে সাধনা।

ধ্যানচক্ষে দেখেছে মমতারাণী দেহের এক এক জায়গায় তারা-মন্ত্রের এক একটি শব্দের ভিন্ন ক্রিয়া, ভিন্ন রূপ। নাভিতে লাল রঙের 'হ্রীং' বীজমন্ত্র আরো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। জ্বলছে দাউ দাউ করে। লাল আগুন হয়ে জ্বলছে। হাড় ক'খানা বাদে দেহের সব কিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বুকের কাছে হলদে 'স্ত্রাং' বীজ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরিয়ে আসছে। সমস্ত ছাই উড়িয়ে দিয়ে, মিলিয়ে দিচ্ছে শূন্যে। ধবধবে সাদা 'হুং' বীজ মাথায়। 'হুং' থেকে অমৃতধারা ঝরে পড়ছে পুরো কঙ্কালটার ওপর। বজ্রকঠিন হয়ে উঠেছে প্রতিটি হাড়।

কঙ্কালের কাঠামোয় প্রত্যেক অঙ্গ গড়ে উঠছে দেবীর। হাতে হাত পায়ে পা মুখে মুখ। রঙটি পর্যন্ত। সারা শরীর নীলে নীল। এখন মমতারাণী নিজেই তারামূর্তি। কুশপত্রের শবটা হয়ে গেছে মমতারাণীর আগেকার দেহ। এটা তার মৃতদেহ। নিজের ওপর আসন করে নিজে বসে আছে সে। একটা তার দেহ, একটা তার আত্মা। নিচেরটা দেহ, ওপরেরটা আত্মা। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর।

অবিনশ্বর আত্মায় পৃথিবীর সমস্ত মৃতদেহের আত্মা এসে মিশছে। নিজের ছেলের আত্মাও এসে মিশল। মমতারাণী ছাড়া অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মা— তারামূর্তি ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। চতুর্দিক শূন্য। তারামূর্তির

নিচের বাঁহাতে নরকপালে ছেলের দেহটা পড়ে রয়েছে। হারায়নি। ওপরের হাতে নীলপদ্মে ছেলের হাসি হাসি মুখ। ওপরের ডান হাতে চকচকে খাঁড়াটায় ভয়ঙ্কর-দর্শন একখানা মুখ হাসছে, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ত্রাসে এতটুকু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কালের দাপট খাটছে না এখানে, খাটে না। গ্রাস করতে গিয়ে নিজেই গ্রাসের মুখে পড়ে যাচ্ছে। কালের পরাজয় এখানে প্রতিমুহূর্তে। নিচের হাতে কাটারিতে দিব্যজ্ঞানের এই কথাটা তপ্তকাঞ্চন বর্ণে লেখা হয়ে উঠছে বার বার। এবার তারামূর্তির মুখখানা ছেলের মুখ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ছেলের মুখ আবার তারামূর্তির মুখের আদল পেল।

বিচিত্র লীলা। কিছুই হারায় না। মহাশক্তির কোলে সব কিছু ধরা থাকে। দেখার চোখ থাকলে সব দেখা যায়, সব বোঝা যায়। চিদানন্দের এই কথাগুলো মাথায় কোশায় জল ছিটোবার সময় মন্ত্রের সঙ্গে যেন শুনতে থাকে মমতারাণী প্রতিদিন সকালবেলায়। ধ্যান ভাঙলেও মন কিন্তু এক শোকতাপহীন স্বর্গের রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে তার।

শোকমুক্ত হবার আর আত্মজ্ঞান লাভের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল চিদানন্দ সেই পথেই এগিয়ে এগিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে মমতারাণী। মমতারাণী আজ আর মমতারাণী নয়। শুদ্ধামা। সব ছেলেই তার ছেলে।

শুদ্ধামার মুখেই শুনলুম আমি সব কথা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো আমার।

আগুন জ্বলছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। চৌকোণা তামার পাতের ওপর মাটির ত্রিকোণকুণ্ড। হোমের আগুন জ্বলছে কুণ্ডের ভেতর। শিখাটা বড্ড বেশী কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। আবার ধীর-স্থিরও হয়ে যাচ্ছে একদম। ছোটখাট আগুনের গাছ যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কেন এমন হচ্ছে বুঝি না। ভেতরের নিগূঢ় তত্ত্ব কি—তাও জানি না। জানি শুধু আমার চোখের সামনে আগুনের দু'রকম খেলা চলছে। আমি পূর্বদিকের দেওয়ালে ঘেঁষে বসে বসে দেখছি একমনে।

আগুনের দু'দিকে দু'জন। মুখোমুখি বসে আছেন। বীরানন্দ আর কমলেশ। দু'জনের কুশাসন। ফটিকের মালা গলায়। কপালে লাল সিঁদুরের ত্রিকোণ তিলক। ওঁরা দু'জনেই শিক্ষার দিকে নির্নিমেষ চোখে দেখছেন। লাল-নীল-সাদা-ধোঁয়াটে রঙ শিখাটার রঙ এক এক বারে। সব ক'টা রঙ মিলিয়ে একটা অক্ষর হয়ে উঠছে যেন আবার। অক্ষরটাআগুনেরভেতরই উঠছে নামছে, নামছে উঠছে। জলন্ত অক্ষর জল জল করে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

একটা অজানা তন্ময়তা পেয়ে বসছে আমায়। দু'চোখে ঘুম নামছে বুঝি। কমলেশ আর বীরানন্দেরও চোখ বোজা। ঘুমোচ্ছেন কি ধ্যান করছেন— জানি না। নিস্পন্দ-নিথর ওঁরা। প্রাণহীন শব কিংবা পাথরের প্রতিমূর্তি দু'টি। আগেকার কালে মন্ত্রবলে মানুষকে পাথর বানানো যেত নাকি। মানুষের রক্তমজ্জা জমে গিয়ে পাথর হয়ে উঠত নাকি। এটাই সেই দৃশ্য কিনা, তারই পূর্বাভাস কিনা—জানি না। নানা রহস্যজাল বুনে চলেছি নিজেরই মনে।

আসানসোলের এ ঘরটায় আমরা তিনজন ছাড়া চতুর্থ কেউ নেই। হোমকুণ্ডের পাশে নেই পরিতোষ, নেই অপরাজিতা, নেই রেখারাণী, নেই দেবীকিঙ্কর সাধু। ওঁরা কেউ এখানে নেই, কিন্তু ফরিদাবাদের বাড়িতে দোতলার কোণের ঘরটায় ছিলেন সেদিন। সেটা কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথি, শনিবার বিকেলের দিকে। আমি বীরানন্দ ছিলুম না। ছিলেন কমলেশ। ছিলেন বললে ভুল বলা হবে। কমলেশ গেছলেন। ইচ্ছেয় যান নি, অনিচ্ছায়। একটা বিরাট চুম্বকের আকর্ষণ তাঁর মন তাঁর প্রাণ মুঠোয় পুরে টানতে টানতে ঘরের বার করেছে। তারপর জোরে জোরে—আরো জোরে—বাতাসে সাঁতার কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে গেছে ওই ঘরটার ভেতর। সব বুঝতে পারছিলেন কমলেশ। জ্ঞান হারান নি। ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা।

কমলেশ তখন ফরিদাবাদে। বাড়িটায় ঢুকেই তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিলেন। তারপর ওই ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন। এক, দুই, তিন। তিনবারের বার কপাট খুলে গেছল। ভেতর থেকে খুলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন অপরাজিতা। বললেন, গুরুদেবের সামনে গিয়ে বস! কম্বলের আসন পাতা রয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসেছেন গিয়ে কমলেশ। সামনে হোমের আগুন জ্বলছে। পাশে রেখারাণী। আগে থেকেই বসেছিলেন। এপাশে এসে বসলেন

অপরাজিতা। ওঁর নিজের আসনে। আগুনের ওপারে বসে আছেন গুরুদেব—দেবীকিঙ্কর সাধু, আর তাঁর কাছ থেকে একটু তফাতে পরিতোষ।

লোহার পাতের ওপর আটকোণা তিনপায়াওলা হোমকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। আগুনটা নিভু নিভু হয়ে আসছে। সেই মরা আগুনের দিকে তাকিয়েই বিড়-বিড় করে কি সব মন্ত্র বলছেন দেবীকিঙ্কর। এত আস্তে—শোনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। দু'হাতে একটা ভূর্জিপত্র ধরে হোমের তাপ লাগাচ্ছেন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন কমলেশ—ভূর্জিপত্রে তারই নাম লেখা। মন্ত্রের সঙ্গে নাম। ওঁ নমঃ আদিপুরুষায় কমলেশং আকর্ষণং কুরু-কুরু-স্বাহা। এই মন্ত্রটাই বার বার পড়ছিলেন দেবীকিঙ্কর। যাঁকে আকর্ষণ করছিলেন তিনি এসে গেছেন। তবুও জপসংখ্যা বোধহয় শেষ হয়নি, তাই করে যাচ্ছেন। পরিতোষ পাশে রাখা একখানা খয়ের কাঠ গুঁজে দিলেন আগুনে। অগ্নিরক্ষার দায়িত্ব তাঁর—যাতে না মাঝপথে নিভে গিয়ে আকর্ষণ-ক্রিয়া পণ্ড হয়ে যায়। অন্যেরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসে দেখছেন।

কমলেশের দরজায় ধাক্কা, অপরাজিতার খোলা, আসনে বসতে বলা, কমলেশের আদেশ শিরোধার্য করা—কিছুই পৌছয় নি দেবীকিঙ্করের কানে। কিছুই চোখে পড়েনি ক্রিয়াতন্ময় মানুষের। উনি দৃঢ়পণ করে বসেছেন আসনে—ওঁর শিষ্য-শিষ্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেনই। পরিতোষ আর অপরাজিতার অনুরোধে আকর্ষণ করে এনেছেন কমলেশকে। তবুও ক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসন ছেড়ে উঠছেন না। কোন ফাঁকফাঁকি রাখবেন না তিনি ক্রিয়াকলাপে। রাখেনও না তিনি কারো বেলায়।

কালো ধুতরোপাতার রসের সঙ্গে গোরচনা মিশিয়েছেন ভালো করে নিজে হাতে। করবীডালের কলম দিয়ে লিখেছেন ভূর্জিপত্রে নাম-মন্ত্র। এ ক্রিয়ায় নামার দিন তিনেক আগে—ভরণী নক্ষত্রে 'উচ্চাটন' ক্রিয়াটাও করে রেখেছেন। কমলেশ ঘরে টিকতে যাতে না পারে একেবারে। পেঁচার হাড়কে 'ওঁ দহ-দহ দল-দল স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার মন্ত্রপূত করে অলক্ষ্যে কমলেশের ঘরে ফেলিয়ে দিয়েছেন লোক-মারফত। ঘরে তিষ্ঠোতে পারেন নি কমলেশ। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি অনুভব করেছেন দারুণ। বেরিয়ে এসেছেন। বারান্দায় দড়ির চারপাইয়ে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন।

হোমকুণ্ডের আগুন নিভিয়ে দিলেন দেবীকিঙ্কর কমণ্ডলুর জলে। তাকালেন মুখ তুলে সকলের দিকে। কমলেশের চোখে চোখ পড়তে তাকিয়ে রইলেন খানিক। পিঠ-ভর্তি জটার গোছা গুটিয়ে নিলেন দু'হাতে করে। মাথার ওপর

চূড়ো বাঁধলেন। এবার লোহার থালার খই ঢাললেন মরার খুলিতে। দেবীঘটের সমুখে তিনটে মরা গোরুর মাথার উনুনের ওপর বসিয়ে তলায় খয়ের কাঠের আগুন জালানো হলো। মরার হাতের হাড় দিয়ে খই ভাজার পর মাথায়-গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো কমলেশের।

দেবীকিঙ্করের অট্টহাসিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল। সুশৃঙ্খলে কাযসমাধা হয়েছে। আর কোন ভয় নেই—বললেন বজ্রগম্ভীর স্বরে। উটছালের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন। কমলেশের পিঠে জোরে একটা চাপড় মেরে বললেন, ওঠ!

সংবিৎ ফিরে পেলেন কমলেশ। দৃষ্টির ঘোর কাটছে, কাটছে আচ্ছন্ন ভাবটাও। স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে। দু'চোখ মেলে দেখলেন দেবীকিঙ্করকে। কালো ভূতের মতন মানুষকে আরো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে পরনের ধুতিটার জন্য। ছাই রংয়ের। কি বিচ্ছিরি! কমলেশের ভেতরটা রাজ্যের বিষাদে ভরে উঠছে। বেশ জোরেই দেবীকিঙ্কর বললেন, আমার দিকে অমন করে দেখছিস এত কি? যাদের দেখার তাদের ছাখ। ছাখ রেখারাণীকে। ছাখ পরিতোষকে। ছাখ অপরাজিতাকে।

মাসখানেক ধরে এদের তিনজনকে নিয়েই আলাদা জগৎ সৃষ্টি করছেন কমলেশ। পরিতোষ রেখারাণী আর অপরাজিতা ছাড়া কেউ নেই যেন তাঁর তুনিয়ায়। মরা-মা আর সংমাকে তো ভুললেনই, সেই সঙ্গে বুড়ো বাপকেও। বন্ধু-বান্ধবদের তো কথাই ওঠে না। দেখলে, মুখ ঘুরিয়ে নেন, চোখ ফিরিয়ে নেন।

একটা যন্ত্রচালিত মানুষ বনে গেছলেন। কেউ যেন নেপথ্য থেকে কলকাঠি নেড়ে যেমন চালাতেন, তেমনি চলতেন উনি। যা করাতেন তাই করতেন। তাঁর চোখের ঠুলি ওঁর চোখে পরিয়ে যা দেখাতেন, যা চেনাতেন—তা-ই দেখতেন, আপন-পর হিসেবে তাকেই চিনতেন।

এ ভাবটা কাটল দেবীকিঙ্কর ফরিদাবাদ ত্যাগ করতে। পূর্বের অবস্থা ফিরে পেলেন আবার কমলেশ। স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সদাসর্বদা। আসানসোলে বাবার কাছে যাবেন। না গেলে নিস্তার নেই, প্রাণে বাঁচা দুষ্কর। কিন্তু কেমন করে বাঁচবেন তিনি? তিনজনের তিনজোড়া চোখ এড়িয়ে যাবেন কেমন করে? ওয়ার্কশপে অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার পরিতোষের তীক্ষ্ণদৃষ্টির পাহারা তাঁর ওপর। বাড়িতে অপরাজিতা আর রেখারাণীর

চোখের বাইরে যাওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার। উপায় নেই। এ'দের তিনজনের কাছে তাঁর কেনা গোলামের জীবন আর সহ্য হয় না। এঁদের সোনার শেকল ছিঁড়ে বেরোতে না পারলে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মরে বাঁচবেন তবু।

কি কুক্ষণেই না পরিতোষের কাছে হাত দুটো সহজভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সোনার শেকলে বাঁধবার জন্য। তখনকার ঘটনাটায় ভেবেছিলেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এখন দেখা যাচ্ছে, সৌভাগ্যের মুখোশ পরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দুর্ভাগ্য, তাঁর অকালমৃত্যু।

বাবার কথায় অভিমান করাটাই কাল হ'লো তাঁর। গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন সবে। বাবা বললেন, দিনরাত এত ফিটফাট, এত বিলাসিতা—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে শখের জিনিসপত্তর কেনাকাটা করো এবার।

নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য দেশান্তরী হলেন। অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে ফরিদাবাদে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানায় কুলির কাজ পেলেন। কুলি—কুলিই সই। সেদিন গ্রহচক্রে অফিসঘরে ছিলেন না পরিতোষ। ভেতর থেকে রিং হচ্ছে তো হচ্ছেই। করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন কমলেশ। দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফোনে কে ডাকছে। ঘরে ঢুকলেন তাড়াতাড়ি।···একটা কাগজে সব কিছু লিখে—কে করেছে, কেন করেছে, ক'টায় করেছে—টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন।

পরিতোষ এসে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন লেখককে। যারা কমলেশকে ঘরে ঢুকতে দেখেছে তারা প্রকাশ করেনি নতুন কুলির বরখাস্ত হয়ে যাবার ভয়ে। কে জানে—সায়েব অসন্তুষ্ট হয়েছেন হয়তো। স্বীকার করেছেন কমলেশ নিজেই—অফিসের ফোনে দরকারী কথাই আসে। ছেড়ে দিলে ক্ষতি হতে পারে—তা-ই গেছল। সত্যিই ক্ষতি হতে পারত—যেখান থেকে যে ব্যাপার নিয়ে ফোন এসেছিল।

পাশে বসিয়ে বিস্মিত চোখে দেখেছেন কমলেশকে পরিতোষ। জিজ্ঞেস করে জেনেছেন বাড়ির পরিচয়, তাঁর পরিচয়। বলেছেন, শিক্ষিত হয়ে কুলির কাজে কেন ? এটা সাজে না তোমার।

কুলির কাজই পাওয়া মুশকিল, অনেক ঘুরে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এরপর থেকে নজরে পড়েছেন সায়েবের। কুলি থেকে চার্জম্যান, তারপর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান। তারপর নিজের আদরের দুলালী মেয়ে রেখারাণীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দিলেন পরিতোষ ঘটা করে।

বিয়ের মাসকয়েক কাটতে না কাটতে কমলেশের জীবন বিষময় হয়ে উঠল স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে।

রেখারাণী শুধু অবাধ্যই নন, আরো অনেক বিশেষ বিশেষ গুণ তাঁর। স্বামী দু'চক্ষের বালাই। বাবার ক্রীতদাস। তাঁর মতই স্বামীর মত হওয়া চাই। স্বামীর মত শুনতে মানতে বাধ্য নন মোটে তিনি। স্বামীর অপছন্দটাই তিনি পছন্দ করেন বেশি। কমলেশের অনুপস্থিতিতে কলেজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে নাচে-গানে মেতে থাকবেন। কমলেশ এসে পড়লে, ভ্রূক্ষেপই করেন না। অনেক মানা করে করে হার মেনেছেন। অনুনয়-বিনয় করেও মন ভেজাতে পারেননি স্ত্রীর। বরং উগ্রচণ্ডী হয়ে উঠেছেন আরো রেখারাণী। রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেছেন, গুরুদেবকে আনিয়ে তোমায় শায়েস্তা করতে হবে, একেবারে মাথায় উঠে পড়ছ যে দেখছি।

আদুরে মেয়ের আত্মাভিমান বজায় রাখতে দেবীকিঙ্করকে আনিয়েছিলেন অপরাজিতা।

...নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে রেখেছিলেন কমলেশ নিজের অজান্তে। আর নয়। পালাবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে আশ্চর্যভাবে এসে গেল একদিন আচমকা। পরিতোষের শাশুড়ী মরণাপন্ন। মেয়ে-জামাই-নাতনীকে শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন। এলাহাবাদে যেতে হবে। কারখানায় কাজের চাপ ভয়ানক। কমলেশকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না। চলে গেলেন ওঁরা তিনজনেই। কমলেশের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। পালালেন আসানসোলে বাবার কাছে।

...বাবাকে চিঠি লিখতে ও কমলেশের খোঁজ করতে কসুর করেননি পরিতোষ। আছেন জেনে, ফিরে যাবার জন্য চিঠির পর চিঠি দিয়েছেন। চাকরী যাবার ভয়ও দেখিয়েছেন। কমলেশের একই উত্তর। পরোয়া নেই। স্ত্রী যদি শ্বশুরবাড়ি আসতে চায় আসবে। স্বামীর কথা মতন চলতে হবে। নইলে বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালো। কমলেশের কুষ্ঠিতে লেখা নেই কারো পরাধীন হয়ে জীবনযাপন করা।

কিছুদিন বাদে চিঠি-চাপাটির আদান-প্রদান একদম বন্ধ হয়ে গেল দু'তরফ থেকেই। অবিশ্যি প্রথম বন্ধ হলো পরিতোষের দিক থেকে। বন্ধের পর আর এক বিপত্তি দেখা দিল। যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন কমলেশ—প্রতিদিন বিকেল হলেই রেখারাণীর জন্য মন অস্থির হয়ে উঠত ভয়ানক। মনে হতো, সব ফেলে দিয়ে কাউকে না বলে-কয়ে চলে যান ফরিদাবাদে। রেখারাণীর এক একটা দোষ মনে মনে রোমন্থন করেছেন নিজেকে রুখবার জন্য। পারেননি। দিনের

পর দিন অসহ্য যন্ত্রণার ধারাল ছুরিতে ফালা ফালা হয়ে গেছে ভেতরটা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ট্রেন-লাইনে মাথা রেখে আত্মঘাতী হন।

পরিতোষের গুরুদেবের কাহিনী ছেলের মুখে শুনেছিলেন বাবা। বাবার বদ্ধমূল ধারণা, সেই সাধুই আগের মতন উচ্চাটন আকর্ষণ করছেন নিশ্চয় ছেলেকে। নিয়ে গেলেন জানাশোনা তন্ত্রসাধক বীরানন্দ মহারাজের কাছে! দেবীকিঙ্করের ক্রিয়াকলাপ কাটাতে হবে।

খানিক চোখ বুজে কি চিন্তা করে বীরানন্দ মহারাজ অভয় দিয়েছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে'খন। একথাও জানিয়েছেন, বাবার ধারণাই ঠিক। বলেছেন, আকর্ষণ-উচ্চাটন ক্রিয়াটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমন এখানে ঘটেছে। কোন বিপথগামীকে সৎপথে টেনে আনার জন্য আকর্ষণ প্রয়োজন। অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কোন নোংরা জায়গা থেকে যে-কোন লোককে স্থানচ্যুত করার জন্য 'উচ্চাটনে'র মূল্য অনেক। ভালো জায়গা থেকে উচ্ছেদ করাটা অন্যায়। আত্মতৃপ্তির জন্য যেখানে উচাটন-আকর্ষণ করা হয় সেখানে এটা পৈশাচিক ক্রিয়া। পৈশাচিক-ক্রিয়া যিনি করেন, তাঁর ভেতরে পৈশাচিক প্রবৃত্তি প্রবল। ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছুটে যায় দূরের মানুষের কাছে। সে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় যেখানে খুশি। কিন্তু মানুষটাকে খুশি করতে পারে না। সুখী করতেও না।

এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য কমলেশকে উপদেশ দিয়েছেন বীরানন্দ। বলেছেন, একাক্ষরী 'ক্রীং' বীজটা জপ করে করে মনের শক্তি বাড়াও। নিজের শক্তি বাড়লে, অন্য মনের ইচ্ছাশক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না কোনদিন। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বিফল হয়ে ফিরে যাবে। ফিরে যেতে বাধ্য হবে। দুর্বল আর সঙ্কীর্ণ মনের মানুষেরই বেশি ঝঞ্ঝাট বাধে। মন সবল আর বিশাল হয়ে উঠলে কোনরকমের মনই নাগাল পায় না সে-মনের।

বিশাল সবল করার মন্ত্র ক্রীং-বীজের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। ক+র+ঈ+ঁ=ক্রীং। 'ক' সৃষ্টির আদি কারণ মহাশক্তি, 'র' সর্বতোময়ী—মঙ্গলরূপে প্রকাশ সর্বত্র, 'ঈ' অভীষ্ট প্রদায়িনী 'ঁ' মুক্তিদানের অধিশ্বরী। সেই মহাশক্তি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের, প্রকাশ স্থিতি হচ্ছে সেই শক্তিতে। সেই শক্তিতেই মিশে গিয়ে মুক্তিও হচ্ছে আবার। নিজের সৃষ্টি নিজের স্থিতি নিজের মুক্তি দেখতে হবে জপের সময়। ক্রীং-বীজ ক্রমে ক্রমে বিরাট হয়ে গেল। আকাশ জুড়ে একটা মাত্র বিরাট জ্যোতির ক্রীং। আমি ওই ক্রীং

থেকে একটা ছোট্ট ক্রীং হয়ে বেরিয়ে এলুম। বিরাট ক্রীংয়ের বুকে ভাসছি। ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেলুম আবার বিরাট ক্রীংয়ে।

বীরানন্দের নির্দেশ মতন এইভাবে জপ-ধ্যান করে মানসিক যাতনা থেকে, রেখারাণীর কাছে ছুটে চলে যাবার ইচ্ছে থেকে মুক্তি পেয়েছেন কমলেশ। মুক্তি পেয়েছেন আত্মঘাতী হওয়ার মহাপাপ থেকে।

হোমের আগুন জ্বলছে। আগুনের শিখায় ওঠা-নামা করছে যেন এবার জ্বলন্ত ক্রীং-বীজ। রোজের মতন এসেছেন কমলেশ। রোজের মতনই বীরানন্দের সামনা-সামনি বসে হোমের আগুন দেখছেন আর জপ করছেন। দু'জনে চোখ বুজে বসে আছেন।

সন্ধ্যের মুখোমুখি। জপ শেষ হয়েছে সবে। আসন ছেড়ে, বীরানন্দ আর কমলেশ উঠতে যাচ্ছেন, কমলেশের বাবার সঙ্গে এসে হাজির হলেন পরিতোষ, অপরাজিতা আর রেখারাণী।

আমি অবাক হয়ে দেখছি। দেখছেন কমলেশও। অবাক হননি বীরানন্দ। তিনি বলেছিলেন কমলেশকে, ওরা আসবে—যেদিন জপ-ধ্যানে, সত্যি সত্যিই তোর মন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, বিশাল হয়ে উঠবে। তোর চুম্বক-মনের আকর্ষণে পরিবর্তন হয়ে আসবে। এসেছেন ওঁরা।

নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন ওঁরা কমলেশের কাছে। রেখারাণী নিজের ভুল বুঝেছেন। স্বামীর ঘর করার জন্য শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। শ্বশুর সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

শুনে, বীরানন্দের মুখে বিজয়ী বীরসাধকের হাসির ঢল নামল।
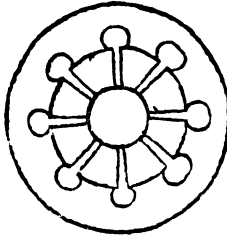
গভীর গর্তে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে নামিয়ে দেওয়া হলো। মুখটা পাটাতনে ঢেকে দিয়ে একরাশ মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হলো তার ওপর। এই মাটিতেই বাঘছালের আসন পেতে বসল সাধক। ডান হাতের আঙুলে সিঁদুর মাখানো রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরছে। জপ চলছে। নিচের লোকটা মরল কি বাঁচল—সাধুর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে কোন্ অজানা দেশে মন চলে গেল কে জানে। সাধু তন্ময় হয়ে গেল ধ্যানে। কার ধ্যান বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কিছু। হয়তো ওর নিজের ইষ্টদেবতার ধ্যান।

লোকে লোকারণ্য। নতুন ধরণের সাধনা দেখতে এসেছে সবাই, এসেছে সাধুকেও দেখতে। পাড়াঘরের সব বাড়িই একরকম ফাঁকা বললেই চলে। লাগোয়া বাড়িটারও একই অবস্থা। কাছাকাছি বলে, বিন্ধ্যাচলে উঠেছিল যারা, তারাও নেমে এসে জড়ো হয়েছে খবর শুনে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই কারো। লক্ষ্য শুধু সাধুর ওপর। মন-চোখ এক করে দেখছে সকলে। রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণ গুণছে অনেকে। সাধুর অমন ভাবে নির্বিকার চিত্তে বসে থাকাটা একটুও ভালো লাগছে না আর। নিচের লোকের জীবন্ত সমাধি হলো বুঝি। কি পৈশাচিক সাধনা।

পৈশাচিক সাধনাই ঘটে। বৃদ্ধ জানকীপ্রসাদ সেটা আঁচ করতে পেরেছে, তবে বাদ-প্রতিবাদ করছে না। দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছে। তার নিজের জায়গাতেই হচ্ছে এসব। এ-সবের পেছনে যে, একটা গূঢ় রহস্য ওত পেতে বসে রয়েছে অন্য একটা কার্যসিদ্ধি করবে বলে—এ সন্দেহের দানা বাঁধেনি মনের কোণে এতটুকু। কাণ্ডটা ঘটে গেল জানকীপ্রসাদের নিজের বাড়িতেই একেবারে অন্দর-মহলের দোতলায়। যেখানে পুত্রবধূ জয়াবতী একাই থাকে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে শীতের আমেজ। বেলেপাথরের বাড়িটায় রাতের বরফ-ঠাণ্ডা নামার তোড়জোড় চলছে। চিক-আঁটা বারান্দার থামে জুঁইলতা জড়িয়ে রয়েছে। বাগান থেকে শক্ত মোটা দড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে। নিজের

দলবলকে গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে, দালানের সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এলো মোহনচাঁদ। কেউ কোথাও নেই। যাকে ভেবেছিল দেখতে পাবেই, সে-ও নেই। সুবর্ণ সুযোগ। সিঁড়ির মুখোমুখি ঘরটাই দরকার তার। ওই ঘরে প্রবেশের বহুদিনের আশা। সে-আশা বুকে পুষে রেখেছিল এতদিন শকুনির মতন। আজ বিনা বাধায় সব কিছু ফল ফলবে তার। সুনিশ্চিত। এক তিল দেরী না করে—সুযোগ যখন পাওয়া গেছে—মেঘ না চাইতে জল—তড়িঘড়ি সেরে ফেলতে হবে কাজটা।

দরজা খোলাই রয়েছে। মনে মনে হাসল। এমনও ভাগ্য প্রসন্ন হয় তাহলে মানুষেরও! নিজেকে নিজের বাহবা দিতে ইচ্ছে করছে। সগর্বে প্রবেশ করল ঘরে। সুন্দর সাজানো। আলো-আঁধারিতেও চোখ-ধাঁধানো জেল্লা কম হয়নি। বরং আরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জিনিসগুলো যেন তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে মুখিয়েই আছে।

মোহনচাঁদ হাসল আবার।

এত আনন্দে এত ভরে যায়নি ভেতর এর আগে কখনো। তার দলবলকে বাগান থেকে ডেকে নিয়ে এসে দেখানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল। এ আনন্দ একার ভোগের নয়। মনের কথা মনেই রইল। বেরোতে পারল না ঘর থেকে জিনিসগুলো না নিয়ে। ও সমস্ত ডাকছে তাকে। ডেকেছে শয়নে-স্বপনে কতদিন। জেগে জেগেও পাগল করা আকর্ষণ অনুভব করেছে দারুণ।

যত কাছে এগোচ্ছে আকর্ষণটা বেড়ে উঠছে তত আরো। আরো—আরো—আরো।

আপাদমস্তক হীরে-জহরতের গয়নায় মোড়া কষ্টিপাথরের কালামূর্তির গয়না এক-একখানা করে খুলে নিতে শুরু করল। ঠাকুরের গয়নায় দৌলত আটকেছে বাড়ির মালিক। ক্ষয়-বয় নেই, চোখের নজর এড়াবে, লোভীদের লোভ থমকে যাবে। মালিকের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। প্রয়োজনে বা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের জন্যও বর্তমান-ভবিষ্যৎ বংশধরের কেউ ছোঁবে না ভয়ে-ময়ে।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল এবার মোহনচাঁদ।

নিরাভরণা হয়ে গেল কালীমূর্তি। এবার ছিন্নমস্তার পালা। শ্বেতপাথরের তৈরী প্রতিমা। এক এক করে সব গয়নার সঙ্গে মাথার হীরে-পান্না-মুক্তো-চুনী বসানো মুকুটটাও খোলা হয়ে গেল।

সত্যি সত্যিই আশাতীত ফল লাভ করল মোহনচাঁদ। দু'হাতে ঝোলা-

ভর্তি গয়না নিয়ে ঘর থেকে বেরোবে, কোণের দিকে তাকাতে কাজ বাড়ল আবার। আরো একটি প্রতিমা। কি মূর্তি বোঝা গেল না। মনে হচ্ছে এও শ্বেতপাথরের। গয়নায় ধাঁধানো সর্বাঙ্গ। কেবল মাথায় মুকুট নেই কালার মতন। এলোচুল। হাতের বালায় হাত ঠেকতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। ঠিকরে পড়ল দরজার দিকে। সারা শরীর চিন চিন করছে। অবশ হয়ে পড়ছে।

মনে হলো পাথরের মূর্তি নড়ে উঠল। মোহনচাঁদ বিস্মিত বিমূঢ়। নতুন অভিজ্ঞতা। দেবদেবীতে বিশ্বাস নেই। মানুষের ওপরেও নেই। লোককে সবস্বান্ত করার নেশা ছাড়া অন্য কোন নেশার ধারে-কাছে দিয়েও চলে না সে। তবুও এরকম দেখছে কেন? ভুল না ঠিক?

দু'চোখকে অবাক করে দিয়ে মূর্তি উঠে দাঁড়াল। হাতের গয়না খুলছে। একটার পর একটা খুলেই চলেছে। ওপর হাতের গলার নাকের কানের। সব খুলে জড়ো করে রাখল। সামনে আঙুলের ইশারায় তুলে নিতে বলল।

তুলবে কি—নিষ্পলকে দেখেই যাচ্ছে মোহনচাঁদ। স্থানকাল ভুলে গেছে। নিজে কে কি করতে—কেন এসেছে—একদম ভুলে গেছে।

সচেতন হলো, পূর্বস্মৃতি ফিরে পেল খুব পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। জয়াবতীর কণ্ঠস্বর। ডাকছে নাম ধরে।—মোহনজী জেবর উঠালো! ইয়ে দৌলত তুমহারী· ·মোহন! এ সমস্ত গয়নাই তোমার! কোন দ্বিধা-সংকোচ না করে উঠিয়ে নাও! আমি খুব খুশী হব এতে।

পাথরের মুখ দিয়ে কথা বেরলো। জয়াবতীর গলা, জয়াবতীর কথা।

কি দেখছে, কি ব্যাপার ঘটছে—বড় বড় চোখ করে দেখল মোহনচাঁদ। সাক্ষাৎ জয়াবতীই দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ পাথরের মূর্তি ভেবে মস্ত ভুল করেছিল। গয়নার জেল্লাই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে আসল দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল আহাম্মক বানানোর জন্য। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। এর কাছ থেকে কেউ বেরোতে পারে না। পারেনি। মোহনচাঁদ কি চোখের আড়াল হতে পারবে এর?

তোমার কোন ভয় নেই। এ গয়না ছুঁলে তোমার আর কিছু হবে না। আমি জানি তুমি আসবেই। অপেক্ষা করছিলুম। তোলা গয়নার বাক্সটাও তোমার জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছি। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জয়াবতী।

বাধা দিতে পারল না মোহনচাঁদ। ইচ্ছে করল না। আর তাছাড়া বাধা দেয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে সে। কে জানে লোকজন ডাকতে গেল

কিনা। বেপরোয়া মোহনচাঁদ বিপদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। সকলের সামনে অপমানের একশেষ হতে হবে।

যা ভেবেছিল, তা কিন্তু হলো না। লোকজন সঙ্গে নিয়ে নয়, একলাই এসে হাজির হলো জয়াবতী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। হাতে গয়না রাখার রূপোর বাক্স।—এটাও নাও তুমি। বাড়ির আঁতিপাঁতি খুঁজলেও এক টুকরো সোনার পাত খুঁজে পাবে না কোথাও। যেখানে যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে রেখে দিয়েছি এর ভেতর। জয়াবতী আর কিছু বলল না। গয়নার বাক্সটা মোহনচাঁদের সামনে রেখে দিল। যে কুশাসনের ওপর সাদা কম্বলের আসন পাতা ছিল—আগে বসেছিল যেখানে, সেখানেই পা মুড়ে বজ্রাসনে বসল। দু'চোখের শান্তসুন্দর দৃষ্টি মোহনচাঁদের মুখে আটকে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা।

তাকানোটা যত না, হাসিটা বড্ড বেশি অসহ্য লাগছে। জয়াবতীর সামনে বসে এই রকম হাসি হাসবে একদিন মোহনচাঁদ। জয়াবতীরও অসহ্য লাগবে। দাপাদাপি করে বেড়াবে গোটা বাড়িময়।

যে-বিদ্যা শিখেছে জয়াবতী, সে-বিদ্যা শিখতে হবে তাকে, যে-কোন প্রকারে। জয়াবতীর শরণাগত হতে হয়, তাও হবে। ওরই অস্ত্র দিয়ে মোক্ষম আঘাত হানতে হবে ওকে। মনে আছে, তবুও নতুন করে মনে পড়ছে রামশঙ্করের কথা, মনে পড়ছে সেদিনের সেই জয়াবতীর কথা। এমনিতেই প্রতিহিংসার আগুন ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেহের রক্তে। এখন সেই আগুনের হল্‌কা নিঃশ্বাসে বেরিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। কালী-ছিন্নমস্তার গয়নার ঝোলা দুটো সরিয়ে দিল জয়াবতীর দিকে। বাক্সটার দিক থেকে ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিল।

জয়াবতীর ঠোঁটের হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখময়।

সেই জয়াবতী!

যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না মুক্তানন্দের। দুশ্চিন্তা মাথার ভেতর কুরে কুরে খেতে লাগল আরো রামশঙ্কর আসতে।

প্রথম যখন রামশঙ্কর এসেছিল মুক্তানন্দ তখনি ফেরত পাঠাতে চেয়েছিল। ফিরে যেতে চায়নি রামশঙ্কর। শুকনো ফ্যাকাশে চোখে জলের ছোঁয়া লেগেছিল। হাড়-জিরজিরে মানুষটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছে, ওপারের দিকে তো পা বাড়িয়েই আছি। মরতে হয় এখানেই মরব।

যাকে বলে ধন্না দেয়া—সেই ভাবেই পড়ে থেকেছে দালানে দু'রাত দু'দিন।

বোশেখের শেষাশেষি। বাতাসে আগুন ছুটছে। প্রাণঘাতী 'লু' চলছে। এভাবে মানুষটাকে বাইরে ফেলে রাখা তো অমানুষিক ব্যাপার। লোকলজ্জার ভয়ে বাধ্য হয়েই মুক্তানন্দ ঘরে তুলেছে। বিধির লিখনের ওপর কলম চালাবে। চালানো যায় না বুঝি। অন্তত তা-ই মনে হয়েছে।

তান্ত্রিক চিকিৎসক বলে এ তল্লাটে মুক্তানন্দের নাম-ডাক খুব। দুরারোগ্য ব্যাধিও ভালো করেছে অনেকের। সেই জন্য ডাক্তার-বদ্যির জবাব দেয়া রুগী রামশঙ্কর এসেছে মুক্তানন্দের আশ্রয়ে। রামশঙ্করের জন্ম-ছক দেখে, বিপদের ছায়া নেমেছে মুখে। পাশে দাঁড়িয়েছিল জয়াবতী, চোখ তুলে তাকাতে পারেনি ওর মুখের দিকে। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করেছে। আলাদা ঘরে রামশঙ্করের চিকিৎসা চলল। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ। নিশ্ছিদ্র। চারপাইয়ের ওপরে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে রুগীকে শুইয়ে রাখা হলো। ভাপরা নেয়ার চিকিৎসা হবে। অর্থাৎ মাহেশ্বর ধূপের ধোঁয়া নিশ্বাসে টেনে নেবে রুগী। বিষম জ্বর—যে-জ্বর কারো বাগ না মেনে দিনের পর দিন রুগীর মাংস রক্ত সব শুষে নিয়েছে। এখন বাকি হাড় ক'খানা দাঁত দিয়ে কড়মড় করে চিবোতে বসেছে—এই ভয়ঙ্কর বিষম জ্বর পালাতে পথ পাবে না।

মুক্তানন্দকে সাহায্য করে রোজ জয়াবতী চিকিৎসার সময়। হোমের আগুন জেলে দেয় ঘরের ভেতর। সেই আগুনে মাটির সরায় মাহেশ্বর ধূপের উপকরণ হিঙ্গুল দেবদারু সরলকাঠ গোরুর সিং হাড় সাপের খোলশ হাতির দাঁত ময়ূরপুচ্ছ আরো কত কি গাওয়া ঘিয়ে ভাজতে থাকে একসঙ্গে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘরটা। গম্ভীর স্বরে মুক্তানন্দ মন্ত্র পাঠ করতে থাকে।—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায় ··

ধোঁয়া টেনে নিতে নিতে রামশঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে।

রামশঙ্কর সুস্থ হয়ে উঠল দিনকয়েকের মধ্যে। শেকড় গেড়ে বসেছিল যে-জ্বর নির্মূল হয়ে গেল একদম। তবে পঙ্গুত্ব সারল না। মুক্তানন্দ বলেই দিয়েছিল, সারবে না।

যারা দেখতে আসে, তাদের কাছে জয়াবতী আর মুক্তানন্দের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে রামশঙ্কর। এই সুখ্যাতিই অখ্যাতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখ থেকে মুখে, কান থেকে কানে। পাড়া প্রতিবেশী জাত বেরাদার একবাক্যে সকলে ছ্যা-ছ্যা করে উঠল প্রৌঢ় বিপত্নীক রামশঙ্করকে। ঘাটের মড়া বুড়ো লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছে একেবারে। জয়াবতীর জন্য অসুখের

ছুতো করে পড়ে আছে ওখানে সর্বক্ষণ। তা-ই না নয় বিয়ে-থা করে ঘরে নিয়ে আয়—তবু বংশের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে। সেধারে খেয়ালই নেই! শুনল রামশঙ্কর। মাথা নিচু করে বসে রইল। একটা নিষ্কলঙ্ক কুমারী মেয়ের জীবনে এ বিপর্যয় নেমে এলো তাকে নিয়ে। মুক্তানন্দ মহা ভাবনায় পড়ল। কালী আর ছিন্নমস্তার মূর্তির কাছে চোখ বুজে বসে থাকে। মনে মনে বলে, জ্ঞান হওয়া থেকে মেয়েটা তোদের ছাড়া কিছু জানে না, তার পরিণাম এই। জয়াবতীও শুনেছে। বাবার কাছে নিজের অপবাদ খণ্ডানোর পথ বাতলালো। রামশঙ্কর যদি রাজী হয়, সে-ও রাজী। মেয়ের কথা শুনে মুক্তানন্দ স্তম্ভিত। এ যে আত্মঘাতীর পথ বেছে নিয়েছে মেয়ে!

পাড়ার অনেক জোয়ানমদ্দই জয়াবতীর অপবাদে কাতর হয়ে এসেছে। স্ত্রীর সম্মান দিয়ে বিপদমুক্ত করতে চেয়েছে। এরা কেমন ধরনের জানতে আর বাকি নেই কারো। জয়াবতী জানে, জানে মুক্তানন্দও। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কারো না কারো সঙ্গে জয়াবতীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন করতে চেয়েছিল রামশঙ্কর, সুযোগ মিলল না। যা-ও বা পাওয়া গেল দু'একটা—জয়াবতী মুক্তানন্দ দু'জনেই রাজী নয়। শেষে দেখা গেল, সত্যিই গুণবানদের গুণে নুন দিতে নেই।

ধীরে ধীরে পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল যে রামশঙ্কর নিজের আর জয়াবতীর সম্মান রক্ষের জন্য পঙ্গুশরীরেও জয়াবতীকে কুলবধূ করে ঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য হলো। বর-কনে বিদায়ের পর জয়াবতীর জন্মকুণ্ডলীতে চোখ বুলিয়ে নিল একবার মুক্তানন্দ। ভবিতব্য। দু' চোখে জল ভরে উঠল। ওই স্বামী। ঠিক সময়েই এসেছে। ওর ছকে জয়াবতীর পতিস্থানের প্রকৃতি-চেহারা-রোগব্যাধির লক্ষণের সঙ্গে মিল দেখে চমকে উঠেছিল। তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, পারা গেল না। বৈধব্যযোগটা কাটিয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল মা মরা মেয়ের, তা আর হয়ে উঠল না কিছুতেই।

বাপের এ অবস্থায় বিয়ে করা দেখে মোহনচাঁদের ভেতরটা বাপের ওপর যেমন বিষিয়ে উঠেছিল, তেমনি জয়াবতীর ওপরও! মোহনচাঁদের ধারণা মৃত্যুপথের যাত্রীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিষয়ের লোভে বিয়ে করেছে জয়াবতী। ওর বাবা আরো সুযোগ করে দিয়েছে এ ব্যাপারে।

জয়াবতী বাড়ি ঢুকল, মোহনচাঁদ বেরিয়ে গেল। প্রতিশোধ নেবে জয়াবতীর ওপর। সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়ে ছাড়বে ওকে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ আর তলায় তলায় প্রস্তুতি চলতে লাগল। সাধুসন্তদের কাছে গোপনে যোগের পাঠ নিতে লাগল। প্রাণায়াম কুম্ভক—নিঃশ্বাস বেশিক্ষণ ধরে বন্ধ করে

রাখার অভ্যেস। মাটির তলায় থেকে এ অভ্যেস বহুবার করে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। সঙ্গীসাথী নিয়ে দল বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে এ জিনিস দেখিয়েছে। সকলের সম্মান কুড়িয়েছে যথেষ্ট।

নিজের পাড়ায় এসেছে। খবর পেয়েছে বাবা নেই। বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে চলে গেছে। মোহনচাঁদ জানত এরকমই হবে। ঠাকুর্দা জানকীপ্রসাদ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য পেড়াপীড়ি করল অনেক। ধনুকভাঙা পণ মোহনচাঁদের। জয়াবতী ও-বাড়ি থেকে না বেরোলে ঢুকবে না আর সে।

ক'দিন ধরে একই জায়গায় মাটির তলায় দম বন্ধ করে বসে থেকে তার যোগিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। ঠাকুর্দাকে বলেছে, সে বংশের গৌরব। কত বড় সাধক হয়ে ফিরছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তার চেলা বলে কম সাধক হয়নি। মোহনচাঁদ মাটির তলায় নেমে গেলে ওদেরই একজন পাটাতনে গর্তের মুখ ঢেকে তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিয়ে আসন পেতে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়। মিনিট দশেক বাদে পাটাতন সরিয়ে নিয়ে মোহনচাঁদকে তুলে নেয়া হয় ওপরে।

কিন্তু এবারে আর ওপরে উঠছে না মোহনচাঁদ। সকলে মিনিট গুণছে। দশ, বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, ষাট। একঘণ্টা কেটে গেল, তবুও না। প্রমাদ গণল দর্শকরা। মোহনচাঁদ মারা গেল নাকি! পাটাতন সরিয়ে দেখা গেল কেউ নেই। বাবা অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে ওপরের সাধুটি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বাড়িতে এসে মোহনচাঁদকে ঠাকুরঘরে দেখেছে ঠাকুর্দা। শুনেছে মোহন মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করেছিল এ বাড়ির বাগান অবধি। বাইরে ভিড় জমিয়ে ভেতরে এসে সর্বস্বান্ত করবে বলে। মুক্তানন্দ মারা যাওয়ার পর তার কালী-ছিন্নমস্তাকে এ বাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে জয়াবতী—এ খবর পেয়েছে। মূর্তি দু'টির গায়ে যত গয়না চাপানো হয়েছে তা-ও শুনেছে। এও শুনেছে, জয়াবতী সধবার বেশেই থাকে। আত্মার মৃত্যু নেই। রামশঙ্করের আত্মা চিরজীবি হয়েই আছে, চিরজীবী হয়েই থাকবে।

মোহনচাঁদের মনে হয়েছিল সব ভণ্ডামি : কথার জাল বিস্তার করে এ শুধু নিজের সুখবিলাসে ডুবে থাকা। কিন্তু এখন বুঝছে যা বুঝেছিল তা ভুল। ভুল ভেঙেছে জয়াবতীর গয়নায় হাত ঠেকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে। কি এই শক্তি?

জয়াবতীকে উদ্দেশ করেই বলল মোহনচাঁদ, গয়নাগাটির প্রত্যাশী নই আমি। কিছু চাই না। একটা জিনিস চাইলে দিতে পারবে?

সম্ভব হলে নিশ্চয় দেবো।

তোমার ওই বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চয়ের শিক্ষা।

বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চয়ের শিক্ষা দিয়েছিল জয়াবতী মোহনচাঁদকে। বাবার কাছে যে-ভাবে শিখেছিল, উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। কোনদিকে ফাঁক-ফাঁকি রাখেনি এতটুকু। বুঝিয়েছিল কালী আর ছিন্নমস্তার মূর্তি-তত্ত্ব। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে·। সব কিছুর উৎপত্তি আনন্দ থেকে, আনন্দে স্থিতি আবার আনন্দেই লয়। কালীসাধনা আনন্দসাধনার প্রধান রূপ। বিবেককে সদাসর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তারই প্রতীক চিহ্ন, দেবীর ওপরের বাঁ-হাতে শাণিত খড়্গ—জ্ঞানখড়্গ। জ্ঞানখড়্গের সাহায্যে কোন অন্যায়কেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলা হবে। তাই নিচের বাঁ-হাতে অন্যায়-অসুরের ছিন্নমুণ্ড ধরা রয়েছে দেবীর। অন্যায় দমন করতে পারলে পাওয়া যাবে শুভ-শক্তি—দেবীর অভয় আর বর। কালিকার ওপরের ডানহাতে অভয়মুদ্রা আব নিচের ডানহাতে বরমুদ্রা।

দেহের ভেতর বিরাট শুভ-শক্তিকে ধরে রাখতে গেলে, অনুভব করতে গেলে দেবীর গলায় পরা পঞ্চাশটি মুণ্ডের মালাকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। প্রতিটি মুণ্ড এক একটি জ্ঞান-বর্ণের আধার। স্বরবর্ণ 'অ' থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে পঞ্চাশটি বর্ণমালাই পঞ্চাশটি মুণ্ডমালা। মুণ্ডমালা-স্মরণ নিজেকে জ্ঞানময় করে তোলার সাধনা। জগতে সমস্ত বস্তু থেকেই সদ্‌জ্ঞান আহরণের সাধনা।

ভেতরে-বাইরে সত্যিকারের জ্ঞানময় হতে হলে, ইন্দ্রিয়-সংযম বিশেষ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান-বলশালী ইন্দ্রিয় লোভ, লোভের প্রতীক জিভ। দেবী দাঁতে জিভ কামড়ে ধরে ইঙ্গিত করছেন, লোভই সব ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা। লোভদমনে সব ইন্দ্রিয়ের দমন নিশ্চিত। ডানহাতই কর্মশক্তি। ন্যায়কর্মের উজান বেয়ে বেয়ে জ্ঞানরাজ্যের সবত্র অনাবিল মন নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব। দেবীর কটিদেশে ডানহাতে-গাঁথা মেখলা ঢাকা।

ইন্দ্রিয়বিজয়ী আর বিবেকের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি মানুষই একমাত্র ছিন্নমস্তা-সাধনার যোগ্য। • মদন-রতির মিলনদৃশ্যে কোন বিকার উপস্থিত হয় না মনে। ছিন্নমস্তার শ্বেতপদ্মের আসন পাতা মদন-রতির যুগল দেহেব ওপর। এখানে প্রবৃত্তি নেই, নিবৃত্তি নেই, আছে শুধু শ্রদ্ধা—অন্তহীন আনন্দ। দেবীর ছিন্নকণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে যক্তের ত্রিধারা। ডাইনে প্রবৃত্তি বাঁয়ে নিবৃত্তি—এ দুটো

ধারা স্পর্শ করছে না দেবীর অঙ্গ, পড়ছে না মুখের ভেতর। পড়ছে মধ্যিখানের ধারা মুখের ভেতর। আনন্দ।

আনন্দসাধনার সাধক আনন্দময় হয়ে ওঠে নিজে। তাকে পার্থিব কোন শোকদুঃখ ছুঁতে পারে না। কোন অভাব-অনটনের ব্যাকুলতা আর শত্রুদের নির্যাতন ধারে-কাছে ঘেঁষতেও ভয় পায়। তাকে দেখে চিরদুঃখী নিরানন্দ মানুষের ভেতরও আনন্দে ভরে যায়।

মোহনচাঁদের ভেতরে একটা আলোড়ন উঠেছে। আগেকার সব কিছু ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। হারিয়ে গেল প্রতিহিংসা জিদ অবুঝপনা। সমস্ত সত্তা জুড়ে জ্বল-জ্বল করে উঠেছে কালী আর ছিন্নমস্তার মূর্তি দুটি। মোহনচাঁদের মনে হলো তার অন্তরে বাইরে কালী, অন্তরে-বাইরে ছিন্নমস্তা। অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ দুলে দুলে উঠল বুকের তলায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে বেজে চলল —আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

শান্ত-সমাহিত হয়ে গেল মোহনচাঁদ।

জয়াবতীর সাধনা শেখানো সার্থক হয়েছে।

মোহনচাঁদ প্রকৃত সাধক হয়ে উঠেছে। উঠেছে আনন্দময় পুরুষ হয়ে জয়াবতী বলেছিল একদিন হাসতে হাসতে—এইটাই তোমার আসল জীবন। তোমার বাবার কাছে থেকে দেখেছিলুম তোমার গ্রহচক্র।

মোহনচাঁদ বলেছিল, ওর জন্য কিনা জানি না। তবে ঘরে যে আনন্দময়ী মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়েছে সে, তার জন্যেই যে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

জয়াবতী নেই। মোহনচাঁদকে দেখাল ঠাকুর্দা জানকীপ্রসাদ। পুজো করে বেরোচ্ছে তখন ঘর থেকে। ভোরের আলো পড়েছে ওর মুখে। একটি আনন্দলোকের দেবশিশু। ঘরের ভেতর লক্ষ্য পড়তে দেখলুম, দেখিয়ে দিল জানকীপ্রসাদই—জয়াবতীর ছবিতে জবার মালা দুলছে। মোহনচাঁদ সবেমাত্র পরিয়ে দিয়েছে।
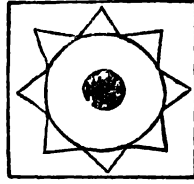
সাধনা।সিদ্ধ স্বচ্ছ মনের মানুষ পাওয়া দুষ্কর। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি খুঁজে বার করতে। অনেক ঘোরাঘুরি করে, অনেক নাকানি-চুবানি খেয়ে যে জায়গায় এলুম, যাঁর কাছে এলুম, তন্ত্রসাধনার ক্রিয়াকলাপ দেখামাত্র মন বিষিয়ে উঠল তাঁর ওপর। বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লুম।

বিন্ধ্যাচলের এ জায়গাটা বেশ নিজ্‌ঝুম। পঞ্চবটীর পাঁচটা গাছের একটারও ডালে কোন পাখিকে উড়ে এসে বসতে দেখিনি। আশ্চর্য লেগেছে। আশেপাশের গাছে, ডালে ডালে বসে দুলছে রঙবেরঙের পাখিরা। শুধু এখানটুকুই বাদ। পৌঁছবার আগে কাশ্যপশর্মার বিষয় নিয়ে বহু আলোচনাই শুনেছি পথে। ওঁর মনের জোর এত—পশুপক্ষীও বশে। গোলমাল হবে বলে, সাধনার জায়গায় আসে না।

পরিবেশ দেখে কথাটা সত্যি মনে হয়েছিল। কিন্তু ওঁর বীরচক্রের অনুষ্ঠান দেখে এতখানি আসার পণ্ডশ্রমে কাতর হয়ে পড়লুম আমি।

যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ—সব মিলিয়ে গোটা দশেক লোক। মাঝখানের আমলকী গাছটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ কম্বলের আসনে, কেউ কেউ হরিণছালের আসনে। প্রত্যেকের সামনে এক একটা সুধাপাত্র—মদভরা মালসা। দু'হাত দিয়ে মালসাটা তুলে ধরেছে মুখের কাছে এক একজন। ঠোঁটে ঠেকাচ্ছে। তারপর তরল বস্তুর যতটা পারছে, এক নিঃশ্বাসে জিভ দিয়ে শুষে নিচ্ছে। ওদের মুখের ভাব আর মালসার ওপর লোলুপ দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, ছাতি ফাটা তেষ্টাটা ওদের মেটেনি, বুকের খানিক ভিজেছে শুধু। ভেজার সঙ্গে সঙ্গে উবে গেছে বস্তুটা ভেতরে অঙ্গার জালিয়ে দিয়ে। এখন ভেতরটা কেবল জ্বলছে আর জ্বলছে। জ্বলুনি থামাতে জ্বলাবার বস্তুটাকেই গিলতে ইচ্ছে করছে আবার।

এদিক-ওদিক চাইছে ওরা। কাশ্যপশর্মা অন্যমনস্ক হলে, ওদের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরলে, আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখবে গিলে গিলে সবাই। পারলে মাটির মালসাটাও কড়-মড় করে দাঁতে চিবিয়ে উদরস্থ করে নিশ্চিন্ত হবে।

ওদের আশা পূরণ হলো না। কাশ্যপশর্মা চোখের ইশারায় মালসা নামিয়ে রাখতে বললেন প্রত্যেককে।

মুখের মালসা নামল নীচে—ওদের আসনের পাশে পাশে। বীরচক্রের উপাসকদের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে। লোভে বাধা পড়েছে বলে, চোখে ক্রোধের ছায়া। রক্তজবা চোখ সব। বন্যজগতের নৃশংস দৃষ্টি থেকে আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে আসছে। পঞ্চবটীর পাঁচটা গাছ—বট, নিম, শিউলি, বেল, আমলকী—একটারও অস্তিত্ব রাখবে না বুঝি মাটির বুকে। চোখের আগুনে ভস্ম করে ফেলবে এখুনি। পঞ্চবটীতলায় রক্তজবা গাছের বেড়া আর বেড়ায় জড়ানো কৃষ্ণ-অপরাজিতার চিহ্নও খুঁজে পেতে দেবে না ওরা অন্য কাউকে।

সাপের হাসি বেদেয় চেনে। ওদের দিকে চেয়ে দেখে আসন ছেড়ে উঠে এলেন কাছে কাশ্যপশর্মা। এবারে চোখে নয় হাতের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, বেলপাতার বোঁটা দিয়ে ভূর্জপত্রে আঁকতে। সকলের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক মেরে গেল। ওরা যেন এই নির্দেশটাই পেতে চেয়েছিল কাশ্যপশর্মার কাছ থেকে। চোখের রক্তজবা লালটা কাটছে ওদের। কাটল। নেশার ছোপ গোলাপীটা উপস্থিত যাবার নয়, থাকবে। রইল তা-ই।

যে যার আসনের তলা থেকে ভূর্জপত্র আর একখানা করে ফটো বার করল। মেয়েদের ফটো। অনেকেই তরুণী। প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাও দু'একজন রয়েছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বার করা ফটো নিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখছে। ঠোঁট নড়ছে ওদের। বিড়-বিড় করে কি যেন কি বলছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ওরা যেন ফটোর মানুষের সঙ্গে কথা কইছে প্রাণ ভরে। এইভাবে চলল খানিক। তারপর ফটো বুকে চেপে কি কান্না সবার। চোখের জল ঝরছে তো ঝরছে। থামবার নাম নেই।

অবাক কাণ্ড। অবাক হয়েই দেখছি আমি।

এবার কান্নার সঙ্গে হাসির ঢল নামছে ওদের মুখ জুড়ে। হয়তো অনুভব করছে ওরা ফটোর মানুষকে ফিরে পেয়েছে নিজেদের বুকে। এ সমস্ত ধারণা আমার। আসলে কি ঘটছে ওদের ভেতর, কি ঘটতে যাচ্ছে, বাইরে থেকে সঠিক বোঝা মুশকিল, স্রেফ আঁচ করা ছাড়া অন্য উপায়ই বা আর কি আছে এস্থলে।

দশটা লোক যেন একটা যন্ত্রমানুষ হয়ে গেছে। একসঙ্গে কাঁদছে, একসঙ্গে হাসছে। একসঙ্গে ভাবছে। সকলের কাছে এসে এসে কাশ্যপশর্মা ওদের

লাল চন্দন পরা কপালে ডানহাতের সব ক'টা আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে ফিরে এলেন নিজের আসনে। বসলেন। বেলগাছতলায় তাঁর আসন পাতা।

সচেতন হয়ে উঠল ওরা এক এক করে। সামনে ফটো রেখে, খুরির কুমকুমে বেলপাতার বোঁটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ফটোর মানুষের ছবি আঁকতে লাগল। ছবি আঁকা আর হলো না কারো। কতকগুলো করে রেখার আঁচড় পড়তে লাগল খালি ভূর্জপত্রে। বোধহয় রেখায় রেখায় ওদের ছবির মানুষ ফুটে উঠল। সকলে খুশী খুব। চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি ভাবল কে জানে। তবে এতে ওরা শান্ত-সমাহিত হয়ে গেল। এক জায়গায় দশটা লোক বসে আছে, মনে হচ্ছে না আর। ওদের নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

কাশ্যপশর্মা রহস্যলোকের রহস্যময় পুরুষ হয়ে উঠেছেন আমার চোখে। ওঁর ইন্দ্রজাল বিস্তারে উপাসকেরা নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। উনি যন্ত্রী হয়ে এদের যন্ত্র করে চালাচ্ছেন। চালান দুঃখু নেই, ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারলেই ভালো। কিন্তু ভালো করার কিছুই নজরে পড়ছে না। বরং সবনেশে পথে ঠেলে দিচ্ছেন এদের। মদের প্রতিক্রিয়ায় কত না বিপত্তি ঘটে সাধনরাজ্যে। উনি ওঁর-অনুগতদের মদ গিলতে দিচ্ছেন চক্রের মধ্যে। বারণ যদিও বা করছেন, মেয়েদের ছবি আঁকতে বলছেন। এ মেয়েরা কারা? চুপিচপি জিজ্ঞেস করেছি কাশ্যপশর্মাকে। উত্তর শুনে চমকে উঠেছি। এমন মানুষও পৃথিবীতে থাকে, যে শরণাগতদের বিপথে নিয়ে যায় সাধনার নামে, আত্মোন্নতির নামে।

বলেছেন কাশ্যপশর্মা, ফটোগুলো ওদের এক একজনের প্রেমিকা। অবিশ্যি এটা এক তরফের বক্তব্য, ওদের মুখের কথা। মেয়েরা এদের প্রেমিক ভাবে কি না কে জানে। মেয়েদের কেউ কেউ কুমারী, কেউ কেউ অন্যের ঘরণী। ওদের ধারণা কুমারীরা ওদের আশায় দিনক্ষণলগ্ন গুণে চলেছে শ্বাসে শ্বাসে। আর সধবারা প্রৌঢ়া হয়েও, বৃদ্ধা হয়েও এদের ছবি শয়নে-স্বপনে দেখছে। মৃত বাপ-মাকে ধিক্কার দিয়ে চলেছে পূর্বপ্রণয়ীর সঙ্গে পরিণয় সূত্র না বেঁধে দেওয়ায়। এ দুঃখের স্মৃতি ভুলতে পারে নি আজও নাকি তারা। ওদের ধারণা ভুল হোক, ঠিক হোক—আমার জানার দরকার নেই। ওরা যাতে শান্তি পায়, সেটা করাই প্রয়োজন আমার। মদে গলা ভেজানোর সঙ্গে সঙ্গে যে যাকে প্রেমিকা ভাবে, সে যেন তাকে ধ্যান করে। তার অঙ্গে অঙ্গে নিজের প্রতিটি অঙ্গ আর নিজের সর্বশরীরে তারই সর্বশরীর ভাবে যেন ওরা। এই নির্দেশ দেওয়া আছে ওদের।

কাশ্যপশর্মার হাড়জ্বালানো কথা শুনে বিরক্ত হয়ে উঠলুম আমি। কি

বিচ্ছিরি মনোভাবের লোক! এর আওতা থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। উঠি উঠি করেও উঠতেপারলুম না। ধরে বসিয়ে রাখলেন উনি আমায়। বললেন, এই তো সবে সন্ধ্যে। এখনও সারা রাত বাকি। এখুনি উঠে পড়লে চলবে কেন? সাধনার কথা শুনতে হবে এখন অনেক। জলজ্যান্ত কোন মেয়েকে বাঁ পাশে বসিয়ে চক্রসাধনা না করে শুধু চিন্তায়ও করা যায়! এটা গুপ্ত সাধনা গুরুমুখী।

গুরুমুখী গুপ্ত-সাধনার রহস্য শোনাতে শুরু করলেন কাশ্যপশর্মা।

তান্ত্রিক-সাধক বৃদ্ধ আদিত্যদেবের দু'পা জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছেন উষাদেবী। কাঁদছেন তো কাঁদছেনই। চোখের জলে পা ভিজছে আদিত্যদেবের। মনও ভিজছে। সহানুভূতিতে নরম হয়ে উঠছে। সংযমী সাধকেরচোখের কোণে জল টলমল করছে। মায়ায় না, দয়ায়। শান্তস্বরে বললেন, ছেলেকে নিয়ে এসো।

আসবে না বাবা সে। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, বংশের মানসম্ভ্রম খুইয়েও গেছলুম ইন্দুবাইয়ের কাছে। আসেনি। আসতে চায়নি।

মা হয়ে চোখের জলে বাঁধতে পারনি ছেলেকে?

চেষ্টার বাকী কিছু রাখিনি। মুখের দিকেই চায় না যে ছেলে, তার চোখের জলে নজর পড়বে কি করে?

আদিত্যদেব আর কোন প্রশ্ন করেননি উষাদেবীকে। উষাদেবীর সঙ্গে সটান চলে গেছেন ইন্দুবাইয়ের বাড়িতে। ইন্দুবাইয়ের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। প্রবেশ করেননি। চৌকাঠের এপার থেকেই ডেকেছেন কুনালকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতন উঠে এসেছে কুনাল। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছে ইন্দুবাই উষাদেবীর তান্ত্রিকগুরু আদিত্যদেবকে দেখে। ফরাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ইন্দুবাইকেও ডাকলেন আদিত্যদেব।

ইন্দুবাই কুনাল আর উষাদেবী—তিনজনকেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আদিত্যদেব আশ্রমে। তারপর কুণাল ইন্দুবাইকে বোঝালেন তন্ত্রসাধনার নিয়ম সম্বন্ধে। তন্ত্র কোন জাতি বিচার করেনি। সকলেরই সাধনা করার অধিকার আছে। স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে সাধনার কোন বাধা নেই। সাধনাচক্রে কুলনায়িকাদের পূজো করার নিয়ম রয়েছে। সব জাতের মেয়েরাই কুলনায়িকা হতে পারে। এটা নিরুত্তরতন্ত্রের কথা। অন্য তন্ত্রে নটী, রজকী, কপালী, চণ্ডালী, মালিনী, গোপিনী, কৈবর্তী, ব্রাহ্মণী, বেশ্যা—এই ন'টি কুলনায়িকা। তন্ত্র কত উদার—সমাজ যাদের ছোঁয় না, সমাজ যাদের ঘেন্না করে কলঙ্ক বলে, তাদেরও বুকে টেনে নিয়েছে। তাদের মধ্যে জগন্মাতারই

রূপ-বৈচিত্র্য দেখেছে। দেবীর আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তিনিও চান এইরকম পূর্বসূরীদের মতন ইন্দুবাইকে দেবীর পদে প্রতিষ্ঠা করে কুনালকে দিয়ে পূজো করাতে।

শুনে হতভম্ব হয়েছেন উষাদেবী। বাইজী বারবিলাসিনীর হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাতে শরণ নিয়ে এ কি হলো তাঁর! নিতান্তই পোড়া ভাগ্য! তা না হলে গুরু বিরূপ হলেন! ইন্দুবাইয়ের সঙ্গ না ছাড়িয়ে আরো মিলন করে দিলেন। এখানে সবই চলবে। মদ চলবে কুনালের। আর বাইজীকেও কাছে কাছে পাবে দিনরাত। বাইজীর পূজো তো করছিল এতদিন। এবারে ফুলচন্দন দিয়ে তার শ্রী[illegible] করবে।

কান্না চাপতে পারলেন না আর উষাদেবী। চোখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। চমকে ফিরে তাকালেন আদিত্যদেব। পিঠে হাত চাপড়ে বললেন, আবার কান্না কেন?

ভেজাগলায় বললেন উষাদেবী, এই আমার শেষ কান্না গুরুদেব। আর কাঁদব না। অন্য কেউ মারলে রামকে ডাকে লোকে। কিন্তু রাম যখন স্বয়ং মারে কাউকে, রক্ষে করার জন্যে সে আর কাকে ডাকবে? ভগবানের মার দুনিয়ার বার।

উষাদেবী কি উদ্দেশ্যে কি কথা বলছেন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি আদিত্যদেবের। সমস্ত বুঝেছেন। তবু তিনি নির্দয়ের মতন জোরে জোরে বলেছেন, ওদের দু'জনের প্রেম যাতে ভেঙে না যায় কখনও, যাতে অমর হয়ে থাকে চিরদিন—সেই চেষ্টাই করা কর্তব্য আমার।

কর্তব্য—একথা শোনার আগে উষাদেবীর মাথায় বাজ পড়ল না কেন আকাশ থেকে? উষাদেবীর মনে হলো, হৃৎপিণ্ডটাকে ভেতর থেকে টেনে বার করে নিজের মুঠোয় পুরে রেখেছেন আদিত্যদেব। শূন্য বুকে ফিরতে হবে তাঁকে। বিষণ্ণ-বিপন্ন মুখে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলেন উষাদেবী ধীর পায়ে। গুরুদেব ডাকলেন না তাঁকে। ফিরে তাকালেনও না চলাপথের দিকে। হো-হো করে হেসে উঠলেন আদিত্যদেব। হাসির লহর বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে তুলে ছুটে চলল উষাদেবীর পেছনে পেছনে।...

ইন্দুবাই আর কুনাল—আদিত্যদেবের ওপর দুজনেই খুব সন্তুষ্ট। এরকম লোক বুঝি দুনিয়ায় আর হয় না। দ্বিতীয়টি নেই আর। তাদের একসঙ্গে মেলামেশায় কোন ব্যাঘাত ঘটান না। নেশায় বিভোর হয়ে থাকলেও কিছু

বলেন না। কেবল চক্রে বসার সময়, মদের পাত্রটা মুখে তোলার আগে, বার বার কানের কাছে মুখ এনে যা বলেন, তা উভয়ের মঙ্গলের জন্য। দু'জনকে দু'জনের ঘনিষ্ঠ হবার জন্য, একাত্মা হবার জন্য। তিনি বলেন, চক্রের কুলনায়িকা ইন্দুবাইয়ের ধ্যানে কুনালকে এমনভাবে তন্ময় হয়ে যেতে হবে যে, কুনাল নিজেকে ভুলে ইন্দুবাইকেই দেখতে থাকে যেন তার মনে তার দেহে। ইন্দুবাইয়ের আঙুল তার আঙুল। ইন্দুবাইয়ের হাত তার হাত। ইন্দুবাইয়ের মুখ তার মুখ। তার দেহের প্রতিটি অংশই ইন্দুবাইয়ের অংশ। ইন্দুবাইও কুনালকে এইভাবে ধ্যানচক্ষে কাছে টানতে টানতে একেবারে নিজের আত্মাকে কুনালের আত্মায় মিলিয়ে দেয় যেন। অর্থাৎ নিজেকে কুনাল হয়ে যেতে হবে।

প্রস্তাব মন্দ নয়, উত্তম। প্রিয়জনকে কাছে পেতে চায় মানুষ, তার ভাবনায় ডুবে থাকতে চায়। নিজেই প্রিয়জন হয়ে যেতে চায়। আদিত্যদেবের প্রস্তাব-নির্দেশ শিরোধার্য করতে কোন দ্বিধাসংকোচ করেনি ইন্দুবাই, করেনি কুনাল। দিনের পর দিন আশ্রমে থেকেছে ওরা দু'জনে। ঘরে ফেরেনি। ফিরতে মন চায়নি। মগ্ন থেকেছে শুধু একজন অন্যজনের ধ্যানে। ধ্যান করতে বসেছে ওরা কখনও আদুর গায়ে, কখনও সেজেগুজে শাড়ি-ধুতি পরে। ওদের অভিরুচিতে হস্তক্ষেপ করেনি আদিত্যদেব কোনদিন।

মাসের পর মাস ঘুরছে। এক এক করে আসছে আর যাচ্ছে। ছ' মাস হলো আশ্রমে এসেছে কুনাল-ইন্দুবাই। এর মধ্যে ধ্যানের সঙ্গে ওদের মদের মাত্রাও কমিয়ে কমিয়ে বন্ধ করে এনেছেন প্রায় আদিত্যদেব মদ যে কি ভীষণ জিনিস, কি না অনর্থ ঘটায়—এসব মন্ত্রপড়ার মতন কানে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে অন্তরে বিঁধে রাখার জন্য বলেছেন রোজ সকাল সন্ধ্যেয়—মদ খেতে গেলে, অভিশাপের কথাও মনে রাখতে হবে। ভুললে চলবে না। শুক্রাচার্য মদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। বারণ করেছেন সকলকে খেতে। মদের নেশায় এমনি বুদ্ধিবিবেক হারিয়ে গেছল তাঁর যে, শিষ্য কচের মাংস খাওয়ানো সত্ত্বেও, কার মাংস তিনি বুঝতে পারেননি। ব্রহ্মা মদে মত্ত হয়ে নিজের কন্যাকে স্ত্রী ভেবে বসেছিলেন। তিনিও অভিশাপ দিয়েছেন। মদে মতিভ্রমের কারণ দেখিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন অন্যকে। আর শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দিয়ে সুরার ধারে কাছে ঘেঁষতে মানা করেছেন প্রত্যেককে। সুরার আসুরিক শক্তি যদুবংশকে ধ্বংস করেছিল।

মদ ছেড়েছে ইন্দুবাই, ছেড়েছে কুনাল। আদিত্যদেবের সৎ-ইচ্ছের প্রবল, প্রভাব ওদের মনে বিস্তার করেছে। আদিত্যদেব খুশি। পূর্ণিমার নিশিতে

ডাকলেন ওদের দু'জনকে কাছে। এই পঞ্চবটীতলায় বেলগাছটার নীচে একটা কম্বলের আসনে বসলেন তিনি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে কোন দেবতা যেন বসে আছেন। ঘাড় অবধি রূপোলী চুল। ফুরফুরে হাওয়ায় কপালের কুচোকুচো চুল উড়ছে এদিক-ওদিকে। সাদা-গরদের ধুতি পরনে। গরদের চাদরটা কোলের ওপর দু'পাট করা। আদিত্যদেব বসে আছেন। ধীরস্থির। শান্ত গলায় কুনালকে ডানপাশের আসনে বসতে বললেন। বাঁদিকের আসনে বসতে বললেন ইন্দুবাইকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কুনালকে—ইন্দুবাইকে কেমন দেখছ? ওর সঙ্গে যাবে?

আদিত্যদেবের প্রশ্নের অর্থ কিছু বুঝতে পারছে না কুনাল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে মুখের দিকে।

আমার মুখের দিকে তাকালে কি হবে? বাঁদিকে—বাঁদিকে। এই মুখখানা ভালো করে দেখ।

দেখেছে কুনাল। চোখাচোখি হয়েছে দুজনের। ইন্দুবাইও দেখেছে কুনালকে। এ দেখাদেখি মুহূর্তের। তারপর দুজনেই চোখ বুজে আত্মস্থ হয়েছে। নিজের ভেতরে ভেতরে দেখেছে একজন অন্যজনকে। দেখেছে শুধু নয়, পেয়েছেও তাকে। পেয়েছে নিজের রক্ত-মজ্জায় শিরা-উপশিরায় নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। জীবন থাকতে এ পাওয়ার মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ নেই। এ পাওয়ায় আছে শান্তি। পরম শান্তি। নেই কেবল কামনা-বাসনা—আত্মসুখ চরিতার্থ করার দুর্বার লিপ্সা।

উষাদেবীকে ডেকে এনে দেখিয়েছেন আদিত্যদেব ধ্যানমগ্ন দু'টি সাধক-সাধিকাকে। দেখেছেন উষাদেবী আনন্দময় পুরুষ গুরুদেবের দু'পাশে দু'টি নিখাদ সোনার মূর্তি। মূর্তি দু'টির মুখ থেকে শান্তস্নিগ্ধ শুভ্রজ্যোতি বেরুচ্ছে ঠিকরে ঠিকরে চতুর্দিকে। হো-হো করে হেসে উঠলেন আদিত্যদেব। উষাদেবীর কানে মধুর আওয়াজ ভেসে আসছে এ হাসির তরঙ্গে। উষাদেবী মনে মনে প্রার্থনা করছেন, এ হাসির তরঙ্গ না মিলিয়ে যায় কখনও আকাশ থেকে বাতাস থেকে পৃথিবীর মাটি থেকে।

মানুষকে বিপথ থেকে টেনে তোলার তন্ত্রসাধনা শোনালেন আমাকে কাশ্যপশর্মা। শোনালেন গুরুমুখী সাধনার গুপ্ত রহস্য। অবাকও করে দিলেন আমায় নিজের পূর্বপরিচয় দিয়ে। তিনিই কুনাল। গুরুদত্ত নাম কাশ্যপশর্মা। আদিত্যদেবই তাঁর গুরুদেব। এ জীবনের স্রষ্টা—পথপ্রদর্শক। ইন্দুবাইকেও গড়ে তুলেছেন তিনি দেবী করে। মেয়েদের আশ্রমের মা আজ সে।

এবার বীরচক্রের উপাসকদের ওপর দু'চোখ চক্কর দিয়ে এলো কাশ্যপশর্মার। ওরা এখনও একইভাবে বসে আছে। কাশ্যপশর্মা হাসতে হাসতে বললেন, মদ খাওয়ার মুখে যে মনোভাব তৈরী করে দেওয়া হবে বুঝিয়ে, সেই মনোভাবই খাওয়ার পর কাজ করে যাবে অনায়াসে। মদ খাওয়ার সময় এদের মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রেমিকাদের চিন্তা করতে করতে এরা যেন নিজের নিজের প্রেমিকা হয়ে যায় একজন।

একটু থেমে কি যেন কি ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, প্রেমিক যদি মনে মনে প্রেমিকাই হয়ে যায়, বাইরের প্রেমিকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তার। আর প্রেমিকাও যদি ধ্যানে প্রেমিকের স্বরূপ পায়, তাহলে তারই বা প্রেমিকের প্রয়োজন আর কোথায়? এ সাধনা মানুষকে সংযমী করে তোলে। চক্রের উপাসকরা ধীরে ধীরে জিতেন্দ্রিয় হয়ে উঠবে। ধ্যানে ধ্যানে নেশা করার খেয়াল থাকবে না। সময় উতরে যাবে! এইভাবেই একদম নেশা ছাড়বে। দৃষ্টি হয়ে উঠবে অন্তর্মুখী।
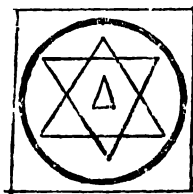
রাজস্থানে এসে শুনেছি আমি সনচরীর কথা। বলেছে সুমন্তদেও। জালোর পাহাড়টার ধার ঘেঁষে চলতে চলতে আদ্যোপান্ত বলেছে। পাহাড়ে খোদাই সনচরীর নামটার দিকে তাকিয়েছে থেকে থেকে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে।

এখানকার সবার ধারণা সনচরী তন্ত্রসাধিকা নয়, জাদুকরী। কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। সুমন্তদেওয়ের কাছে কিন্তু ও প্রকৃত তন্ত্রসাধিকা। বাইরের লোকে ওকে কেউ বুঝতে পারেনি। ওর আসল পরিচয় জানতে পারেনি। বাপ-ঠাকুর্দার মুখেও সুমন্তদেও শুনেছে একথা। মাঝে মাঝে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেত সনচরী। নির্জনে শক্তি-সঞ্চয়ের সাধনা করে ফিরে আসত আবার সকলের সুমুখে। সময় সময় আসতেন এক তান্ত্রিক সাধু। তিনি এলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যেত সনচরী। এই নিরুদ্দেশের মেয়াদ কাটলেই, যে দড়ির খেলা দেখাত সে, প্রতিবারেই আগের চেয়ে নতুন। আগের খেলাকে ম্লান করে দিত। পাহাড়ের তলা থেকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে খেলা

দেখতে লোকেরা। রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণ গুণত পাহাড়ের এদিকের চুড়ো থেকে ওদিকের চুড়ো অবধি দড়ির ওপর পা ফেলে ফেলে চলার সময়। সনচরীর শরীরটা যেন পালকের মতন হালকা হয়ে উঠত তখন। হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াত ও দড়ির ওপর দু'পায়ের আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে।

এটা কি সত্যি না জাদুর মায়া? জিজ্ঞেস করলে, সনচরী মৃদু হেসে উত্তর দিত—সমস্তটাই সত্যি। দড়ি বাঁধাটা যেমন সত্যি, তেমনি দড়ির ওপর ওভাবে চলাটাও সত্যি। দেহটাকে হালকা করে নিই নিঃশ্বাস টেনে, নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে। জীবন নিয়ে তো খেলা। এতটুকু ফাঁক-ফাঁকি থাকলে [illegible] রক্ষে নেই। দিনের পর দিন রীতিমত অভ্যেস করতে হয়েছে গুরুদেবের সামনে বসে। অসাক্ষাতেও করতে হয়েছে তাঁর নির্দেশে। তিনি বলেন, এটা যোগ স্রেফ। তন্ত্রসাধনারই একটা প্রধান অঙ্গ।

এই যোগের খেলা যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে দেখাতে নিষেধ করেছেন গুরুদেব—এসব জানাতেও কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ করেনি সনচরী।

সবাইকে সব জানালে কি হবে—গুরুদেবের নিষেধ মেনে চলতে পারেনি ও প্রকৃত। তার অনিবার্য ফল যা হবার তা হয়েছিল। মহারাজার সপ্রশংস-দৃষ্টির আকর্ষণ আর জনসাধারণের কাছ থেকে 'বাহবা' কুড়োবার প্রলোভন এত পেয়ে বসেছিল ওকে যে, এ দুটো দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেনি, ফিরিয়ে রাখতে চায়নি।

মহারাজার নজর থেকে সনচরীকে সরাতে চেয়েছিল মন্ত্রী। মন্ত্রীর অনুচররা খেলা দেখানোর সময় দড়ি কেটে দিয়েছিল গোপনে। সনচরী তখন দড়ির মাঝ-বরাবর এসে গেছে। চোখের পলকে শূন্য থেকে একটা শুচিশুভ্র ফুল খসে পড়ে গেল যেন পাহাড়ের বুকে। বাতাস ওর প্রাণটাকে শুষে নিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের পাষাণ-বুক মহারাজার লেখানো নামটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে আজও।

সনচরীর মতন বীরাবাঈয়ের নামটাকে কি ধরে রেখেছে এইভাবে কোন জায়গার মাটি, কোন জায়গার পাহাড়? না, মাটি-পাহাড় ধরে রাখেনি বটে, একটা আশা ধরে রেখেছে সযত্নে। বীরাবাঈয়ের প্রাণভরা আশা! মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার, মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলার।

তন্ত্রসাধিকা বীরাবাঈ। নানা দেশ ঘুরে, বহু সাধুসন্তের কাছে ধন্না দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন উনি। বিদুষী বীরাবাঈ অনেক জেনেছেন বলেই হয়তো আজ মৌন হতে পেরেছেন। নিরালায় একা

বসে বসে কি চিন্তা করেন তিনি, তা তিনিই জানেন। নিজেকে নিয়ে কি এত আনন্দ পান তিনি, তা তিনিই জানেন।

দূরে এদিকে-ওদিকে ছড়ানো বাবলা আর ফণীমনসার গাছগুলো দেখা যাচ্ছে। গাছগুলোর ওপাশে বেলেপাথরের দোতলা বাড়িটাও। ওই বাড়িটাই বীরাবাঈয়ের। সুমন্তদেও ওই বাড়িটায় নিয়ে যাচ্ছে আমায়। সুমন্তদেও শক্তসমর্থ জওয়ানের মতনই চলছে। চলার ক্লান্তি নেই মুখে চোখে। তবে হাসির রেখাও নেই ঠোঁটের ফাঁকে। মুখখানা গম্ভীর গম্ভীর। কিন্তু চোখ দুটো বড্ড করুণ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা মাথা কুটে মরা গোমড়ানো ব্যথাকে চাপতে চেষ্টা করছে ভেতরে প্রাণপণ। বাড়িটার দরজায় এসে সুমন্তদেও দাঁড়িয়েছে একটু। চতুর্দিকে তাকিয়েছে। একবার নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত বাড়িটার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়েও নিয়েছে। কেউ কোথাও নেই। না নীচে, না ওপরের জানালা বারান্দায়। একখানা মুখও উঁকি মারল না কোনদিক থেকে। তাজ্জব ব্যাপার। জনপ্রাণীশূন্য বাড়িতে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করল সুমন্তদেও। ওপরে উঠছি আমরা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা পড়ছে দুজনের মনে হচ্ছে চারজনের পা পড়ছে বুঝি। সুমন্তদেও কথা কইতে শুরু করেছে। ওর গলার আওয়াজটা যেন দুটো মানুষের জোরালো গলার আওয়াজ হয়ে বাজছে আমার কানে। নিস্তব্ধ ফাঁকা বাড়িটায় খালি প্রতিধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। নিজের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দটারও প্রতিধ্বনি শুনছি আমি।

এইভাবে এলুম আমরা দোতলার বারান্দায়। পশ্চিমকোণের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল সুমন্তদেও। দরজা বন্ধ। শেকল দেওয়া। শেকল খুলে ভেতরে ঢুকল। ইশারায় ডাকল আমায়। ভেতরে গিয়ে থাকতে পারিনি আমি বেশিক্ষণ। পুরনো বইপুঁথিতে বোঝাই ঘরটা। পুরনো বইয়ের গন্ধে গন্ধে বাতাস ভারী।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে হালকা বাতাস টেনে নিলুম বুক ভরে। সুমন্তদেও বেরিয়ে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। বলল এই ঘরটায় কুমারসিং থাকত। বীরাবাঈয়ের স্বামী। পুঁথি বইপত্তর সব তারই সংগ্রহ করা। নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য শক্তির আরাধনায় নেমেছিল সে। তার সাধনা ছিল বড় বীভৎস। গেলাস গেলাস রক্ত গেলার সাধনা। তার মতে রক্তই প্রাণ। রক্ত না থাকলে প্রাণ থাকে না। কাজে কাজেই বলির রক্ত শরীরে গেলে শরীর তো শক্তি ফিরে পাবেই, তাছাড়া প্রাণ ফিরে পাবে নতুন করে পরমায়ু আবার।

উত্তর দিকের ঘরের উত্তরের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখাল আমায় সুমন্তদেও। ওখানে কতককলো ভাঙা পাথর পড়ে রয়েছে। শুনলুম, ওখানেই এক সময় একটা ঘর ছিল। কুমারসিংয়ের সাধনার ঘর। ওই ঘরের ভেতর নৃশংস কাণ্ড ঘটেছে। ঘরটা একটা নিদারুণ স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক চোখের সামনে এটা আর চাননি বীরাবাঈ।

এরকম সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না বীরাবাঈ। সাধনার ঘরে এসেছেন তিনি বহুবার। ক্রিয়াকলাপ দেখে তৃপ্তি পাননি একদিনের জন্য। অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে গেছেন কেবল। কুমারসিং তাঁর সঙ্গে সাধনায় বসতে বলেছেন ওঁকে। অনেক অনুরোধও করেছেন। বীরাবাঈয়ের ভেতর থেকে সায় দেয়নি বসতে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপেছে শুধু। মোষ বলির রক্তে গলা ভেজাতে দেখেছেন কুমারসিংকে। দেখেছেন কুমারসিংয়ের সাঙ্গোপাঙ্গদের একই পথ অবলম্বন করতে। এছাড়া ছু'চোখ বুজে আরো কিছু দেখেছেন তিনি। ঘরখানা রক্তে ভাসছে। সকলে হাবুডুবু খাচ্ছে তাতে। তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। রক্তের বন্যা বয়নি ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারেননি তবু একদণ্ড। লোকগুলো যেন পশু হয়ে গেছে। ছু' কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে ওদের। রক্তের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা। আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই···

ছু'কানে হাত চাপা দিয়ে, ছুটে পালিয়ে বেঁচেছেন বীরাবাঈ।

বাড়িতে এসে কেবল ভেবেছেন আর ভেবেছেন। এ কি সর্বনেশে সাধনা! তাঁর একটা কথায় স্বামীর এ কি পরিবর্তন। একদিনের রুগ্ন ক্ষণজীবি স্বামী সুস্থ-সবল হয়েছে। কমজোরি মন জোরালো হয়ে উঠেছে। ভীতু মানুষটা নির্ভীক হয়েছে।. একটার পর একটা মোষের বাচ্চার ঘাড়ে ধারালো খাঁড়ার কোপ বসাতে হাত কাঁপে না। তবুও আগের লোকটা নেই, আগের মনও নেই। এ যেন একটা ভয়ঙ্কর জগতের ভয়ঙ্কর লোক। প্রচণ্ড রাগী উদ্ধত প্রকৃতির। সেই মানুষ আর এই মানুষ!

সে-রাতে এই বাড়িতেই বীরাবাঈয়ের বোনঝি আর ভগ্নীপতি। মোতিবাঈ আর তার বাবা। মোতিবাঈয়ের বয়েস তখন বছর আট্টেকের। মা-মরা মেয়েকে মাসির কাছে বেড়াতে নিয়ে আসত বাবা প্রায়ই। সেবারে কিন্তু বেড়াতে আসেনি ওরা। এসেছে ডাকাতদের ভয়ে পালিয়ে। গ্রামের কোন বাড়িটাই রেহাই পাচ্ছে না ডাকাতির হাত থেকে। পালা করে এক এক বাড়ির ওপর এক এক রাতে উপদ্রব চলছে। লুটপাট তো চলছেই, তাছাড়া

কেউ বাধা দিলে, তার জীবন নিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না অনাহুত অবাঞ্ছিতের দল।

এবারে মোতিবাঈদের পালা। মেয়েকে নিয়ে বাবা পালিয়ে এসেছে তা-ই। সঙ্গে গয়নাগাঁটি টাকাকড়িও এনেছে, যতটা পেরেছে। ডাকাতরা তাদের শিকার ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। চোখের পাহারায় রেখেছিল ওদের। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল—পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়েছে। ওদের দলের বাচ্চা ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল—বাড়ি দেখে এসেছে সে।

বন্দুক ছোরা তলোয়ার মশাল নিয়ে নিশুতি রাতে ঘিরে ফেলেছিল বাড়িটাকে ডাকাতের দল। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। একতলা দোতলা মায় মাটির তলায়—তয়খানা অবধি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কোথায় কি আছে, কোথায় কে লুকিয়ে আছে। বাড়ির একটা জিনিস স্পর্শ করেনি ওরা। স্পর্শ করতে আসেওনি। এসেছে আক্রোশ মেটাতে। বাপ-মেয়ে ওদের চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করেছে বলে। তয়খানা থেকে বাপ-মেয়েকে টেনে তুলে নিয়ে এসেছে একতলায়। তারপর উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড় করিয়েছে দুজনকে। মোতিবাঈকে নিরাভরণা করেছে একেবারে। নাক-কান ছিঁড়ে রক্ত ঝরিয়ে সামান্য সোনাটুকুও নিতে ছাড়েনি। বাধা দিতে পেছপাও হয়নি বাবা। বাধা দিতে এসে নিষ্ঠুর জবাব পেয়েছে ভোজালির ঘায়ে ঘায়ে। বীরাবাঈও এসেছিলেন বাধা দিতে। যমদূতের মতন দু'জন দু'পাশ থেকে তাঁর দু'হাতের কব্জি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছিল। সামনের দিকে এগোতে দেয়নি। কুমারসিং এসেছিলেন। কিছু করতে পারেননি তিনি। এমনিতেই দুর্বল মনের মানুষ তিনি। রক্ত দেখলে মাথা ঝিমঝিম করে। বাপের রক্তের স্রোতে পড়ে মেয়েটাকে আছাড়িপাছাড়ি করতে দেখে অন্ধকার দেখলেন কুমারসিং। ধড়াস করে পড়ে গেলেন। বেহুঁশ।

ভগ্নীপতির নির্মম মৃত্যু দেখেছেন স্বচক্ষে বীরাবাঈ। জ্ঞান হারাননি। দাঁতে দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্তারক্তি করেছেন নিজে। সেই অবস্থাতেই মনে হয়েছে তাঁর, ভগ্নীপতি পুরুষ, পুরুষ, পুরুষের মতনই মরেছে বাধা দিতে দিতে। কিন্তু একি! তাঁর স্বামী?

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন পরে বীরাবাঈ কুমারসিংয়ের কাছে। একথাও বলেছেন, রাজপুতকে রাজপুতের মতন বাঁচতে হবে। মরার সমান হয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। রক্ত নিতে হবে, দিতে হবে। দরকার হলে

বীরের মতন মরতেও হবে। রাজপুতের রক্তের ভয়, মৃত্যুভয় একদম থাকা উচিত নয়।

কথাগুলো মন্ত্রের মতন কাজ করেছিল। তাড়াতাড়ি বীরাবাঈয়ের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে ছলেন কুমারসিং। অস্থিরতার শেষ হলো তাঁর একদিন। নিজের মনের শক্তি বাড়াবার জন্য অনেক রকম সাধনার অনেক রকম বই দেখতে শুরু করেছিলেন। দেখতে দেখতে একখানা তন্ত্রের বই হাতে পড়তে যেন আকাশে ঘনঘটায় বিদ্যুতের চমক দেখলেন। পথ পেলেন তিনি। শক্তিসাধক হবেন। এ সাধনায় সব ক'টা আশা তাঁর পূর্ণ হবে।

এরপর এক এক করে তন্ত্রসাধনার বই-পুঁথি সংগ্রহ চলল। বই দেখে, পুঁথি দেখেই প্রথম সাধনা আরম্ভ করেছিলেন কুমারসিং। শেষ পর্যন্ত সেটাই বজায় রেখে গেছলেন। কোন গুরু করেননি। কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কোন মতই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। শাস্ত্রশ্লোকের ব্যাখ্যা নিজে যা বুঝেছেন, সেইমতন ক্রিয়াকলাপ করে গেছেন। যখন সুমন্তদেও এ বাড়িতে এসেছে তার দিদি বীরাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে, জামাইবাবুর ঘরে ঢুকেছে। যে রুদ্রযামল বইটার ভক্ত বেশী জামাইবাবু, সেইটা নিয়েই সামনে বসে বসে পড়েছে—গুরুং বিনা যন্ত্র মূঢ় পুস্তকাদি বিলোকনাৎ, জপবদ্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি। গুরু ছাড়া বই পড়ে ক্রিয়াকলাপ পণ্ডশ্রম। হিতে বিপরীত হতে পারে শ্লোকের ভেতরের তত্ত্ব না বুঝে ক্রিয়াকলাপ না করলে।

কে কার কথা শোনে? কোন কথাই কানে নিতেন না কুমারসিং। নিজের জিদে ছিলেন তিনি অচল-অটল। এটার যুক্তি ছিল তাঁর—যা করে ফল পেয়েছি, মনের ভয় গেছে, দেহের শক্তি বেড়েছে—তাই করে যাব সারাজীবন। করাবার চেষ্টাও করব দুর্বলদের।

যা বলেছিলেন, করেও ছিলেন কুমারসিং। একজন একজন করে পাঁচজন দুর্বল ছেলেকে নিজের সাধনা শিখিয়েছিলেন তিনি কাছে বসিয়ে। মোতিবাঈকেও বাদ দেননি। জওয়ানদের এক একটার শরীর ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠেছিল। বয়সের তুলনায় মোতিবাঈও দ্বিগুণ শক্তি লাভ করেছিল। খাঁড়া হাতে নিলে বলির রক্তে স্নান করলে আনন্দের সীমা-পরিসীমা আর থাকত না তার। বলির পর রক্ত নিয়ে হোলি খেলা চলত যেন দেবীঘটের সামনে সকলের।

এ উন্মত্ত উল্লাসের কত দিনে শেষ—চিন্তা করে করে কূল-কিনারা খুঁজে পান নি বীরাবাঈ। এটা যে ভালো নয় বেশ বুঝতে পারছেন। ভীষণ অস্বস্তি ভেতরে। প্রতিকারের পথ পাচ্ছেন না।

প্রতিকারের পথ পাবার আগেই সমস্ত ভাবনাচিন্তার অবসান হয়ে গেল তাঁর হঠাৎ।

বলি-শেষের পরের ঘটনা সেটা। তখন কুমারসিং শোবার ঘরে। ক'দিন ধরে একজ্বরী, শুয়ে আছেন চার-পাইয়ে। শিয়রে কুরসির ওপর বসে আছেন বীরাবাঈ। বলির বাজনা থামার পর মোতিবাঈয়ের আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন বিছানা থেকে কুমারসিং। পড়ি-মরি করে দৌড়লেন। দৌড়লেন বীরাবাঈও।...এলেন বাইরে—ঠাকুরঘরে। যে দৃশ্য দেখলেন, দু'জনেরই মাথায় রক্ত ফুটে উঠল টগবগ করে। সবারই ঠোঁট দুটো বলির রক্তে মাখামাখি। মোতিবাঈয়েরও। কুমারসিংয়ের অতি প্রিয় পাঁচটা জওয়ান-মরদ চেলাই মেয়েটাকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে রয়েছে। ওদের কবল থেকে পালিয়ে আসার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মেয়েটা। হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি ধস্তাধস্তি—কোন কিছুতেই ফল হচ্ছে না। বজ্রগম্ভীর স্বরে কুমারসিং আদেশ করলেন সকলকে—মোতিবাঈকে ছেড়ে দাও বলছি এখুনি!

কুমারসিংয়ের কথায় কর্ণপাত করল না কেউ। গতিক সুবিধের নয় দেখে কালবিলম্ব না করে, ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুমারসিং মোতিবাঈকে উদ্ধার করার জন্য। পারেননি কুমারসিং। ওদের রক্তে তখন কামানের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। মোতিবাঈকে ওদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দিতে চায় না ওরা কাউকে। সে গুরুই হোক আর স্বয়ং ভগবানই হোক।

বীরাবাঈ দেখছেন বন্যপশুর আসল রূপ। কি হিংস্র, কি নিষ্ঠুর। কুমারসিং মোতিবাঈকে ছিঁড়ে-খুড়ে গিলে খেয়ে বুঝি নিশ্চিন্ত হবে পাঁচটা দানব। বীরাবাঈ ভীতু নন। তবু যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। এগিয়ে যেতে পা সরছে না। মেঝেয় আটকে রয়েছে যেন। পালিয়ে যেতেও মন চাইছে না। সারা শরীরটা অবশ হয়ে আসিছে। শিউরে উঠলেন বীরাবাঈ। রক্তপিপাসুদের খুনের নেশা পেয়ে বসল নাকি? কুমারসিং-মোতিবাঈকে মেঝেয় ফেলে দু-হাতে করে পিষে ফেলছে কেন ওরা ওভাবে? দু'জনের গলার কাছটা অত জোরে জোরে চেপে ধরছে কেন? এরপর আর কিছু জানেন না বীরাবাঈ, অজ্ঞান হয়ে গেছলেন।

জ্ঞান হতে দেখেছিলেন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। তাঁর চতুর্দিকে লোক আর লোক। ঘর-ভর্তি লোক। ধীরে ধীরে একটা নির্দয় দুঃস্বপ্নের কথা মনে

পড়েছে। দুঃস্বপ্ন নয়, সত্যি। চমকে উঠছেন। পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেছেন, কুমারসিং-মোতিবাঈয়ের ব্যাপারে কাকে কাকে সন্দেহ হয় তাঁর। কুমারসিংয়ের চেলাদের কি? আশেপাশের লোকের ধারণা তাই।

অফিসারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছেন খানিক বীরাবাঈ। তারপর বিড় বিড় করে বলছেন, না, না। ওরা যে ওঁর খুব প্রিয় ছিল।

চেলাদের খুনের সাজা থেকে বাঁচিয়েছেন বীরাবাঈ। ভেবেছিলেন, ওদের রাক্ষস তৈরী করার জন্য তাঁর স্বামীই তো দায়ী। ওরা যদি শোধরায় তো শোধরাক না। কিন্তু যাদের রক্ত খাওয়া আর রক্ত দেবার নেশা মজ্জাগত হয়ে গেছে, তারা কি এত সহজেই শোধরায়? না, শোধরায় না। শোধরায়নি ওরাও। ওদের গ্রামেঘরে দাপট বেড়ে গেছল আরো। সকলেই ভয়ে তটস্থ। চোখের সামনে খুনখারাপি করতে দেখেও, ওদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলত না কারো কাছে। কেউই চিরস্থায়ী নয়। ওরাও হলো না। ভীতুদের মধ্যে থেকেই এক এক সময় এক একজন অতি সাহসী বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের শক্তির কাছে বলি হতে হলো ওদের প্রত্যেককে।

কুমারসিং চলে যাবার পর দেশে থাকতে ভালো লাগে নি আর বীরাবাঈয়ের। অশান্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশে দেশে। ক'টা প্রশ্ন বর্শাফলকের মতন বিঁধেছে ভেতরে অহর্নিশি। এ কি মারাত্মক সাধনা তন্ত্রের! নির্ভীক হতে গিয়ে একি নৃশংস ব্যাপার! শান্তি নেই, আছে অশান্তি। জীবন নেই, আছে মৃত্যু। তবু এর ওপর এত আকর্ষণ কেন মানুষের?

যেখানে যখন যে-কোন সাধুকে দেখতে পেয়েছেন বীরাবাঈ, ভেতরের জ্বালা জানিয়েছেন। জানাতে জানাতেই একদিন নিজের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জেনেছেন লছমনঝোলায় পরিব্রাজক তন্ত্রবিদ স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে।

সর্বেচ পশবঃ সন্তি তলবদ ভূতলে নরাঃ
তেষাং জ্ঞান-প্রকাশায় বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ

রুদ্রযামলের শ্লোক উচ্চারণ করে অর্থ বুঝিয়েছিলেন মুক্তেশ্বরানন্দ। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই পশুভাব বর্তমান। মানুষকে পশুর সমানও বলা হয়েছে। জ্ঞানেতেই পশুভাব চলে যায়। আসে বীরভাব। মানুষ হয়ে ওঠে

প্রকৃত মানুষ। এই প্রকৃত মানুষ ক্রমে মানুষ শরীরেই দেবতা হয়ে ওঠে। তন্ত্র মানুষকে অমানুষ করে না। মানুষের ভেতরটা দেখিয়ে দেয়, চিনিয়ে দেয়। কোন্ কোন্ পশুর রক্ত মানুষের শিরা-ধমনীর রক্তে রক্তে মিশে রয়েছে, বুঝিয়ে দেয়। কোন্ কোন্ পশুর কোন্ প্রবৃত্তি মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জানিয়ে দেয়।

তন্ত্র দেখিয়েছেন, ছাগলের কামনা পেয়েছে মানুষ তার কামনায়। মোষের ক্রোধ তার ক্রোধে। মোষের লোভ তার লোভে। বরাহের অহঙ্কার-মদভাব তার অহঙ্কার-গর্বে। হাঁসের মোহ আর মুরগীর ঈর্ষা-পরশ্রীকাতরতা তার মোহে-ঈর্ষায়। তাই ছাগল-মোষ-ভেড়া-শূয়োর-হাঁস-মুরগীর বলির বিধান দেওয়া হয়েছে। বাইরের বলি ভেতরের পশু-প্রবৃত্তি দমনেরই নির্দেশ। তন্ত্রে তিনটি ভাবের সাধনা-প্রধান। পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব। পশুভাবে নিজের পশুপ্রবৃত্তির ওপর লক্ষ্য রেখে সংযমের অভ্যেস। বীরভাবে নিজের জ্ঞানকে প্রহরী রেখে অন্যায়কে শাসন। আর দিব্যভাবে সমস্ত সদগুণের পোষণ।

সদগুণকে ভেতরে ধরে রাখতে পারে যে, জাগিয়ে রাখতে পারে যে, সে-ই মানুষের মধ্যে দেবতা। দেবতা হবার জন্যই তন্ত্র-সাধনা। এই দেবতা পশুভাবের সাধনায় পশুপ্রবৃত্তি থেকে মনকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে সাধনা করার নিয়ম। সেটা একেবারেই করেননি কুমারসিং। তিনি বীরাবাঈয়ের একটা কথার ধাক্কায় রাতারাতি বীরপুরুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন বই-পুঁথি পড়ে, গুরু ছাড়াই সাধনা করে। এখানেই তাঁর মতিভ্রম ঘটেছিল। একটাও পশুপ্রবৃত্তি সরাননি তিনি ভেতর থেকে। বরং রক্তের স্বাদে স্বাদে আরো রক্তপিপাসু করে তুলেছিলেন তাদের। একদম বর্বরযুগের নির্মম নৃশংস করে তুলেছিলেন নিজের অগোচরে। বলির রক্তে শিথিল স্নায়ু সবল করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিবেককে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেননি মুহূর্তের জন্য। বিসর্জন দিয়েছিলেন। তার প্রতিফলও পেয়েছিলেন হাতে হাতে। চেলাদের হাতে অন্তিমদশা ঘনিয়ে এলো তাঁর বীভৎসভাবে। নিজে বিবেকহীন হয়ে পড়েছিলেন বলেই চেলাদের বিবেক জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি কোনদিন। একথা মাথায় আসেনি। এক একটা চেলাকে নররাক্ষস গড়ে ফেলেছিলেন।

তন্ত্র সুন্দরের সাধনা। মানুষ গড়ে, দেবতা গড়ে।

মুক্তেশ্বরানন্দর এই কথাটা প্রাণে গেঁথে গেছে বীরাবাঈয়ের। দেশে ফিরে এসে, দুঃস্বপ্নের স্মৃতি-বাড়ির সামনে ঠাকুরঘরটা ভেঙে ফেলতে বলেছেন

সুমন্তদেওকে। তারপর তন্ত্রসাধনা শুরু করেছেন বীরাবাঈ নিজে। মুক্তেশ্বরানন্দের মতটাই শিরোধার্য করে নিয়ে সাধনায় বসেছেন। মানুষ হয়ে গড়ে উঠবেন তিনি।

দিনের পর দিন সাধনা করে চলেছেন তন্ত্রসাধিকা বীরাবাঈ এখনও।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীরাবাঈয়ের ছোট ভাই সুমন্তদেও বলেছিল সব। তারপর নীচে নিয়ে এলো আমায়। এবার মাটির তলায় নামবে। তয়খানাটা দেখাবে বলে।

পেতলের প্রদীপটা দু'হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নামছে সুমন্তদেও। আমি অনুসরণ করছি ওকে। প্রদীপের আলোটা অন্ধকার কেটে কেটে পথ দেখাচ্ছে আমাদের। শেষ ধাপে এসে থামল সুমন্তদেও। ঘরের মাঝখানে একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি বসানো রয়েছে। ফিরে তাকালুম সুমন্তদেওয়ের দিকে। মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল ও, মৌন বীরাবাঈ ওই ভাবেই সাধনা করে চলেছেন ভেতরে ভেতরে। হয়তো উনি এ চিন্তাও করেন এই নিরিবিলিতে বসে বসে—তাঁর ভেতরে যে মানুষ গড়ার ছবি আঁকা রয়েছে, জল জল করছে—এ ছবির ছাপটা কি অপরের ভেতর পড়বে না? ছবির আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠবে না কি কখনও?

ঝপ্-ঝপ্ শব্দটা জোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। এগুচ্ছি অতি সন্তর্পণে। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের আলোয় জায়গাটায় এসেছি ক'বার—আজো। আন্দাজে অন্ধকারে চোখ ফুড়ে ফুঁড়ে চলছি তাই। সন্দীপন অনুসরণ করছে আমায়।

সন্দীপনের বাবাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে বড় তরফরা একটা নিদারুণ ব্যাপার ঘটে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। শুনে, মাঝরাতে—ভরা অমাবস্যা মাথায় করেও পথে বেরিয়ে পড়েছি।

বেশ খানিক পথ চলার পর শব্দ শুনতে শুরু করেছি। কোপাই নদীর পাড় ধসছে। ধসছে না ঠিক, কারা যেন শাবল চালিয়ে ধসাচ্ছে। এটা বর্ষাকাল নয়। কিনারা ছাপিয়ে নদীর জল ওপচানোরও সময় নয়। জল এখন অনেক

তলায়। অনেক কম—হাঁটুডোবা। বালি মাটির পাড় ভেঙে পড়ছে এই হাঁটুডোবা জলে, ঝপ্‌-ঝপ্‌ শব্দে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

ঝোপঝাড় রেরিয়ে শালগাছগুলোর আড়ালে আড়ালে চলতে লাগলুম বড় তরফদের নজর এড়াবার জন্য। কে জানে ওদের কেউ হয়তো আত্মগোপন করে বসে রয়েছে কোথাও।

গাঁয়ের লোকেরা বড় তরফের কর্তাকে যমের মতন ভয় করে। তাই সামনা-সামনি পড়লে, দেঁতো হাসি হেসে মাথা নিচু করে পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। কৃত্রিম ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে সরে পড়ে সেখান থেকে।

ছোট তরফের কর্তাকে অর্থাৎ সন্দীপনের বাবাকে দেখতে পেলে, সত্যিই অন্তরের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে পায়ে ঢেলে দেয় ওরা। পালানো তো দূরের কথা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ের তলায় বসে বসে নিজেদের সুখ দুঃখের গল্প করে। এদেরই কেউ কেউ জানতে পেরেছে ষড়যন্ত্রের কথা। সন্দীপনের বাবাকে মেরে ফেলার কথা। শোনার পর, জানার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সন্দীপনের কানে কানে শুনিয়েছে ওরা সব। সন্দীপনের বাবা বড় তরফদের নির্বিঘ্নে বিষয় ভোগের পক্ষে একটা মস্তবড় বিষাক্ত কাঁটা। ওটাকে একেবারে নির্মূল করে না ফেললে নিষ্কৃতি নেই তাদের।

নিঃশব্দে চললেও, চলার গতিবেগ বাড়াতে হলো আমাদেব। বেশি দেরি হয়ে গেলে, অনর্থ ঘটে যেতে পারে।···শ্মশানের কাছ বরাবর এসে গেছি আমরা থমকে দাড়িয়ে পড়লুম। দেখছি চিতার আগুন জ্বলছে নদীর ধারে। কাঁপা কাঁপা আগুনের আলোয় দেখছি সব কিছু। দেখছি একটা মর্মান্তিক বীভৎস দৃশ্য।

নিকষ কালো বলিষ্ঠ চেহারার দুটো লোক গাঁইতি-শাবলের ঘায়ে নদীর পাড় খুঁচিয়ে-খুবলে একটা মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে বার করল। মৃতদেহ শিশুর। বছর চার-পাঁচেকের। ছেলেটা চেনা। গরীব বিধবার একমাত্র সন্তান ও। স্বামী মারা যেতে ওকেই বুকে আঁকড়ে ধরে স্ত্রীলোকটি আশায় বুক বেঁধেছিল। মরা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মূর্ছা গেছে মা।

মায়ের অচৈতন্য অবস্থাতেই গাঁয়ের লোকেরা বুক থেকে তুলে নিয়েছিল প্রাণহীন ছেলেটাকে। আজ অকালেই ঘটেছে এসব। শ্মশানে এসেছিলুম আমি। ওই জায়গাটায় মৃত ছেলেটাকে খোঁড়া গর্তের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিতে দেখেছিলুম।

সেই ছেলেকে তোলা হলো মাটি থেকে। মনে হচ্ছে, মরেনি, বেঁচে আছে। জ্বলন্ত চিতার আগুনের কাছে নিয়ে এলো ওরা। মুখখানা বড্ড তাজা দেখাচ্ছে। ফুটন্ত ফুলের মতন।

আগুনের কাছে বসে আছে একজন আর দাঁড়িয়ে আছে একজন। যে দাঁড়িয়ে সে পুরুষ। যে বসে সে নারী। নারী একটা জোয়ানের মৃতদেহের ওপর বসে। রক্তে ভরা মরার মাথার খুলিটা ঠোঁটে ঠেকাচ্ছে বার বার। থেকে থেকে হাঁ করে গলায় ঢালছে রক্তের ধারা। কতক ভেতরে যাচ্ছে, কতক মুখ উপচে দু' পাশের কষ বেয়ে বুকে ঝরে পড়ছে। রক্তের স্বাদে কি এমন আনন্দের জোয়ার বইছে স্ত্রীলোকটির ভিতর—একমাত্র সে-ই জানে। রাক্ষুসীর মতন রক্ত গেলবার পর ভয় ধরানো বুক কাঁপানো হাসি হেসে উঠছে খিল খিল করে। সামনে কালো লোমের নধর ছাগলটার ধড়-মুণ্ডু পড়ে রয়েছে আলাদা আলাদা। রক্তমাখা খাঁড়াটা মুণ্ডুর পাশে।

পুরুষটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে সুধার মাদকতা চলছে।

লাল কৌপীন-পরা তামাটে রঙের দীর্ঘদেহী পুরুষটি হাঁটু মুড়ে বসল এবার।

শবের ওপর বসা স্ত্রীলোকটির দু-পায়ে রক্তজবা দিয়ে পূজো করল। গলায় পরিয়ে দিল রক্তজবার মালা। পরনে লাল শাড়িটা জলজলে লাল দেখাতে লাগলো আরো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে স্ত্রীলোকটির। বুকের মালা দুলছে। পিঠভর্তি রুখু এলোচুল ফুর ফুর করে উড়ছে হাওযায়। স্ত্রীলোকটি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বুকের স্পন্দনটা কমে যাচ্ছে। নিস্পন্দ হয়ে গেল বুঝি। পাথরমূর্তির মতন বসে আছে। ধীর স্থির। কালো দেহের ওপর লাল জবার মালাটার দুলুনি থেমেছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে এখন, ও যেন রক্তমাংসের শরীরের নারী নয়, প্রকৃতই কোন শিল্পীর হাতে খোদাই করা পাথরপ্রতিমা, শ্মশানকালী।

পূজো চলল বেশ কিছুক্ষণ। কতক্ষণ, তা বুঝতে পারা গেল না। এখানকার বাতাস-আকাশ মাটি-গাছগাছালি, সব যেন কেমন ঠেকছে। সব যেন সম্মোহিত। আমরাও।

এগুতে যাচ্ছি, দাঁড়িয়ে পড়লুম একটা কর্কশ কণ্ঠের চিৎকার শুনে। রক্তচক্ষু পুরুষ দক্ষিণ দিকের লোককে নির্দেশ দিচ্ছে।—শীগ্‌গির নিয়ে আয় কারণ! শিশুর মৃতদেহটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, শীগ্‌গির নিয়ে আয় কোমলাসনটাকে।

মাথা নত করে নির্দেশ পালন করল লোকটি। মৃত ছেলেটাকে শুইয়ে দিল

সামনে এনে। এবার পুরুষটি নিজের গলায় ঝোলানো নরকপালের মালায় হাত রেখে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল বিড় বড় করে। শুনতে পাওয়া গেল না কিছু, বুঝতে পারা গেল না কিছু।

জায়গাটা থমথমে হয়ে উঠেছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখছি আমরা। আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্দীপন। ওর বুকের দুর দুর আওয়াজটা আমার বুকের তলায় এসে ধাক্কা মারছে। ওর মনোবল ঠিক রাখবার জন্য হাতটা সজোরে চেপে ধরেছি আমি।

চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি। মনে মনে করণীয় বিষয়টা রোমন্থন করে নিচ্ছি। সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে, কি করতে হবে। আমাদেরও লোকেরা আশেপাশে লুকিয়ে আছে। আদেশের প্রতীক্ষা শুধু। তারপর যা হয়ে যাবে, কঙ্কালিতলার ইতিহাসে তা হয়নি কখনো। বড় তরফদের ভবিতব্য বদলে যাবে। বিধাতাকে নতুন করে ভাগ্যলিপি লিখতে হবে আবার। সৌভাগ্যের নয়। ওদের সারা জীবনের দুর্ভাগ্যের করুণ-কাহিনী।

গলার মালা ছেড়ে মৃতশিশুর বুক স্পর্শ করল পুরুষটি। দু'চোখ বুজে মনে মনে জপ করল কি কিছু বলল হয়তো। তারপর রক্তমাখা খাঁড়াটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শবাসনে বসা নারীমূর্তির নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত। এবার চোখ ফেরাল ওই মূর্তির ডান হাতের দিকে। মড়ার মাথার খুলিটা খপ করে তুলে নিয়ে আধজমা রক্ত লেহন করতে লাগল জিভ দিয়ে। পুরুষটির মূর্তি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে থর থর করে। একটা দানব বুঝি জন্ম নিচ্ছে পুরুষটির অন্তরের অন্তস্থলে।

খাঁড়া হাতে করে, পুরুষটি শ্মশানে এ-মোড় থেকে ও-মোড় অবধি দুম দুম করে চলতে লাগল। মনে হচ্ছে, শ্মশান কাঁপছে, গাছপালা কাঁপছে, শিয়াল-কুকুর, পশুপক্ষীরা যে যেখানে আছে—তাদের কারো গলা দিয়ে ভয়ে স্বর বেরোচ্ছে না একটুও।

পুরুষটির দাপাদাপিতে প্রলয়ের আভাস পাচ্ছি যেন আমরা। সাক্ষাৎ প্রলয় নেমেছে কঙ্কালিতলা শ্মশানের মাটিতে। এ প্রলয়ের কোপে নিঃশেষ হয়ে যাবে হয়তো কঙ্কালিতলার সব মানুষ। বাদ যাবে শুধু বড় তরফরা।

ওরাই আনিয়েছে শ্মশানের এই বীভৎস-দর্শন বিশাল জটাধারী পুরুটিকে। বড় তরফদের মতে ইনি নাকি মহাতান্ত্রিক মারণ-বিশারদ। মৃত শিশুর ওপর অর্থাৎ কোমলাসনের ওপর দক্ষিণমুখো হয়ে বসে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে

কড়মড় আওয়াজ তুলে যখন কারও নাম উচ্চারণ করে মারণ-মন্ত্র জপ করতে থাকেন সাধুবাবা, তখন থেকেই সে লোকের মরণ ঘনিয়ে আসবে। দু-তিন দিনের ভিতর দুনিয়া থেকে সরে যেতে হবে তাকে নির্ঘাৎ। মারণ-ক্রিয়ার সময় উনি ভৈরবীর আশীর্বাদ পান সম্পূর্ণ। ভৈরবীর জন্যই ওঁর কার্যসিদ্ধি অনিবার্য। সাধারণ মেয়ে নয় ভৈরবী। শ্মশানে ওকে পূজো করার সময় আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে ওঁর। উনি মারণের ইষ্টদেবী—ভদ্রকালীও হয়ে ওঠেন এক সময়।

আমি দেখছি আর ভাবছি বড় তরফের কর্তার কথা। শোনার সময় ভাবছিলুম, ভয় দেখাচ্ছে। এখন যা দেখছি, তা হচ্ছে কর্তার কথাই ঠিক।

সাধুবাবা কোমলাসনের কাছে এগিয়ে এলো। বসতে গিয়ে ইতস্ততঃ করছে। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। কার আসার অপেক্ষা। যার জন্য অপেক্ষা, সে এলো। বড়তরফের কর্তা। সাধুবাবার পায়ে আর ভৈরবীর পায়ে কতকগুলো করে নোটের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করল। নোটগুলোর ওপর সাধুবাবার দু'চোখ চক্কর দিয়ে এলো একবার। টাকার অঙ্কটা অনুমান করে নিল বোধহয়। সহাস্যে মৃতশিশুটার ওপর আঙুলে রক্ত লাগিয়ে কি সব আঁকাজোখা করে জবাফুলে পূজো করতে লাগল। পূজো-শেষে বসবে ওখানে। তারপর মারণ-ক্রিয়া চলতে থাকবে। সেই ক্ষণটির জন্য কর্তার অধীর প্রতীক্ষা। জোড়হাতে গরুড়পক্ষীর মতন বসে আছে সাধুবাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে এবার সন্দীপনের। চঞ্চল হয়ে উঠছে খুব। হওয়াই স্বাভাবিক। কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, বাবার মৃত্যুকে রুখতে হবে যে-কোন উপায়ে। ভয় পেলে চলবে না। সারাজীবন ধরে অনেক সয়েছি। এবারে হয় এসপার নয় ওসপার। ওদের মারণ-ক্রিয়া পণ্ড করে দিতে হবে এই মুহূর্তে। লাঠিয়ালদের হুকুম দিই—

হুকুম দিতে হলো না আর। শক্ত হাতে সন্দীপনের মুখখানা সজোরে চেপে ধরেছে কে পিছন থেকে। ও ছাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ঘুষি মেরে লোকটার হাত থেকে সন্দীপনকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে নিজেই ঘুষি খেলুম গালে। মনে হলো দু'পাটি দাঁতের গোড়া নড়ে গেল আমার। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে গেলুম আমি।

সন্দীপনকে টানতে টানতে নিয়ে এলো আমার কাছে লোকটি। হাত ধরে টেনে তুলল আমায়। তারপর অবাক করে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, বাপকে রক্ষে

করতে এসে নিজেরা যে শেষ হয়ে যাবে ওদের নজরে পড়লে। শীগ্‌গির আমার সঙ্গে পালিয়ে চল এখান থেকে।

চেনা গলা। মুখের কালো আবরণটা খুলে ফেলতে অতি পরিচিত মুখই দেখলুম। দেখলুম আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সৌম্য-সুন্দর শুভানন্দজীকে।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম এ সময় এখানে ওঁর আসায়। আমি জানি আজ ওঁর জুনাগড়ে যাবার কথা।

দু'পাশ থেকে দু'জনের দু'হাত ধরে, ছোটার মতন বেশ জোরে জোরেই হাঁটছেন শুভানন্দজী। ওঁর চলার তালে তালে পা চালিয়ে চলছি আমরাও।

আজকের ঘটনাটা যাবার আগে আঁচ করেছিলেন শুভানন্দজী হয়তো। হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেনও শ্মশানের সব দৃশ্য। তা না হলে শ্মশানের ক্রিয়াকাণ্ডের গূঢ়রহস্য জানিয়ে দেবেন কেন আগেভাগে! উনি বলেছিলেন, শ্মশান—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্মশান হয়ে যায় রাতে—ঘুমন্ত মানুষের নিষ্ক্রিয়তার পরিবেশে। নিষ্ক্রিয় মানুষ মরা—শব। এই শবাসনে প্রাণের স্পন্দন ভৈরবী-কালী। শত্রু নিজের ভিতরেই। অসৎ-প্রবৃত্তি। শিশু অবস্থা থেকে অসৎ-প্রবৃত্তিকে সংযত করতে চেষ্টা 'মারণ-ক্রিয়া'। সংযত মনে অসৎ-প্রবৃত্তি মৃত। মৃত অসৎ-প্রবৃত্তি মৃত শিশু—কোমলাসন। মৃত অসৎ-প্রবৃত্তির ভিতই শত্রুহীন মৃত্যুহীন সৎ-চেতনার আসন। আত্মজ্ঞান-অনুসন্ধানী সাধক মনে মনে এই আসনের ওপর বসে, আত্মশক্তির--দেবীর সাধনায় মগ্ন হন।

এসব বলার পর বিশেষভাবে সাবধান করেও দিয়েছিলেন শুভানন্দজী।—বাইরের কোন কিছু ক্রিয়াকলাপ দেখে বা কারো মুখে কোন উত্তেজনার কথা শুনে বিবেক-বুদ্ধি হারানো উচিত নয় একদম।

শোনার দেখার এমন মোহ—শুভানন্দজীর সাবধান-বাণী ভুলে গেছলুম আমরা একেবারে। একটা প্রাণ বাঁচাবার নামে বহু প্রাণ নষ্ট করতে এগিয়ে গেছলুম শ্মশানে।

শুভানন্দজীর হাতের উত্তাপ অনুভব করছি আমার হাতে। তবুও মনে হচ্ছে, সত্যিই কি শুভানন্দজী এসেছেন, না স্বপ্ন দেখছি? শুভানন্দজীর চোখে চোখ পড়তে দেখলুম, কৌতুক উপচে পড়ছে। হাসছেন উনি। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন বোধহয়। বললেন, আমার মন বলছিল—তোরা এরকম করবি। জুনাগড় যাওয়া স্থগিত রেখে দিয়ে চলে এলুম তাই। ভয় নেই, তোর বাবার কোন অমঙ্গল হবে না।

পথে আর অন্য কোন কথা হলো না আমাদের মধ্যে। তিনজনেই চলেছি চুপচাপ।

…অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলুম আমরা। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন উনি। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে ধরলেন শূন্যে। কি যেন দেখলেন, কি যেন বুঝলেন। জানালেন, ভিতরে যাওয়া হলো না আর। এখুনি চলে যেতে হবে।

থাকতে বলতে পারলুম না আমি ওঁকে। আটকাতে পারলুম না। আমাদের মতন অন্য কারো বিপদের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ওর মনশ্চক্ষে।

আমি দেখছি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন শুভানন্দজী ঝড়ের বেগে। দূরে—আরো দূরে—আরো আরো। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন একেবারে ব্রহ্মতান্ত্রিক শুভানন্দজী।
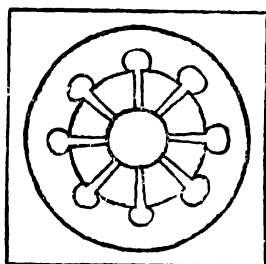
চারজোড়া চোখেই লালসার তরল লাভা টগবগ করে ফুটছে। মধ্যিখানে বসে আছে চন্দ্রলেখা। নিথর পাথর। পালানোর উপায় নেই। পালানোর ইচ্ছেটাও ওর মরেছে। আদিম বন্য-স্বভাবের সঙ্গে যোঝাযুঝি করার ক্ষমতা নেই ওর এতটুকু। আত্মসম্মান বজায় রাখার জ্ঞানও হারিয়েছে। জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন নীলঋষি। সব দোষ তাঁর সব ভুল তাঁর। চন্দ্রলেখাকে তৈরী করেছেন অন্যভাবে। দেবতার প্রসাদী ফুল হিসেবে।

যে চারজন জোয়ান বসে আছে ওকে ঘিরে, পাঁচ-ছ' হাত করে দূরেই বসেছিল ওরা, এবার বসে বসেই একটু একটু করে এগিয়ে আসছে চন্দ্রলেখার কাছাকাছি। আত্মরক্ষার উপায় শেখান নি নীলঋষি। ভেবেছিলেন এরকম সর্বনেশে ঝড় আসবে না ওর জীবনে কোনদিন। সকলের ভালো দিকটা দেখতেই শিখিয়েছেন। নিজের মতন করে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন সকলকে। ভালোবাসলে প্রত্যেকেই অন্যচক্ষে দেখবে। কামগন্ধহীন সরল শিশুর মতন

মুখখানা দেখে সবার মমতা জাগবে। ভেতরের পবিত্র ভাবটা অন্তত উঁকি মারতে থাকবে কালোর আড়াল থেকে।

তা হলো না।

যাদের পাশবর্বৃত্তি প্রবল, তাদের সংযত না করে, তাদের কাছে চন্দ্রলেখাকে একেবারে একলা ছেড়ে দেয়াটা দারুণ অন্যায় হয়ে গেছে। ওদের মমতা জাগবে না, জাগবে না বিবেক। ওদের নিঃশ্বাসে কামনার আগুন। এ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে চন্দ্রলেখা নিমেষে।

আপসোসের অন্ত নেই নীলঋষির। নিজের কানকে বিড়বিড় করে শোনালেন নিজে।—নীল! রিপুর তাড়নায় উন্মত্ত মানুষকে নিজের আয়ত্তে এনে মন ঘুরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া কেন শেখাওনি আগে? কেন—কেন?

বসে থাকতে পারলেন না নীলঋষি।

চৌকোণা পাথরটার ওপর বসেছিলুম দু' জনে। উনি আমার হাত ধরে টেনে তুললেন। বললেন, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—অনর্থ ঘটতে আর খুব বেশী দেরী নেই।

অদ্‌কুয়ারী থেকে নিচের দিকে পাহাড় বেয়ে বেয়ে অতি সন্তর্পণে নামছি আমরা। নীলঋষিকে বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে। জম্মুতে এসে ক'দিন ধরে একসঙ্গে ওঁর ডেরায় রয়েছি। ওঁকে দেখে হিমালয়ের মতন ধীর-স্থির মনে হয়েছিল।

ত্রিকূট পাহাড়ে বিষ্ণোদেবীর গুহা দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। দেখা আর হলো না। আরো খাড়াইয়ে ওঠার আগে একটু বিশ্রাম নিতে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে এই বিপত্তি! উনি শূন্যে দৃষ্টি মেলে ধরে চমকে উঠলেন। তারপর নির্জন জায়গায় বড় বড় নুড়ির গাঁথুনিতে নিজের যে ডেরাটা গুহার আকারে তৈরী করেছিলেন, সেই ডেরার ভেতরের কথা বলে যেতে লাগলেন। চন্দ্রলেখার কথা।

ভালো লাগল না। সিদ্ধপুরুষ বলে যাঁর খ্যাতি, তাঁর মুখে এসব কথা, কেমন যেন খটকা লাগল। অব্যবস্থিতচিত্ত বা চন্দ্রলেখার মোহে অন্ধ যে কোন লোকের মুখে এ ধরনের কথা বলা সাজে। যত সব আজেবাজে ধারণা। কল্পনার চোখে এখান থেকে বসে দেখলেন উনি ডেরার ভেতরকার দৃশ্য। দেখলেন যা, তা আর কহতব্য নয়।

নিচে নেমে এলুম আমরা। এবারে একটু পা চালিয়ে চলেছি। আমার হাতটা ছাড়েননি। ধরে আছেন। এক রকম টেনে নিয়ে চলেছেন। কাজে

কাজেই ওঁর চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে আমার দু' পা আপনা হতেই এগোচ্ছে।

উনি বলেছেন, কাল হলো ওই ফটিকের মালাটা। সবেমাত্র প্রদীপটা নিভেছে। কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছি শবাসনে। আলগা হয়ে গেছে হাত-পায়ের জোড়গুলো। তবুও ডানহাতের মাঝের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুলে ঠেকে ঠেকে মালাটা ঘুরছিল। জপ করছিলুম শক্তিবীজ। নিজের অগোচরেই মালাটার একটা দিকের সঙ্গে অন্যদিকটা জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঘষাঘষি হয়ে যাচ্ছিল বার বার। ঘষার সময় সোনার মতন চিক চিক করে উঠছিল অন্ধকারে। আসল ফটিকে তাই-ই হয়। ওই চারজনের লোলুপ দৃষ্টি পড়ছিল মালাটার ওপর—খেয়াল করি নি। কাছে এগিয়ে এলো ওরা চারজনেই। বসল চারপাশ ঘিরে। ওদের মধ্যে কইয়ে-বইয়েটা মৃদু গলায় বলল, মালাটা সোনার? ধ্যান ভাঙল, জপ থামল। নিশুতি রাতে নিস্তব্ধ ঘরে ওর কথাটায় পাহাড়ের চূড়ো থেকে পাথর খসে পড়ার শব্দ শুনলুম যেন আমি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললুম, না।

বিশ্বাস হলো না ওর।

মালাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। বলল, তুমি জাদু জানো। সোনাকে ফটিক দেখাচ্ছ। আমি হেসে ফটিকের দানাগুলো ঘষে ঘষে দেখিয়েছি, ও নিজেও পরীক্ষা করেছে। মুখ টিপে হেসেছে। বুঝেছি এটা জাদুর খেলাই খেলা করছে ওর মাথায়।

এরপর কাছ থেকে চলে গেছে ওরা আর কথা না কয়েই। ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কিন্তু জেগে। জেগে থাকলেই তন্ত্রের চীনাচার—যেটার নাম অঘোরাচারও—সেটার কথা ভাবতে খুব ভালো লাগে। তন্ত্র কত উদার। তার বুকে সকলকে আঁকড়ে ধরে রাখার কি চেষ্টা এই আচারে। এখানে অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। জাত বেজাত বলে কিছু নেই। ছোট বড় পতিত অপতিত বলেও কোন ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের পাঁচিল খাড়া হয়ে নেই মাঝামাঝি। সকলেই সমান। সকলেই বিশ্বব্যাপী এক মুক্তশক্তির সন্তান। সেই শক্তি আমার মধ্যে—সকলের মধ্যে। একজনকে অপমান করা হেয় করা মানেই সে-শক্তিকে অপমান-হেয় করা। একজনকে ভালোবাসা-শ্রদ্ধা করা মানেই সেই শক্তিকেই ভালোবাসা-শ্রদ্ধা করা।

কাউকে কোনদিন ফেরাইনি তা-ই যে যখন এসেছে, সে রাতেই হোক কি দিনেই হোক, দেশের হোক কি বিদেশের হোক, পরিচিত হোক কি অপরিচিত

হোক—আশ্রয় দিয়েছি নির্দ্বিধায়। ভেবেছি মহামায়াই সাক্ষাৎ এসে হাজির হয়েছেন তাঁর সন্তানের বেশ ধরে। সে যে কি আনন্দ—বলে বোঝানো যায় না।

এই চারজনকে দেখেও আনন্দ ধরেনি আমার। বৃষ্টিবাদলে আশ্রয় চেয়েছে, দিয়েছি।

শেষরাতে উঠে এসেছে ওরা আবার আমার কাছে। দেখলুম রাতে বোধহয় সোনাব চিন্তায় ওদের ঘুম হয় নি ভালো করে। সেই সোনার কথা। এবারের কথা শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারিনি আমি। তন্ত্রে নাকি রসায়ন বিদ্যা আছে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা জানে। সোনা তৈরী রূপো তৈরী। যেখানেই সন্ন্যাসী দেখে ওবা, সেখানেই ধরনা দেয়। যদি কোন প্রক্রিয়া-টক্রিয়া শেখা যায় এখানেও ওই একই উদ্দেশে আসা। আশ্রয় নেয়া।

আমি বললুম, রসায়ন বিদ্যা আছে সত্যি, তবে সোনা তৈরী রূপো তৈরীর ঠিক প্রক্রিয়া জানা নেই কোন। এই 'ঠিক ··' কথাটা লুফে নিয়ে পেয়ে বসল ওরা আমায়।—খানিকটা আভাস দিতে পারবেন নিশ্চয় তাহলে। সত্যি কথা বলতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়লুম। যেটুকু জানা ছিল, জানালুম। আসল সোনা রূপো নয়। তামার সোনার রঙ আর সীসের রূপোর রঙ।

চারহাত পরিমাণ গভীর গর্তে—অর্ধেক পর্যন্ত বিরজা কাঠেব কয়লায় ভবে দিতে হবে। তারপর তামা-ভস্ম, তার ওপর বনঘুটে। গর্তে আগুন জ্বালিয়ে সাতদিন অবধি তাপ বজায় রাখা নিয়ম। সাতদিন পর তামা তুলে নিয়ে লোহার পাত্রে রেখে, বিবজা কাঠের কয়লার আগুনে জ্বাল দিলে, তামা গলবে। তখন বিরজাগাছের রস সিজেব রস বাসকের রস মেশালে তামার সোনার রঙ হয়ে উঠবে। এই তিনটে রস সীসের সঙ্গে মেশালে সীসের রূপোর রঙ। এই তিনটে রসের সঙ্গে আরো যেন কি একটা গাছেব রস মেশাতে হয়। সেটার নাম এমন বিদঘুটে—মনে নেই। গাছটা পাওয়াও দুর্লভ।

শেষের কথাটায় আবারো মুশকিল বাধালুম আমি নিজেই। এক জাল ছিঁড়ে বেরুতে গিয়ে আর একটা কঠিন বুনুনির জালে বাঁধা পড়লুম আষ্টে-পৃষ্টে। ওরা নাছোড়বান্দা। নামটা ভুলে যাওয়া একটা অজুহাত। মনে আছে ঠিকই। এড়িয়ে যাচ্ছি নাকি আমি। বলতেই হবে।

ভুলে গেলে কেমন করে বলা যাবে? অতশত যুক্তি শোনার দরকার নেই ওদের। না বললে, স্থানত্যাগ করবে না ওরা। দিন যাক মাস যাক বছর যাক—যুগের পর যুগ চলে যাক—কোন কিছুতেই পরোয়া করে না ওরা।

ওদের উদ্দেশ্য পূরণ না হলে, ওদের কেউ এক-পাও নড়বে না। সেই থেকে রয়ে গেছে ওরা একপক্ষ।

নীলঋষি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এখন আবার আর একটা দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় চেপেছে ওদের। সর্বনাশের দরজায় পা বাড়িয়েছে। হন-হন করে চলতে লাগলেন নীলঋষি।

...এসে পৌছুলুম আমরা। প্রবেশ করলুম ডেরায়। দেখলুম যা, হতভম্ব হতবাক। এ দৃশ্য দেখলে মরাও উঠে বসবে। যে-লোক বিবেক-বুদ্ধির মাথা একেবারে খেয়ে বসে আছে—একা সে ছাড়া অন্য লোকের মাথায় গরম রক্তের স্রোত বইতে থাকবে। নীলঋষি যা যা দেখেছিলেন, সবই সত্যি সত্যি দেখছি আমি চোখের সামনে।

চারজন জোয়ান এমন ভাবে চন্দ্রলেখার কাছাকাছি এসে গেছে যে, গায়ে গা ঠেকে ঠেকে অবস্থা। চন্দ্রলেখার মুখের কোথাও একবিন্দু রক্ত নেই। সাদা ফ্যাকাশে।

আদেশের সুরে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন নীলঋষি। ওর কাছ থেকে সরে এসো তোমরা। শীগ্‌গির সরে এসো। আসল সোনা তৈরীর প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেবো তোমাদের। কথা দিচ্ছি।

কথাগুলো মন্ত্রের মতন কাজ করল। চমকে উঠে সরে এলো ওরা। এতক্ষণ যে কেমন করে একভাবে বসেছিল চন্দ্রলেখা সেটা ভাববার বিষয়। সামনে এসে দাঁড়াতে নীলঋষির দু'পা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে। চেতনা হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

এ ঘটনার পরদিন ভোরে চলে যেতে হলো আমায় এখান থেকে। অন্য জায়গায় যাবার জন্য আগে থেকেই সময়-দিন নির্দিষ্ট করা ছিল।

বছর দশেক পরে আবার ফিরেছি আমি এখানে। এসেছি নীলঋষির ডেরায়। উনি নেই। দু'বছর আগে দেহ রেখেছেন। চন্দ্রলেখা আছে আর আছে সেই চারজন। এদের দেখেই আমি অবাক বেশী। চন্দ্রলেখার খুব অনুগত দেখছি এরা। চন্দ্রলেখার ইশারায় আমাকে আসন পেতে দিল এদের কেউ বসতে, কেউ জল এনে দিল, কেউ ফল এনে দিল। আচার-ব্যবহার মুখের হাসিটি পর্যন্ত অমায়িক। তাজ্জব ব্যাপার। আমি ওদের দিকে দেখছি একবার আর একবার চন্দ্রলেখার দিকে। চাপা হাসি ফুটে উঠছে চন্দ্রলেখার ঠোঁটের ফাঁকে। হাত নেড়ে কাছে ডাকল। আমার ভাবগতিক দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে নিশ্চয় কি বিষয়ে এত কৌতূহল আমার।

উঠতে যাচ্ছি, ফলের থালাটার দিকে চোখ রেখে বলল, ওটা সেবায় লাগুক প্রথমে, তারপর আসুন। অনুগতদের একজন ওর সামনেও একখানা সাদা কম্বলের আসন পেতে দিল আমার বসার জন্য। একটু পরে এসে বসলুম। অনুগতদের একটু অন্য ঘরে যেতে বলল চন্দ্রলেখা। ওদের গলায় ফটিকের মালা। হাতেও ফটিকের মালা। কাজ করতে করতে একটু অবকাশ পেলেই জপ করে হয়তো।

সবাই চলে যেতে খাটো গলা করে বলল, অত কি দেখছেন? আগের সব মনে আছে নিশ্চয়। ওরা আর আগের মানুষ নেই। আসল সোনা তৈরী করতে শিখে গেছে। শিখেছে আমার কাছে না। নীলঋষিরই কাছে। বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল চন্দ্রলেখা। অন্যমনস্ক। বোধহয় স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বসে সাধনা করার অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে এক এক করে। আজ নীলঋষি নেই, চন্দ্রলেখা একাই সাধনা করে চলেছে। চোখ ফেরাল ডানপাশের শূন্য আসনটার দিকে। কি যেন কি দেখল খানিক। মানুষ নেই, তবু দেখল। বলল, কিছুই তো হারায় না। জলে বাতাসে ধুলোতে আপনাতে আমাতে—মিশে রয়েছে সব হারানো। হাসল একটু। তারপর তার চারজনকে নিয়ে সাধনার ইতিবৃত্ত শোনাতে শুরু করল।

সেটা একটা দিন গেছে।

ওরা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। যত এগুচ্ছে তত দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে চন্দ্রলেখার।

ওদের একজন বলল চন্দ্রলেখাকে—যে-গাছটার নাম ভুলে গেছে বলল নীলঋষি, সেটা বলতে হবে তোমাকে। না বললে, তোমার দুর্দশার আর শেষ থাকবে না কিন্তু। আর একজন বলল, এই ফাঁকে একে নিয়ে সটকান দিলে মন্দ হয় না।

চন্দ্রলেখা বলল, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো তোমরা। সোনার ব্যাপারে কোন গাছ-গাছড়ার নামই আমি জানিনে।

চারজনের ভেতর চোখে চোখে কি যে ইশারা হয়ে গেল, চন্দ্রলেখা বুঝল না কিছু। কিন্তু ভীষণ ভয় ধরল। ওদের চাউনি বদলালো। জঘন্য, অতি জঘন্য।

বিপদভঞ্জন হয়ে দেখা দিয়েছেন নীলঋষি। ওদের বলেছেন, একটা শর্ত পালন করতে হবে প্রথমে। যা-যা বলব শুনতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। সোনা তৈরী শিখিয়ে দেবে চন্দ্রলেখাই। সময় লাগবে। যতক্ষণ না আদেশ

দেখো ততক্ষণ চন্দ্রলেখার কাছে কেউ কোন সময়ের জন্য বিরক্ত করতে আসবে না।

আসেনি ওরা।

ধীরে ধীরে নীলঋষি তৈরী করেছেন চন্দ্রলেখাকে অর্ধনারীশ্বর সাধনার মধ্যে দিয়ে। একটি প্রাণশক্তি-আত্মা দুটি দেহে। একটি পুরুষ দেহে, একটি নারী দেহে। আবার একই দেহের পুরুষ বা নারীর যে কোন একজনের বাঁদিক নারী ডানদিক পুরুষ। বাঁদিক পার্বতী ডানদিক শিব। এই ধ্যান শয়নে-স্বপনে-মননে অহর্নিশি এঁকে যেতে হয়েছে চন্দ্রলেখাকে। নিজেকে ভাবতে হয়েছে সত্যিসত্যিই-পার্বতী, সত্যিসত্যিই শিব।

প্রতিদিন যজ্ঞের আগুনে শিব-পার্বতীর মিলিত রূপ দেখেছে আগুনের আভায়। দেখেছে আগুনের সাদা-নীল আভায় মহেশ্বর আর লাল-হলদে আভায় গৌরী। দেখতে দেখতে নিজেকেই যজ্ঞকুণ্ডের আগুনে দেখেছে যেন তন্ময় হয়ে। তার বাঁদিকটায় লাল-হলদে রঙের আগুন। দক্ষিণে সাদা-নীল।

নীলঋষি বলেছেন, অতি পাশব মনের ছেলেমেয়েদের এই সাধনায় প্রবৃত্তির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নিখাদ সোনা করে গড়ে তোলা যায়। ওদের দুর্বৃত্ত-রিপুকে মুঠোয় এনে মুঠোয় পুরে রাখা যায় ওদের অগোচরে। বিশেষ করে নিষেধ করেছেন উনি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করে কেউ যেন কারো মন ঘোরাতে না যায়। বিপদ হতে পারে পদে পদে। বিষধর সাপ নিয়ে খেলার সামিল এটা। অজ্ঞ রোজাকেই না ছোবল খেয়ে খেয়ে বিষের জ্বালায় মরতে হয় শেষে।

চন্দ্রলেখাকে আরো বলেছেন, ওই চারজন আসবে যখন, তখন নিজেকে পার্বতীর মতন অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী ভাববে তুমি নিজেকে। ভাববে, তোমার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আসছে ওরা। ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। মন তুমি ছাড়া আর কিছু জানে না। তুমি যা ভাববে, ওরা তা-ই ভাববে। যা বলবে, ওরা তা-ই শুনবে। তোমার মনই ওদের মন হয়ে যাবে।

পরীক্ষা করে যেদিন বুঝেছেন নীলঋষি উত্তীর্ণ হতে পেরেছে চন্দ্রলেখা, সিদ্ধিলাভ করেছে সাধনায়, সেদিন ওদের সামনে বেরুতে বলেছেন, আসতেও বলেছেন ওদের এঘরে।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকেছেন নুড়ির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। প্রদীপের মোটা সলতেটা উসকে দিয়েছেন আগে। ঘরের ভেতরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। গলার নিচে থেকে পা অবধি ঢাকা টকটকে লাল রঙের একটা আলখাল্লা

পরেছে চন্দ্রলেখা। গলায় ফটিকের মালা। পিঠভর্তি রুক্ষ চুল। আসনে বসে আছে। মুখে মৃদুহাসি।

ঘরে ঢুকেই চারজনে থমকালো প্রথমে। তারপর হাসি ছেয়ে গেল সবার মুখে। কাছে এলো। একটা ধাক্কা খেল যেন। দাঁড়িয়ে পড়ল একসঙ্গে। কথা-বার্তা নেই সটান বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সবাই।

এই আসা-যাওয়া চলেছে রোজ নিয়ম করে। অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত ব্যাপার। ওদের নেশা ধরেছে। চন্দ্রলেখাকে দেখার জন্য ছটফট করে। দেখে ভালো লাগে। কাছে গেলেই মনে হয় ও মেয়ে নয়; একটি সুন্দর ছেলে। মেয়েকে ছেলে দেখছে কি করে এ প্রশ্ন উঁকি মারে না একদম মনের কোণে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ফিরে যায় ওরা। ওরা যা করে, যা দেখে, যা ভাবে—সবেরই উৎপত্তি চন্দ্রলেখার মন থেকে।

নীলঋষির আশীর্বাদে চন্দ্রলেখার সাধনায় সিদ্ধ শুদ্ধ মনই এদের ভাবনাচিন্তার স্রোত বিপরীত দিকে বইয়েছে। সোনা তৈরী করতে এসে এক একজন সোনার খনি হয়ে উঠেছে—বিবেকের প্রতিমূর্তি।

চন্দ্রলেখাকে যারা কামিনী ভেবেছে, তারাই জননী ভাবছে এখন। শুধু জননী নয়, মা-বাবা দুই-ই।

শঙ্করাচার্যের অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রের শ্লোক আমার কানের কাছে কে যেন গুন গুন করে গেয়ে উঠল।...জগজ্জনন্যৈ জগদেক পিত্রে...
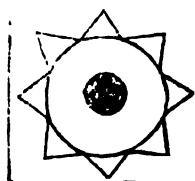
ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে আগুন।

ঘরটা গাছের গোল বেড়ায় ঘেরা। যারা গাছে গাছে আগুন লাগিয়েছে, তাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ঘরের মানুষ বেরোতে পারবে না। বেরোলেও পালাতে পথ পাবে না কোনদিক দিয়ে। অবুঝরা মোক্ষম অস্ত্র হেনেছে।

কারা করেছে, রঘুনাথ জানে। জানে কিংকিনীও। দু'জনেই বুঝিয়ে বলেছে তীর্থরাজস্বামীকে। এ স্থানে আর একদণ্ড থাকা উচিত নয়। কোল্লম যতই নির্জন হোক না কেন, যতই মনোরম হোক না কেন। লোকেরা ক্ষেপেছে।

সেই ক্ষেপাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস বাতাস দূষিত করে তুলছে। তাঁর জীবন সংশয়। পৃথিবীর বুক থেকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্র চলেছে। কানাঘুষা শুনছে ওরা ক'দিন ধরে।

কৌতুকের হাসি মাথানো ঠোঁট দুটোয় কৌতুক উপচে পড়েছে আরো তীর্থরাজস্বামীর। বলেছেন, দক্ষিণ ভারতের এই জায়গাটাই বা এত ভালো লাগে কেন আমার, ভেবে কূলকিনারা পাইনে কোন। সব বুঝি সব জানি। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না তবু। হয়তো এখানেই মাটি কেনা আছে।

কি অলক্ষুণে কথাই না মুখ থেকে বেরিয়ে গেছল। সত্যি সত্যিই হতে চলেছে তা-ই। তিনদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। উত্তর দিকটা বাকি কেবল। তবে আগুনের যা গতি, এধারটাও জ্বলে উঠতে আর দেরী হবে না বেশী।

রঘুনাথন কালবিলম্ব না করে ভেতরের ঘরে এলো তাড়াতাড়ি। রাত বেশ গভীর হয়ে উঠেছে। তীর্থরাজস্বামী ঘুমোননি। কুশাসনের ওপর বসে আছেন। সামনে চালগুঁড়ির আলপনায় জলচৌকির ওপর 'শক্তি পঞ্চায়তন' যন্ত্র আঁকা। তার ওপর তামার পাতে খোদাই করা ওই একই যন্ত্রে দু'হাতের সব ক'টা আঙুল ঠেকিয়ে, গুন গুন করে স্তোত্রগান করছেন তীর্থরাজস্বামী। 'প্রাণাদি সংযোগবলা যোগিনী...।'

যন্ত্রের রেখায় রেখায় বিদ্যুতের চমক। তীর্থরাজস্বামীর দেহের তেজ যেন খেলা করছে ওখানে। তীর্থরাজস্বামী আর মন্ত্র অভিন্ন হয়ে গেছে। অভিন্ন করে রেখেছেন, অভিন্ন হয়ে আছেন মহাশক্তি যোগিনী সাধকের সাধনার আকর্ষণে নিজেই।

ঘরের এককোণে বসে আছে কিংকিনী। রঘুনাথনের আগে এসেছে জানতে। তীর্থরাজস্বামীকে এই অবস্থায় দেখে, বলি বলি করেও বলতে পারছে না। মুখে আটকাচ্ছে। ওর স্বর্গশান্তি ভেঙে যাবে। আর সে ভেঙে যাওয়ার হেতু হতে হবে শেষে কিংকিনীকেই। ইতস্ততঃ করছে। এ বিপদের কথা যে না বললেই নয়। প্রাণ থাকলে না সাধনা!

রঘুনাথনও বলতে এসে থমকে গেছে।

দুজনের কাউকেই কিছু বলতে হলো না।

বললেন তীর্থরাজস্বামী নিজেই। যেদিকটায় এখনো আগুন ধরেনি, ওখান দিয়ে তোমরা চলে যাও শিগ্গীর। আমারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দাও বললেই কি ছেড়ে দেয়া যায় নাকি? অন্ততঃ কিংকিনী তো প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারবে না! যে ব্যাপার ঘটছে তার জন্য দায়ী কিংকিনী, কারণ কিংকিনী। নিজের স্বার্থের জন্য এসেছে সে তীর্থরাজস্বামীর কাছে। নিঃশত্রু মহারাজের শত্রু সৃষ্টি করেছে।

প্রথম দিনে সইয়ের মর্মযাতনা জানিয়েছে। সইয়ের স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই একদম। বলতে গেলে স্বামীই সইয়ের মুখদর্শন করে না। অপয়া মুখ দেখলে নাকি তার দিন ভালো যায় না। সই যে অপয়া—এটা মাথায় ঢুকিয়েছে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এক তথাকথিত জ্যোতিষী। জ্যোতিষী বলেছে স্বামীকে—মেয়েদের জন্ম-ছকে রাজযোগকারক গ্রহ ভালো অবস্থায় না থাকলে, সে মেয়ের ভাগ্য পোড়া। তাকে যে বিয়ে করবে তার দুর্দশার আর অন্ত থাকবে না। সইয়ের নাকি অনেক দোষ রয়েছে। রাজযোগটা থাকলেও তবু রক্ষে ছিল।

বলে বলে বিষিয়ে দিয়েছে জ্যোতিষী স্বামীর মন। জুয়াতে হারছে স্ত্রীর ছকের জন্য। বুদ্ধিদোষে বিষয় নষ্ট অর্থকষ্ট—এসবের জন্যও দায়ী স্ত্রীর গ্রহচক্র। দুর্বলচিত্ত স্বামীর মনে স্ত্রী-আতংক বাসা বেঁধে বসল স্থায়ীভাবে।

পরিণতি যা হবার তা-ই হলো। স্বামী-স্ত্রীতে বিভিন্ন না হয়েও বিভিন্ন। মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

সদা-প্রফুল্ল তীর্থরাজস্বামীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। কি যেন কি ভাবলেন তিনি। তারপর একগাল হেসে বললেন, মানুষ নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ে তুলতে পারে অনায়াসে, একটু কষ্ট করলে, একটু চেষ্টা করলে।

প্রক্রিয়াটাও জানিয়েছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কেন্দ্র-কোণের অধিপতি গ্রহ রাজযোগকারক গ্রহ। লগ্ন, লগ্ন থেকে পঞ্চম ঘর আর নবম ঘর ত্রিকোণ। লগ্ন, লগ্ন থেকে চতুর্থ সপ্তম আর দশম ঘর কেন্দ্র। একই গ্রহ লগ্ন-ত্রিকোণের অধিপতি হয়ে ত্রিকোণ বা কেন্দ্রে থাকলে রাজযোগ। কেন্দ্র বিষ্ণুস্থান, ত্রিকোণ লক্ষ্মীস্থান। কেন্দ্র বিন্দু চিহ্ন। ত্রিকোণ ত্রিকোণই—তিনটি রেখার কোণে কোণে মিলন।

তন্ত্রে বিন্দু-ত্রিকোণের যোগ রাজযোগ।

ত্রিকোণের মধ্যিখানে বিন্দু। স্বামী নিজেকে চিন্তা করবে বিষ্ণুর প্রতীক। স্ত্রী চিন্তা করবে লক্ষ্মীর। স্বামী-স্ত্রী—বিষ্ণু-লক্ষ্মী। দু' জনে ত্রিকোণের মধ্যে, বিন্দুর সামনে পাশাপাশি বসে আছে। দুজনেই বাঁদিকের বুকে—ভেতরে—লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র 'হ্রীং হ্রাং শ্রীং শ্রীং' জপ করতে করতে ধ্যান করবে। নিয়ম করে রোজ। একান্ত মনে পারা যায় যতক্ষণ।

স্বামী-স্ত্রীর মিলন হবে আবার। রাজযোগের ফল ভোগ করবে ওরা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তীর্থরাজস্বামীকে প্রণাম করতে ভুলে গেছে একেবারে কিংকিনী। শুভ সংবাদ দিতে, অতল তলে ডোবা সইকে তীরে টেনে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়েছে গিয়ে সইয়ের বাড়িতে।

যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। তীর্থরাজস্বামীর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শুধু সইকেই একা আনে নি কিংকিনী, মহারাজের আদেশে স্বামীকেও ধরে এনেছে। তীর্থরাজস্বামীকে সঁপে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এ কাজ স্ত্রীকে করতে হবে যেমন চিন্তাভাবনায়, স্বামীকেও ঠিক একই রকম চিন্তাভাবনায় মন বসাতে হবে।

'যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধিলাভ।'

ওদের ত্রুটিহীন সাধনায় খুশী হয়েছে কিংকিনী। খুশী হয়েছে আরো ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে।

তন্ত্রক্রিয়ার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে নিজের কথা বলার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল কিংকিনী।

তীর্থরাজস্বামী লোকের মন বোঝেন। লোকের মনের কথা নিজের মনে শোনেন। তাই কিংকিনীর ভেতরটা হালকা করে ফেলার জন্য, ওর বিষয় বলতে বললেন।

নিঃসংকোচে বলল সমস্ত কিংকিনী। বলল না, যেন উজাড় করে ঢেলে দিল তীর্থরাজস্বামীর দু'পায়ে হৃদয়ের যত জমা গোপন কথা। একমাত্র লোক ইনিই, যিনি বিপদে ফেলবেন না, বরং উদ্ধারের পথ বাতলে দিয়ে অযাচিত করুণাই করবেন।

কিংকিনীর আশা সফল হয়েছে। তীর্থরাজস্বামী করুণা করেছেন। এ করুণার তুলনা মেলা ভার।

ঘরের মধ্যিখানে তিনথাকের মাটির বেদি। তার ওপর চৌকি, চৌকির ওপর তামার পাতের শক্তিপঞ্চায়তম চক্র। দু'পাশে পেতলের পিলসুজে পঞ্চমুখী পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। ঘিয়ে জবজবে এক একটা সল্‌তে এক একদিকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে জ্বলছে। শিখার আগুন কখনো স্থির হয়ে যাচ্ছে কখনো চঞ্চল হয়ে উঠছে। ঘরটার পরিবেশ একটা অপার্থিব।

তীর্থরাজস্বামী লালচন্দন আর কুমকুম মেশানো কালো পাথরবাটিতে

বেলপাতার বোঁটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে যন্ত্রের কোণে-মধ্যে ফোঁটা দিয়ে ইংগিতে দেখাতে লাগলেন। শিব-বিষ্ণু-সূর্য-গণেশ। চারকোণ হয়ে গেল। মাঝেরটি শক্তি। শুধু ফোঁটা নয়, নিম্নমুখী ত্রিকোণ আঁকলেন একটা। আঁকলেন না। বোঁটাটা খোদাইয়ের ওপর বুলিয়ে নিলেন। কিংকিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

এ হাসির তাৎপর্য বোঝে কিংকিনী। চক্রের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে তীর্থরাজস্বামী।

তন্ত্র সব শক্তির সমন্বয়। সব দেবতার সাধনাই তন্ত্রের শক্তিসাধনা। এ সাধনায় কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ভেদাভেদ নেই। আছে কেবল মিল। প্রাণে প্রাণে মিল, দেবতায় দেবতায় মিল।

সাধনায় নিজে নিজে আদেশ করতে হবে নিজেকে। সিদ্ধিদাতা গণেশ আমার দেবতা। যে কোন শুভ কাজে সিদ্ধির জন্য সংকল্প করব আমি, সে কাজের সিদ্ধি অনিবার্য। কোন বাধাই রুখতে পারবে না কোনক্রমে। সূর্য আমার দেবতা। সূর্যের তেজে জীবনীশক্তি ভরে থাকুক সদাসর্বদা। আমার তেজে ভীরুর মনে ভরসা ফিরে আসুক। আমার জ্ঞানের আলোয় লোকের অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচুক।

বিষ্ণু আমার দেবতা। সকলকে রক্ষে করার ক্ষমতা জেগে উঠুক আমার। জেগে উঠুক ন্যায়পালনের বিবেকবুদ্ধি। সব কিছুর মঙ্গল বেঁচে থাকুক। শিব আমার দেবতা। যা কিছু অন্যায় যা কিছু অশুভ যা কিছু প্রাণঘাতী—সমস্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক আমার মধ্যে থেকে। মহাশক্তি আমার দেবতা। আমি মহামিলন আমি মহাশক্তি। আমি সূর্য গণেশ বিষ্ণু শিব।

কিংকিনীর কানে বেজেছে বুকের স্পন্দনে নেচেছে কেবল একটা মাত্র শব্দ। সে শব্দ বড় মধুর—মহামিলন। মহামিলন নিয়ে আসবে কিংকিনী তার বংশে। রঘুনাথনের বংশে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর শাক্ত সম্প্রদায়ের ভেতরে কত পুরুষের বিচ্ছেদের পাঁচিল রেষারেষি-শত্রুতার ভিত ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বইবে শুধু মিলনের ঢেউ। বাতাস গাইবে মিলনের গান। মাটি গড়বে মিলন-প্রাসাদ।

কেনই বা এসব হবে না? তীর্থরাজস্বামী বলেছেন, নারী-পুরুষ যেখানে এক মন এক আত্মা, সেখানে যে সম্প্রদায়েরই হোক না দু'জনে, হোক না বৈষ্ণব, হোক না শাক্ত—বাধা কোথায় বিয়েতে? এমন নারী-পুরুষ তো নিজেরাই নিজেদের রাজযোগ সৃষ্টি করে ফেলতে পারে ভাগ্যচক্রে।

কিংকিনীর মন ভরে গেছে আনন্দে। প্রশ্নের সমাধান হয়েছে, পথেরও সন্ধান পেয়েছে। রঘুনাথন বৈষ্ণব—কি এসে যায়! সে শাক্ত—তাতেই বা কি!

গোড়া থেকেই বিয়ে করতে কোন আপত্তি ছিল না রঘুনাথনের। আপত্তি ছিল কিংকিনীর। তাকে নিয়ে অশান্তি ঘটুক—এটা চায় নি সে।

কিন্তু অশান্তি এড়ানো গেল না। বিয়ের সময় হয়নি বটে—তার কারণ একমাত্র রঘুনাথন। শুভ পরিণয়টা হয়ে যাওয়ার পর কিংকিনীকে মুখ খুলতে বলেছিল, তার আগে নয়। বিয়ে সমাধা হয়েছে তীর্থরাজস্বামীর সুমুখে—শক্তিপঞ্চায়তম চক্রের ঘরে।

দু'দিন চুপচাপ থাকতে বলেছিল রঘুনাথন, সেটা অবিশ্যি পারেনি কিংকিনী। কেন—চুরি করেছে, না ডাকাতি করেছে—না কোন অন্যায়-কর্ম করেছে? একদিন তো থেকেছে—এই যথেষ্ট। বলবে এবার। সকলকে ডেকে ডেকে বলবে। যে শুনতে চাইবে না, তার কানে মুখ রেখে, কানফাটানো চিৎকার করে বলবে।

বলার ফল ফলেছে। চতুর্দিক থেকে 'গেল গেল' রব উঠেছে। দু'পক্ষের—কনের বাপ আর বরের বাপ রেগে আগুন। যত আক্রোশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তীর্থরাজস্বামীর ওপর। পালের গোদাটা এতদিনের জিনিসকে ওলট-পালট করে দিতে বসেছে। ও বিষবৃক্ষ থাকলে সকলকে উচ্ছন্নে দেবে শেষ অবধি।

কিংকিনীর বোঝানো কেউ শোনেনি, রঘুনাথনেরও না। বুড়োরা বলেছে, বৈষ্ণব-শাক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে, ওদের মাথায় আর মাথা নেই। মাথা দুটি খেয়ে রেখেছে তীর্থরাজস্বামী সম্মোহন করে। অতএব তীর্থরাজস্বামীকে সরাতে হবে—সে যে ভাবেই হোক। যদি কেউ বাধা দিতে আসে, সে যেন প্রাণের মায়া না রেখে আসে।

অনেকের মনও আছে, বিবেকও আছে। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। তীর্থরাজস্বামী দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে না দিলে, দুটো প্রাণ একসঙ্গে হারিয়ে যেত যে দুনিয়া থেকে। মানুষটার দোষ এমন কোথায়? এদের কানে ষড়যন্ত্রের কথা পৌঁছেছে। তখুনি খবর দিয়ে সাবধান করেছে তীর্থরাজ-স্বামীকে। চলে যেতে বলেছে অন্য কোথাও।

তীর্থরাজস্বামী জানিয়েছেন, যাবেন না। যারা আজ ভুল বুঝছে, তারা একদিন সত্যি জিনিষটা বুঝবে।

তীর্থরাজস্বামীর যে রকম জিদ, এক পা-ও নড়বেন না উনি। রয়ে গেছে কিংকিনী-রঘুনাথন ওঁরই ডেরায়। ওঁকে একা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।

দিনচারেক আর কোন কথা কানে আসে নি। কিংকিনী ভেবেছে, ভুল ভেঙেছে হয়তো ওদের। যেটুকু রটেছিল, ওটা স্রেফ ভয় দেখানোরই জন্য। দেখা যাচ্ছে তা নয়। ওরা তৈরী হচ্ছিল একটা নৃশংস আক্রমণের জন্য।

আগুনের গতি দ্রুত হয়ে উঠছে। কিংকিনীর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকটায়ও আগুন এসে পড়ল বুঝি। এদিকে তীর্থরাজস্বামী তাদের চলে যেতে বলেছেন ওঁরটা ওঁর ওপরই ছেড়ে দিয়ে! সে কেমন করে হয়? তীর্থরাজস্বামীর যে অমূল্য জীবন। বরং তারা দু'জনে গিয়ে সবার সামনে বলবে, উনি নির্দোষ। ওঁর কিছু কোরো না কেউ। আমাদের বিয়ে পছন্দ না হয়, আমরা এ বিয়ে নাকচ করে ফেলছি নিজেরাই।

আর অপেক্ষা না করে, রঘুনাথনের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে কিংকিনী। উত্তর দিকটায় ভরে গেছে বাছাই করা লোকের মুখে মুখে। অন্ধকার গলির নাম-করা গুণ্ডা সব ক'টা। কারো হাতে টাঙি কারো হাতে লাঠি। তীর্থরাজস্বামী ওদের বিপদ আঁচ করেই বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি।

এগিয়ে আসছে দুর্বৃত্তরা টাঙি হাতে নিয়ে। কিংকিনীর কথা শুনল না। রঘুনাথনের কথা শুনতে চাইল না। এসে পড়েছে একেবারে মুখোমুখি। দুজনের দিকে চকচকে ধারালো টাঙি উঁচিয়েছে দু'জনে। সামনে গিয়ে দু'হাতে আটকাতে চেষ্টা করলেন তীর্থরাজস্বামী কিংকিনী-রঘুনাথনকে বাঁচানোর জন্য।

বাঁচল কিংকিনী, বাঁচল রঘুনাথন। কিন্তু—জায়গাটা ভিজে যেতে লাগল তীর্থরাজস্বামীর তাজা লাল রক্তে।

একনাগাড়ে গড় গড় করে বলে রঘুনাথন দম নিচ্ছে। দৃষ্টি তীর্থরাজস্বামীর দিকে। ওঁর ঠোঁটে শিশুর হাসি। একটা কম্বলের ওপর বসে আছেন দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে। পায়ের কাছে বসে কিংকিনী। হাসি হাসি মুখ। পায়ের পাতায় হাত বুলাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটা লাল রঙের চাদর তীর্থরাজস্বামীর গায়ে জড়ানো পরিপাটি করে।

সদানন্দময় পুরুষ। নির্বিকার চিত্তের এই মানুষকে দেখে মনে হয় না দেহের কোনখানে এক সময় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন।

উঠল রঘুনাথন। তীর্থরাজস্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল। জড়ানো চাদরটা খুলতে আমি চমকে উঠলুম, শিউরে উঠলুম। দুটো হাতই কনুই অবধি সেলাই

করা। উনি একবার কিংকিনী আর একবার রঘুনাথনের দিকে চেয়ে জোরে হেসে উঠলেন।

আমি দেখলুম ওঁর মনের হাত খোয়া যায়নি যেমন তেমনি বাইরেরও যায়নি। উনি এখন চতুর্ভুজ। ডানদিকে দুটো, বাঁদিকে দুটো। ডানদিকে কিংকিনীর দু'হাত আর বাঁদিকে রঘুনাথনের।

জমাট অন্ধকারে চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে অস্পষ্ট কিছু দেখা নয় কিন্তু এটা। দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখার মতনই দেখা। আগে থেকে যা যা শুনেছিলুম, দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব মিলিয়ে নেয়া উচিত ছিল। চোখ নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়াও উচিত ছিল অন্ততঃ। দু-দুটো উচিতের মধ্যে কোন উচিতই মাথায় ছিল না আমার। কর্পূরের মতন উবে গেছল কোথায় কে জানে।

মাঠকোঠার দোতলায় কোণের ঘরে বসে আছি আমি। দরজা খোলা। সামনা-সামনি ওদিকের কোণের ঘরটারও দরজা খোলা। সারা বাড়ির সব ঘরের সব দরজাই বন্ধ। ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা। খোলা স্রেফ দুটোর। আমার আর ওদিকের। এ দুটো ইচ্ছে করেই খোলা রাখা। আমি একটা অবাধ্য কৌতূহলের বশে খোলা রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর ওদিকের? নিশুতি রাতে একজনের আসার প্রতীক্ষায়।

ও-ঘরে কেশর সিং একা। ওর কাছে এ সময় কারো থাকা নিষেধ নাকি। ওর প্রতীক্ষা সফল হয়। যে আসার সে নিয়ম করে ঠিক সময়ই আসছে। দিন চারেক এ-বাড়ির অতিথি হয়ে আছি আমি। দিন চারেক ধরেই একই দৃশ্য দেখছি। কৌতূহল মেটা তো দূরের কথা, বেড়েই চলেছে আরো। শুধু কৌতূহলই নয়, মাথার ভেতর তালগোল পাকাচ্ছে অনেক কথা—যে আসে তার সম্বন্ধে।

অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে একটি নারীমূর্তি। ঘরে ঢুকে ভেতরে থাকে খানিক। তারপর বেরিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে। বাড়ির কর্তা সজন সিংয়ের নিষেধ।

কারো চোখে কোনদিন ওই নারীমূর্তি পড়লে, কেউ যেন না অনুসরণ করতে উৎসুক হয়। অনুসরণ করলে তার সমূহ বিপদ। নারীমূর্তি ক্ষমা করলেও সজন সিং ক্ষমা করবে না কাউকে তাহলে। চারপাইয়ের ওপর মাথার বালিশের তলা থেকে চকচকে ধারালো তলোয়ারটা বার করে মাথায় ছুঁইয়ে চুমু খেয়ে বলেছে, এইটাই পড়বে তার ঘাড়ে।

ঘাড়ের মায়ার জন্যও নয়, প্রাণের জন্যও নয়। আমি অনুসরণ করি নি শুধু সজন সিংয়ের মুখ চেয়ে। সজন সিং বলেছিল ওরও মহা ক্ষতি হয়ে যাবে। যে ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না কেউ কখনো কারো জীবন দিয়েও। এসব কথায় রহস্যটা ঘন হয়েই ওঠে বেশী করে। নারীমূর্তিটি খুব সহজেই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে আমার কাছে তা-ই।

প্রতিরাতে সতরঞ্চি পাতা চারপাইয়ের ওপর বসে বসে আমি দেখি আর ভাবি রহস্যময়ীর সুনয়নী নামটা কেন হয়েছিল কাছে গিয়ে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে নিই। কিন্তু তা হবার নয়। সজন সিংয়ের মুখে শুনেছি ওর আরো একটা নাম আছে। সে-নামের তাৎপর্য বুঝতে যাওয়া আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়। একটা নিগূঢ় রহস্যলোকের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদের মুখে গিয়ে নাজেহাল হওয়া।

ডাঙ্গো গ্রামের অনেকেই বলেছে আমায় সুনয়না আসলে ডাইনী। জাদুকরীও বটে। ওর দু'চোখের দিকে তাকায় না কেউ। তাকালে, সে আর সে থাকে না। অর্থাৎ মানুষের মতন আকারটা যদিও বা থাকে, থাকলেও মানুষ থাকে না সে—বুদ্ধিতে-সুদ্ধিতে কোন কিছুতেই না। বিবেকহীন একটা জড়পদার্থ হয়ে যায় যেন। জড়পদার্থটা সুনয়নীর কথায় ওঠে কথায় বসে কথায় ঘুমোয় কথায় চলে। এইভাবে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে মাটি নেয় একদিন। এটা সুনয়নীর নির্দয় হৃদয়ের পৈশাচিক খেলা। কত না আনন্দ পায় সে এতে।

ডাইনী বিদ্যে রপ্ত করেছে সুনয়নী। ওর রাতের অভিসার বুঝতে পারলেও মুখ খোলার উপায় নেই কারো। কে জানে শয়তানী না রেগে-মেগে কোন স্ত্রীর স্বামীর ঘাড়ে চেপে বসে তাদের সংসারটাকে ছারে-খারে না দেয় আবার। দেশে দেশে ঘুরে কত মানুষকে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিয়েছে ভালো পথ থেকে ওর জাদুর মায়ায় সরিয়ে দিয়ে, ওর ডাইনী বিদ্যের প্রভাব খাটিয়ে। কত সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে তার লেখাজোখা না থাকলেও রকম-সকমে বুঝতে পারে সবাই। তা না হলে দেশে দেশে ঘুরে মরে কেন? বিতাড়িত হয়ে হয়েই ঘুরছে।

পুরুষরা এত সব শুনেও কিন্তু আগন্তুকের কাছে সুনয়নীর একটা বিষয়ে প্রশংসা না করে পারে না। সেটা রূপের। স্ত্রীদের সামনেই বলে, সুনয়নী যা-ই হোক তা-ই হোক—ওর ওপর কিন্তু বিধাতার অপার করুণা। ওকে তিলে তিলে রূপ ঢেলে দিয়ে বিধাতা তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছে। নিখুঁত সুন্দরী। প্রতিবাদ করেছে স্ত্রীরা—ওটা ওর প্রকৃত রূপ নয় মোটে। হলপ করে বলতে পারা যায়। পুরুষের চোখে মোহবিস্তার করে, দৃষ্টিভ্রম করে দেয় ও ওই রকম। ওই রকম করেই ধোঁকা দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। সুনয়নী দেখতে ঠিক রাক্ষুসীর মতন। দেখলে, হৃৎকম্প—হৃৎপিণ্ড অচল! এমন মিশমিশে কালো রঙ যে, অন্ধকারে দাঁড়ালে, টের পাওয়া যায় না। কালোয় কালো মিশে যায়।

পাঞ্জাবে এসে, ডাঙো গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে কথাগুলো কানে এসেছিল আমার। সুনয়নীকে দেখে কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলা খেয়েছি ভেতরে। অন্ধকারে মিশে যেতে দেখি নি। বরং অন্ধকারের বুক চিরে চিরে একটা জ্বলজ্বলে মূর্তিকে যাতায়াত করতে দেখেছি। দেখেছি তিন দিন ধরে। চতুর্থ দিনের দিন দেখেছি আবার নতুন করে পুরনো দৃশ্য।

লোকের কথা আর দেখা—আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অনেক শোনা কথা মনে এমন গেঁথে বসে যে প্রমাণের ধারালো শক্ত ছেনি দিয়ে কেটে-চেঁচে সে-সব অক্ষর তুলে দিতে চেষ্টা করেও সহজে তোলা যায় না, মোছা যায় না। এ-ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। প্রমাণ পেয়েও সংশয় গেল না আমার। কেবলি মনে হতে লাগল, সুনয়নী কি সত্যিই মায়া জানে? এটা রূপের নিকেল ছাড়া অন্য কিছু নয় হয়তো। অন্ধকারে রূপের জেল্লাও চেনা যায়, দেখা যায় মানুষকে—এমন তো দেখি নি কোনদিন।

কেউ কেউ বলেছে, সুনয়নী বলে কোন একটি তরুণী কোন সময় সত্যি সত্যিই ছিল হয়তো। ডাইনী সাধনায় অপদেবতার খেলা যত সব। আসল সুনয়নীর প্রাণটাকে কোন এক অপদেবতা মুঠোয় পুরে, ওর মৃতদেহে আশ্রয় করেছে নিজে। সেই অপদেবতাই ওই শরীরে খেলা করে বেড়ায়। নানা রকম ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায়। সময়-অসময় যখন যেমন মনে করে, তখন তেমন রূপ ধরে দেখা দেয়। তা-ই এক এক জন এক এক রূপে দেখে।

এসবও মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারছে আমার। কে জানে সুনয়নীর এটা রক্তমাংসের শরীর না-ও হতে পারে। অশরীরীর শরীর। অন্ধকারে জ্বলে জ্বলে উঠছে তা-ই। কেশর সিং ওকে কাছে পায়, কি দেখে, কেমন

দেখে—ওই। কিচ্ছু বলে না। চুপচাপ একেবারে। সব কথা কয়, কিন্তু সুনয়নীর কথা উঠলেই মৃদু হেসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ও চোখের চাউনি দেখে বোঝা যায় না কিছু। কোন ভাষায় কথা বলছে কি না।

এ ব্যাপারে সুনয়নীকে যেমন রহস্যময়ী নারী মনে হয়েছে আমার, তেমনি কেশর সিংয়ের হাসি চাউনিটাও রহস্যে ভরা মনে হয়েছে। এ রহস্যের তলকূল খুঁজে পাইনি আমি বিচিত্র-বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা বিচিত্র-রূপিণী সুনয়নীকে চিন্তা-ভাবনায় বিশ্লেষণ করে করেও।

সজন সিং আমায় বলেছে, সুনয়না আজকের রাত অবধিই আসবে এ কুঠীতে। তারপর আর আসবে না। এ গ্রামেও না।

এসেছে সুনয়নী।

গভীর রাত। কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালো ছায়া বাড়িটাকে পাড়াটাকে গাঁওটাকে ঢেকে ফেলেছে। জ্যোৎস্নার ছিটেফোঁটা খেয়ে মুছে নিঃশেষ করে ফেলেছে। বাইরের শিষম গাছগুলো যেন সাক্ষাৎ এক একটা প্রেতের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। নাগকেশর ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে ঘরটা।

নিজের কাছে নিজেকেই আশ্চয ঠেকেছে আমার। দুটো ভাব ঘিরে ধরছে আমায়। একটা ভয়ঙ্কর একটা সুন্দর। একটা ভয় একটা আনন্দ।

এখানে আসার দিন কয়েক আগে।

তখন শুক্লপক্ষ চলছিল। মরা চাঁদের মরা জ্যোৎস্না। তা হোক, স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় টান ধরেনি কোন। সুগন্ধী ফুলের মধ্যে বিষাক্ত কীটও আত্ম-গোপন করে থাকে। স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়ও আশপাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল একদল রূঢ নিষ্ঠুর দানব। সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে পথযাত্রার ওপর। এদের কীর্তিকলাপের কথা গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার হয়ে গেছে। এরা লুটেরা, এরা খুনী, এরা যে কোন নারীর মানসম্ভ্রম হানি করতে এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করে না। পেপসু থেকে তাড়া খেয়ে খেয়ে এদিকে ওদিকে এসে জুটেছে এই দুর্ধর্ষেরা। দেশ-ঘরের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে এরা। এদের ভয়ে দল বেঁধে বেরোনো ছাড়া বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না কেউ একা। দিনে এই অবস্থা, রাতের তো কোন কথাই ওঠে না।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল রাতেই। তা-ও আবার রাতদুপুরে।

বাতাসে থপ থপ আওয়াজ উঠছে। উটের পা ফেলার আওয়াজ। উটের পিঠে চেপে রায়কোট থেকে আসছে এ গাঁয়ে সুনয়নী। আসছে সজন

সিংয়েরই অনুরোধে কেশর সিংয়ের জন্য। সঙ্গে লোক দেবো বলেছিল সজন সিং, রাতে আসতে মানাও করেছিল। সুনয়না বলেছিল, আমি যেটা ভালো বুঝব, যেটায় সুবিধে হবে, তা-ই করব। সুনয়না তা-ই করেছেও।

দু'দিকে দু'সারি ঘন নাগকেশর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যিখানের পথটাই বেছে নিয়েছে সুনয়না। উটের পিঠে চলছে একা। দূরে দূরে এক একটা গাঁও ঘুমের ঘোরে মগ্ন। সুনয়নার চোখে ঘুম নেই, বুকে ভয় নেই, মুখে উদ্বেগ নেই। নিজের রূপে নিজে আলো করেই চলেছে। মরা জ্যোৎস্নায় ও যেন একটা পূর্ণ-জ্যোৎস্না।

এই শুভ্র জ্যোৎস্নায় কালো বিষ ঢেলে দেবার জন্য এগিয়ে এলো কালো কালো চেহারার যমদূতেরা। উটটাকে ঘিরে ফেলল গোল করে। ওদের মধ্যের সর্দার গোছের লোকটা উট থেকে নেমে আসতে বলল সুনয়নাকে। লোকটার কর্কশ-কণ্ঠের আদেশে কোন কর্ণপাত করে নি সুনয়না। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যেমন এগোচ্ছিল, তেমনি এগোতে লাগল। উট থামাল না।

কিন্তু আশ্চর্য! ওরা কেউ জোরজবরদস্তি করে সুনয়নাকে নামাবার চেষ্টা করল না। যাওয়ায় বাধাও দিল না। ফিরে তাকালও না কেউ। যেমন দাঁড়িয়েছিল যে যেভাবে সে সেইভাবে পাথরমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ওরা যেন মৃত নিষ্প্রাণ।

এ-ও কি সম্ভব? ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে হবে?

হ্যাঁ। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে সজন সিং। বলেছে, অত রাত্তিরে অক্ষত দেহে সুনয়না এলো কি করে আমার বাড়িতে? এটুকু জানবে, অসামান্য শক্তি ধরে ওই মেয়ে। এরপর সুনয়নার অসামান্য শক্তি অর্জনের গোপন কথা শোনাতে বসে শুনিয়েছে আমায় ওর জন্মবৃত্তান্ত। শুনিয়েছে ওর যুবতী জীবনের কাহিনী। আর শুনিয়েছে এখানে—সজন সিংয়ের বাড়িতে আসার কারণ।

সুনয়না নামটা ওর মায়ের দেয়া নয়, বাপের দেয়া। বাপের নয়নের মণি ছিল যেমন সুনয়না, তেমনি মায়ের দু'চক্ষের বিষ ছিল। ফাঁক পেলেই মাথায় খুন চাপত। মেয়েটাকে একা দেখলেই দু'হাত নিশপিশ করে উঠত শেষ করে ফেলার জন্য।

এমনি মনোভাব এসেছে একদিন, ঘুমন্ত মেয়েটার দো-লনার দিকে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। দোলনার কাছেও এসে পড়েছিল। দুটো হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিল দু' বছরের শিশুর কচি গলা লক্ষ্য করে। হঠাৎ ঘরে বাজ পড়ার মতন একটা শব্দ শুনল যেন। চমকে উঠে হাত দুটো সরিয়ে নিল। দুরু দুরু

কাঁপছে বুকটা। 'মা-মা' বলে কে যেন ডাকছে বাইরে। অচেনা গলা। ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এ ডাক এমন, নিচে টেনে নিয়ে এলো তাকে। দরজা খুলে, সম্মোহিতের মতন তাকিয়ে রইল যার দিকে—সে একজন সন্ন্যাসী-পরিব্রাজক। পশ্চিম থেকে এসেছে বাংলাদেশে। ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে বেড়ায় গ্রামে-শহরে। হুগলীর আঁটপুর গ্রামেও এসেছে পশ্চিমে যাবার পাথেয় যোগাড় করার জন্য।

মা মণিমালা ভাবল তার ভেতরের ব্যাপারটা জানতে পেরে, স্বয়ং অন্তর্যামী ভগবানই সন্ন্যাসীর বেশ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুই লুকোয়নি মণিমালা সন্ন্যাসীর কাছে। প্রকাশ করেছে সমস্ত। তার রূপের আগুন দূর থেকে আকর্ষণ করে টেনেছে এক কামনা-কাতর মানুষকে। সে-মানুষ স্বামী-কন্যা নিয়ে সুখে-সংভাবে ঘর করতে দেয়নি মণিমালাকে। লোকবলে প্রতিপত্তিতে বড়। হিংস্র বন্যপশুর মতন যে-সব স্যাঙাৎদের পালন-পোষণ করে এসেছে বরাবর, তাদের দিয়েই ভোগের বস্তু হিসাবে স্বামীর বুক থেকে ককিয়ে কেঁদে ওঠা বাচ্চা মেয়ের নরম হাতে আঁচল ধরা থেকে নির্জন-নিশুতি রাতে ছিনিয়ে আনিয়েছে যে—সে-ই সুনয়নীর বাবা।

মণিমালার কলঙ্কের প্রমাণ সুনয়নী। ওকে সহ্য করতে চেষ্টা করেও পারেনি মণিমালা। তার চেয়েও রূপের ডালি নিয়ে জন্মেছে ও। রূপ দেখে জ্বলেনি সে। বরং মমতা আসে। এ ঘরে থাকলে, তার কাছে থাকলে, ভবিষ্যতে তারই মতন দুর্গতি হবে হয়তো মেয়েটার। ভাবলে, মাথাটার ভেতর যেন কেমন করে ওঠে। মনে হয়, ওর মঙ্গলের জন্যই ও সরে যাক পৃথিবী থেকে। মণিমালা নিজেই সরিয়ে দিক। সরিয়ে দিক সরিয়ে দিক।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে মণিমালা সন্ন্যাসীর দু'পা জড়িয়ে ধরে। মেয়েটাকে আশ্রয় দিতে হবেই তাকে। সন্ন্যাসীর আপত্তিতে বলেছে, সন্ন্যাসী হলেই বা। কণ্বমুনি কি শকুন্তলাকে আশ্রয় দেয়নি? মানুষ করে তোলেনি।

কি যেন কি চিন্তা করল সন্ন্যাসী। কয়েক মুহূর্ত। তারপর গ্রহণ করল সুনয়নীকে। নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলল মণিমালা।

সুনয়নীকে মানুষ করে তোলার ভার দিয়েছিল সন্ন্যাসী গুরুবোন হিমাচলের তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শিনী সন্ন্যাসিনী বিমলপ্রভার ওপর। নিজের মতন করে গড়ে তুলেছে বিমলপ্রভা সুনয়নীকে। মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। চামড়াটাকে নয়। ভেতরের শক্তিটাকে। যে শক্তির অভাবে মানুষ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে—সেই অদৃশ্য শক্তিকে।

'তন্ত্র' কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। তন্+ত্র=তন্ত্র। যে শাস্ত্রের ক্রিয়া ত্রাণ করে তনুকে। সাধনায় সংসারের ধর্ম নানা দুর্ভোগ-যন্ত্রণায় ভরা প্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে ভেতরের শক্তির পরশে। স্ত্রী-পুরুষ আকারের মধ্যে থেকেও শক্তি স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়। নিরাকার, নির্বিকার। মনের চোখে বাইরের চোখে দেখার বস্তুও নয়। মহানন্দের উৎস অদৃশ্য-শক্তি।

স্মৃতির পরদায় আর অনুভূতির পরতে পরতে এই অদৃশ্য-শক্তিকে জাগিয়ে রাখার সাধনায় মানুষের ভেতরের পশুপ্রবৃত্তি—উগ্র কামনা-বাসনার পরাজয় ঘটে। এ সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিল সুনয়নী সদাসর্বদা অনুশীলন করে করে। যৌবনে যুবকের চোখে চোখ পড়তে ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে যখুনি, তখুনি বিমলপ্রভার নির্দেশমতন কাজ করেছে। কঙ্কালের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কঙ্কালই যুবকের চামড়ার তলায়, নিজের চামড়ার তলায়ও। দুটো কঙ্কালেই চামড়ার স্ত্রী-পুরুষ ভেদের লক্ষণ নেই কোন। দেহের রক্তমাংসের ক্রিয়াটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে চিন্তা করতে করতে। অনুভূতিতে জেগে উঠেছে একটা কামনা-সাধনাহীন অদৃশ্য ছোঁয়ার অব্যক্ত আনন্দ।

মানুষ দেখলে এই আনন্দই ভরভর্তি হয়ে ওঠে সুনয়নীর ভেতরে। সেই আনন্দ ওর চোখ দিয়ে প্রতি রোমকূপ দিয়ে ঠিকরে ঠিকরে বেরোয় জ্যোতির মতন। সেই জ্যোতিতে ও অন্ধকারেও আলোর মানুষ হয়ে ওঠে। অসুস্থ-অশান্ত-কামনাজর্জর মানুষ ওর আওতায় ওর স্পর্শে সুস্থ-শান্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে।

কেশর সিংয়ের শরীর-মন দুই-ই অসুস্থ। ডাক্তার-বদ্যিরা হার মেনেছে। ছেলের জন্য সজন সিং করতে আর কিছু বাকি রাখেনি। সুনয়নীকেও আ নিয়েছে রায়কোটে আসার খবর পেয়ে। দিনে আসতে চায়নি সুনয়নী। গহিন রাতে নিস্তব্ধ পৃথিবীতে অদৃশ্য-শক্তির উপলব্ধি হয় তার বেশী করে।

নিজের ভেতরে সত্যি জানার অসীম আনন্দ অপরের অন্তরে ঢেলে দিয়ে দিয়ে তাকে নীরোগ-কামনাজয়ী করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছেন বলে, বিমলপ্রভাই সুনয়নীর সন্ন্যাস নামকরণ করেছে অসীমপ্রভা।

এত সব জানি বলে, আর তা ছাড়া কেশর সিংও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল দেখে, যেমন আমার আনন্দ—আর সুনয়নীর অসীমপ্রভা নামের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠেছে, তেমনি আবার গাঁয়ের অবুঝ লোকের কথাগুলো মনে খোঁচা মারছে। অসীমপ্রভার সুনয়নীর নামটার ওপর ভয় ধরাচ্ছে।

আমার মনের দুটো ভাবধারা বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লায় দু'দিকে ঝুলছে।

সুন্দরের দিকে আনন্দের কোলে, আর ভয়ঙ্করের দিকে ভয়ের পায়ের তলায়। দুটো সমান সমান। কোন্‌টা ভারী হয়ে বেশী ঝুলে পড়ে সেটাই লক্ষ্য করছি আমি সচেতন হয়ে।

রাত পোহাল।

আকাশ সাদা একেবারে। কালোর লেশমাত্র নেই। কেশর সিংয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুনয়নী। মুখে হাসির ঢল নেমেছে। কিশোর কেশর সিংও হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। সজন সিং এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। মাথা নিচু করে সুনয়নীর দু'পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, পা সরিয়ে নিল সুনয়নী। আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় কেশর সিং আর সুনয়নীকে দেখিয়ে বলল, মা অসীমপ্রভা সারেয়াঁদি জিন্দগী দি জিন্দগী হ্যাঁয়··। মা অসীমপ্রভা সকলের জীবনের জীবন। শক্তির সাধনায় শক্তিময়ী হয়ে উঠেছে নিজে।

আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। বারান্দায় যেন সূর্য উদয় হচ্ছে। সে সূর্য অসীমপ্রভা নিজেই। আমার বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লায় সুন্দরের দিকে আনন্দের কোলে ভাবধারাটাই বেশী ভারী হয়ে উঠছে। বেশী ঝুলে পড়ছে।

ভেতরটায় শুধু আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠছে। সজন সিংয়ের কথা বাতাস গুন্‌ গুন্‌ করে গেয়ে শোনাচ্ছে আমার কানে কানে।—মা অসীমপ্রভা সারেয়াঁদি জিন্দগী দি জিন্দগী হ্যাঁয়···শক্তির সাধনায় শক্তিময়ী হয়ে উঠেছে নিজে···।

মানুষ ঠিক পথে চলুক—কারো মনের এই সৎ-ইচ্ছেটা অন্য মনে প্রভাব বিস্তার করে কি? অনেকের মনে করে না। যারা নিজেদের সুখ-সুবিধে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত দিনরাত, যারা উন্মত্ত বাসনার তাড়নায় অস্থির, তাদের অন্ধ বধির মনের কাছে সৎ ইচ্ছের আবেদন ··গিয়ে গিয়েও নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসতে বাধ্য হয় সৎ-ইচ্ছের প্রবেশের পথে তাদের মনের আগল বন্ধ দেখে।

এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল আমার ললিতমোহনের মুখে তার অতীত

জীবনের সাধনকাণ্ডের কথা শুনে। সে সব রোমহর্ষক কাহিনী। অপ্রিয় ভয়াবহ ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলেও অনেক ক্ষেত্রে মোছা যায় না। গভীর দাগ কেটে বসে থাকে। সময় সময় সেই দাগগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে যেন। ঘটনার এক এক একটা দৃশ্য ভিড় করে করে ঘুরতে থাকে চতুর্দিকে।

ললিতমোহনের আগেকার ঘটনা ঘিরে ধরছে আমাকে পাহাড়ের ওপর—চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরের সামনে। কেন ঘিরে ধরছে—তার কারণও আছে যথেষ্ট। যে দৃশ্য দেখছি আমি চোখের সামনে, তাকে অস্বীকার করা যায় না, অবিশ্বাস করা যায় না। ললিতমোহনের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।

বেশিক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা আর যুক্তি-সঙ্গত হবে না মোটে আমার পক্ষে। সাধনার নাম দিয়ে যা অনুষ্ঠান চলছে, ক্রিয়াকলাপের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে, নির্মম মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না বুঝি ললিতমোহন। ললিতমোহনের এ সাধনা প্রাণঘাতী!

হয়তো ওর এইটাই নিয়তি। তা না হলে ছোটবেলা থেকে তন্ত্রসাধনার দিকে এত ঝোঁক কেন ওর? বাড়ির বারণ বন্ধুদের বারণ—কারো কোন কথা কানে তোলেনি। তন্ত্ররহস্য ওকে আকর্ষণ করে সর্বক্ষণ। খেয়ে ঘুমিয়ে একটুও সুখ নেই ওর। এ শাস্ত্রটার অজ্ঞাত রহস্যভেদ না করতে পারলে, মরেও শান্তি পাবে না ও।

সাধনা করার মরণ-নেশা ছুটিয়েছে ওকে এদেশে-ওদেশে—এর কাছে ওর কাছে। ফল হয়নি কিছু, হয়রানই হয়েছে শুধু। গুরু খুঁজে খুঁজে সদ্গুরু পায়নি। সাধনার তত্ত্ব খুঁজে খুঁজে আসলে পৌছতে পারেনি। তবু হাল ছাড়েনি। চেষ্টার তরী ডুবু ডুবু হয়েছে বহুবার। নাকানি-চুবানিও খেয়েছে সেই সঙ্গে। শিক্ষা কিন্তু হয়নি, হলো না। গ্রামের বিথারী শ্মশানে একবার জ্বলন্ত চিতার ওপর জ্যান্ত জ্বলে মরার যোগাড় হয়েছিল এক উগ্র কাপালিকের পাল্লায় পড়ে। মরতে মরতে প্রাণে বেঁচে গেছল খুব সে-যাত্রা।

ও-রকম অভিজ্ঞতার পরও আবার মৃত্যুফাঁদে পা দিল। এবারে সদ্গুরু পাওয়া গেছে। মানুষ দেখে শেখে, ঠেকে শেখে। এই দু'জাতের মানুষের মধ্যে পড়ে না ললিতমোহন। সদ্গুরু সৌম্যদর্শন। তাঁর মধুর বচনে মুগ্ধ ও। এমনি প্রাণের টান যে ঘর-ছাড়া দেশত্যাগী হতে হয়েছে। হিমালয়ের কোলে উপস্থিত হতে হয়েছে শেষ অবধি।

মহান গুরু অসীমানন্দকে দেখবার জন্য, তন্ত্রসাধনার গুপ্ত ক্রিয়া দেখাবার জন্য, আমাকে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই টেনে এনেছে ও এখানে।

প্রথম দর্শনে অসীমানন্দকে ভালো লেগেছে আমার। এ সত্য স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমার। ওর দু'চোখের দিকে তাকিয়ে আমিও যেন কেমন হয়ে গেছলুম। অতি আপন জনকে কত যুগ বাদে ফিরে পেয়েছিলুম যেন নিজের কাছে। কেবলি উত্তরপ্রদেশের সাধু চেনার প্রবচনটি আমার কানে ঘুরে ফিরে বেজেছে। যোগী রোগী ভোগী জান, আঁখ হি নিশান আউর আঁখসে পয়ছান। চোখ দেখেই চেনা যায় যোগী রুগী না ভোগী। অসীমানন্দের চোখ কেমন—ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। দেখে মনে হয়েছে আমার সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়। সুন্দরের চেয়েও সুন্দর। এ যুগল চোখ হয়তো কোন দেবলোকের কোন দেবতার। চোখ দেখে যখন আমারই এই দশা, তখন সাধনা-পাগল ললিতমোহনের মৃত্যুফাঁদে পা দিয়ে ফেলার অপরাধটাই বা কোথায়। একা ওর দোষ দেওয়াটা বৃথা।

অসামানন্দের চোখের জাদুতে আত্মবিস্মৃত হয়েছি আমরা! ওই চোখের আড়ালে নরখাদকের চোখ লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করছে ললিতমোহনের তাজা রক্ত শুষে নেবার জন্য—এটা খেয়াল করিনি দুজনের কেউই। এখন মরণের মুখে এগিয়ে চলার সময়ও হুঁশ হচ্ছে না ললিতমোহনের একটুও। ও যেন আরো অসীমানন্দের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে।

সাধনার অনুষ্ঠান দেখে মনে যেন কোনরকম সংশয় উপস্থিত না হয়, হলে সাধনা পণ্ড। নিষেধের মোক্ষম মন্ত্রে মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছেন অসীমানন্দ আগে থেকেই। যা দেখছি, তাতে এ কুলুপ মনের জোরের এক হ্যাচকা টানে টেনে খুলে ফেলতে হবে। চিৎকার করে লোক জড়ো না করতে পারলে, ললিতমোহনকে নরবলি হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

অসীমানন্দের সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে ললিতমোহন। লাল কাপড়ে দু'চোখ বাঁধা। এক ফের দু ফের তিন ফের দিয়ে বেঁধেছেন অসীমানন্দ। উনি পাকা শিকারী। পুরু করে শক্ত করে বেঁধেছেন। যাতে ওঁর হাতের শিকার পালিয়ে রেহাই না পায়। লাল কাপড়টায় গিঁটের পর গিঁট দিয়ে ললিতমোহনের নিজে হাতে খোলার দফা-রফা করে রেখেছেন। চোখ থেকেও চোখ নেই ললিতমোহনের। দৃষ্টি থেকেও দৃষ্টি নেই। অন্ধ। পালাবে কেমন করে? ললিতমোহনের বুকের ওপর ধারালো ত্রিশূলটা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

বাঁদিকটায় স্থির দৃষ্টি ওঁর। মন্ত্র-শ্লোক আওড়ানোর সংখ্যা ধরে সজোরে বিঁধিয়ে দেবার ক্ষণ গুণে চলছেন বোধহয়।

মিষ্টি কথার ভেতর যে মারাত্মক বিষ ছিল, সুন্দর চেহারার ভেতর যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছিল, অসীমানন্দের সঙ্গে পাহাড়ী পথ চলতে চলতে মনে হয়নি একবারের জন্যও। পালমপুর থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল মালাউ। মালাউ থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বানগঙ্গা নদীর পুল অবধি এসে পৌছলুম যখন, তখনও মনে-দেহে একটা নতুন স্বাদের আনন্দের ঢেউ বইছে। অসীমানন্দের কথায় নতুন জীবন পাবে এবার ললিতমোহন।

পুল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠেছি।

একদিকে বানগঙ্গার জল তর তর করে বয়ে চলেছে। অন্যদিকে পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো দেওয়াল পর্যন্ত কেবল সবুজ আর সবুজ। ধান-মকাইয়ের ক্ষেত। রঙ-বেরঙের ফুলের হাট বসেছে এপাশ-ওপাশে। মাথা উঁচু করে করে লম্বা হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা দেবদারু গাছ। সবুজের সরগরম দেখে, চোখ জুড়িয়ে গেছে, মন জুড়িয়ে গেছে। শ্রাবণের আকাশও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বৃষ্টি হয়ে গেছে দু'দিন আগে।

এখানকার আকাশ-বাতাস মাটি-পাহাড় সব পবিত্র। বেশী পবিত্র অসীমানন্দ। ললিতমোহন পবিত্র। আমি পবিত্র। কিছুক্ষণ পুজো-পাঠ চলার পর পবিত্রর ভিতে চিড় খেতে শুরু করল আমার। আগে মন্দিরের ভেতর পাষাণময়ী দশভুজা চামুণ্ডা দেবীকে দেখে মনে হয়েছিল, পাথুরে মূর্তি নয়। রক্তমাংসের শরীর। মুখের ভাব দেখে বুকটা কেঁপে উঠেছিল ভয়ে। তারপরই ভয় ভেঙে গেছল। আমি তো মায়েরই সন্তান। মায়ের কাছে ছেলের ভয় কিসের।

কিন্তু এখন ভাব বদলাচ্ছে আমার। দারুণ ভয় ধরেছে। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা কিংবদন্তীটাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে যেন! নরবলি। আগে নাকি নরবলি হতো চামুণ্ডাদেবীর সামনে। অবশ্য এ মন্দিরের সামনে নয়। তখন রাজা চন্দ্রভানের আমল। চামুণ্ডাদেবীর মন্দির ছিল মাইল আষ্টেক দূরে।

সেই পুরনো দিনের দেবী জেগে উঠেছেন আবার। জাগিয়ে তুলছেন তাঁকে অসীমানন্দ। জাগিয়ে তুলেছেন দেবীর রক্তপিপাসা। প্রাণ কেড়ে নেওয়া রক্তে দেবীর তৃষ্ণা মেটাতে বদ্ধপরিকর উনি।

আমি দেখছি ওপারে চিতা জ্বলছে।

এই রকম চিতার আগুন জ্বলছিল সেদিন বিথারী শ্মশানে। ধারে-কাছে

লোকবসতির কোন চিহ্ন নেই। কেবল গাছ আর গাছ। বিঘের পর বিঘে জুড়ে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে এক একটা শবদাহের সাক্ষী হিসেবে। দিনদুপুরেই গা ছমছম করে জায়গাটায় গেলে। রাতে তো কথাই ওঠে না। কেউ যায় না। মড়া আগলে ঘরে বসে থাকে সারা রাত। তবু যায় না ভয়ে।

গেছল ললিতমোহন। ললিতমোহনের কুষ্ঠি-কুলুজিতে ভয়-ডর কেমন—লেখাজোখা নেই। ষোল বছর বয়েস থেকেই শ্মশান-মশান ঘুরে বেড়িয়েছে। বাইশ বছর বয়েসে আরো দুঃসাহসী আরো নির্ভীক হয়ে উঠেছে। কাপালিকের জনাকয়েক অনুগত ভক্তও গেছে নিথর রাতে। মনস্কামনা পূরণের আশা। কৃষ্ণা চতুর্থী রাতে দ্বিপ্রহরে স্তম্ভনক্রিয়া করবেন তাদের কাপালিক গুরু। বাইরের শত্রু জ্ঞাতিশত্রু পাওনাদার পরিচিত অবাধ্য-উদ্ধত লোক—সকলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। শক্তিহীন-নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে ওরা। অনিষ্ট করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে একেবারে। এসবের জন্য যায় নি ললিতমোহন। গেছে প্রকৃত সাধনার মর্ম বুঝতে।

সৎকার করার নাম করে গাঁওয়ের ভেতর থেকে মরা যোগাড় করে আনা হয়েছে। যোগাড়ের চেষ্টা চলে রোজই। তিথিনক্ষত্র অনুযায়ী পাওয়া যায় না। যেদিন পাওয়া যায়, সেদিন মহাউল্লাসে বনজঙ্গল শ্মশানভূমি কাঁপিয়ে বিকৃত স্বরে 'মাভৈঃ, মাভৈঃ' চিৎকার করতে থাকেন কাপালিক।

সে-রাতেও চিৎকার করতে থাকেন।

মরার ওপর বসে শবসাধনা সেরেছেন। নিজের দাঁতে দাঁত ঘষে ঘষে মনে মনে উচ্চারণ করেছেন ভক্ত আশ্রিতদের বিপক্ষ লোকের নাম। তারপর মরাটার ওপর থেকে নেমে কাঠের বোঝা চাপিয়ে নিজে হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

আগুন জ্বলছে। মরাটার হাড় পাঁজরা চামড়া জ্বলছে পুড়ছে গলছে। আগুনটা নিষ্প্রাণ দেহকে পেয়ে প্রাণ নিতে না পারার ক্ষোভ মেটাচ্ছে জোরে জোরে জ্বলে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আকাশের দিকে লকলকে জিভ বার করে।

'মাভৈঃ, মাভৈঃ'—চিৎকার করে উঠলেন কাপালিক। চেঁচাড়ি দিয়ে ডান হাতের মাঝের আঙুল চিরে রক্ত বার করলেন। নতুন সরার ভেতর দিকে লিখলেন সেই রক্তে শত্রুর নাম। তারপর চিতাভস্মে সরা ভরে অন্য সরা চাপা দিলেন। আগে থেকে গর্ত খোঁড়া ছিল। গর্তের মধ্যে সরা রেখে ওপর থেকে মাটি চাপা দিলেন।

এসব দেখে দেখে আর অনেক কিছু গোপন ব্যাপার জেনে, ললিতমোহনের মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন জেগে উঠত। কাপালিককে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকেছে অনেকবার। কে জানে কিছু যদি ভাবেন, রেগে গিয়ে যদি সাধনা না শেখান! এবারে কিন্তু প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। আলোড়ন তুলতে লাগল ভেতরে খুব বেশী। ভবিষ্যৎ চিন্তাটা মনের ত্রিসীমানায় রইল না একদম। উবে গেল কোথায়।

সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল ললিতমোহন কাপালিকের সুমুখে। স্পষ্ট করে বলল, এ কেমন সাধনা? একপক্ষের কথা শুনে টাকার লোভে অপরের অনিষ্ট চিন্তা? সত্যি কারো অনিষ্ট হয় কিনা—জানি না। তবে আমার এসব ভালো লাগে না। মনে হয় বুজরুকি—সমস্ত বুজরুকি।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন কাপালিক। জ্বলন্ত চিতা থেকে মরার আধপোড়া হাতখানা টেনে নিয়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন কচমচ করে। মুখখানা কি বীভৎস দেখাচ্ছে! ললিতমোহন দেখছে, কাপালিক একটা সাক্ষাৎ নররাক্ষস। যেভাবে লাল করমচা চোখ দুটো আগুনের হল্কা ছড়াচ্ছে তার দিকে, তাতে তার মাংসও ওই ভাবে ছিঁড়ে খাবার সুযোগ খুঁজছে নিশ্চয়।

ললিতমোহন জানে, কাপালিক তাকে চেপে ধরলে মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে সে। কাপালিকেব আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওঁর গোপন কীর্তি ভক্তদের সামনে প্রকাশ করে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

কাপালিকের ভৈরবীর কাছ থেকে জানা পূজোর শিবলিঙ্গের প্রাণ পাওয়ার কথা আর শ্মশানে সবার সামনে চলে-ফিরে বেড়ানোর ব্যাপার বলল। বলল দেবীর আবির্ভাবে ঘটের লাল জবা সাদাটে হয়ে যাওয়া আর নীলচে হয়ে যাওয়ার কথাও। যে শিব পূজো করা হয়, ওটা কষ্টিপাথরের নয়। লোহার। জাগ্রত শিব বলে নিজে ছাড়া অন্যের ছোঁয়া নিষেধ কাপালিকের। ওঁর চকচকে ত্রিশূলটা ভুল করে স্পর্শ করে ফেললে, তার অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য। বংশে বাতি দিতেও থাকবে না তিনকুলে কেউ।

নিজে ধরা পডার ভয়ে এত কথার জাল বুনে রেখেছেন কাপালিক। আসলে ওঁর ত্রিশূলটা চুম্বক-লোহায় তৈরী। শিবের সামনে যখন ত্রিশূলটা নাড়াচাড়া করেন উনি ত্রিশূল নিয়ে শিবকে আহ্বান করার ছুতো করে, তখনই চুম্বক-ত্রিশূলের আকর্ষণে লোহার শিবলিঙ্গ প্রাণ পায়। নড়ে চড়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। শোধন করা গন্ধকগুঁড়ো ধুনোয় মিশেল হয়ে ধুনুচির আগুনে

ছড়িয়ে পড়ে বার বার। ঘটের ফুলে ধোঁয়া লেগে লেগে লাল সাদা হয়ে যায়—

আর কথা বেরুল না ললিতমোহনের মুখ দিয়ে। বিশাল দেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাপালিক ললিতমোহনের ওপর। গলা টিপে শেষ করে দিচ্ছিলেন তাঁর ঘর-শত্রু বিভীষণকে, কি মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। ওর ডান হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে চিতার কাছে নিয়ে এলেন। হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, বেইমান-বিশ্বাসঘাতককে এমন সাজা দেবো—জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

সেবারে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছল ললিতমোহন কাপালিকের শিষ্য-ভক্তদের ধরাধরিতে। শ্মশান থেকে যখন চলে যাচ্ছিল ললিতমোহন, তখন দু'কানের পাশে হিস হিস বাতাসে বেজে উঠছিল খালি কাপালিকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।—তেরাত্তির যাবে না। শেষ হবি শেষ হবি শেষ হবি।

মনটা বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুভয় যে ধরেনি ললিতমোহনের, তা নয়। ধরেছিল। কলকাতায় ফিরেও দু'রাত ঘুমোতে পারেন নি। কেবল কাপালিকের কণ্ঠস্বর কানে বেজেছে। তৃতীয় দিন ভোরে গঙ্গার ধারে আনমনা হয়ে চলার সময় আচমকা পেছন থেকে অচেনা গলার ডাকে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে ললিতমোহন। মুখ ফিরিয়েছে। অসীমানন্দ। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। প্রশান্তি ছেয়ে রয়েছে মুখখানা জুড়ে। কাপালিকের মতন পা অবধি বিশাল জটা নেই। ন্যাড়া মাথা, পরনে লাল চেলী নেই। আছে সাদা থান। খালি পায়ে আদুর গায়ে অপরূপ দেখাচ্ছে। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন এগোলো পায়ে পায়ে ললিতমোহন। বোশেখের পুবের আকাশ তখন লাল। ভেতর থেকে উঁকি মারছে সূর্যের আভা। ললিতমোহন দাঁড়াল সামনা সামনি। উনি পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, মোলায়েম গলায় বললেন, ভয় কি? তেরাত্তিরের আজকের রাতটাই তো বাকি শুধু। কেটে যাবে 'খন।

এ যেন দৈববাণী শুনল সে। তারপর অসীমানন্দের মুখে শ্মশানের সমস্ত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত। কেমন করে জানলেন ইনি? একটু সচেতন হতে সন্দেহের দোলায় দুলে উঠেছিল মন। নিশ্চয় কারো কাছে শুনে থাকবেন হয়তো। মনের একথাটাও জানিয়ে দিয়ে, বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন উনি ললিতমোহনকে। বলেছিলেন, তন্ত্রের যোগসাধনায় এসব শক্তি লাভ হয়।

দূরশ্রবণ দূরদর্শন। তবে সাধনায় দীক্ষা নেবার পরই যা সঙ্গে সঙ্গে অভিষেক-ক্রিয়াটা করে নেওয়া ভালো। অভিষেকে সাধকের নতুন জীবন, নতুন জন্ম। গুরুর প্রবল ইচ্ছে-শক্তির সঞ্চার হয় শিষ্যের ভেতর। এক অদৃশ্য-অফুরন্ত ইচ্ছে-শক্তির বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এক করে দেয় গুরু-শিষ্যের দুটি অন্তর।

উনি বলেছেন, বামকেশ্বর-নিরুত্তরতন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে—অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত তন্ত্রের কোন ক্রিয়াকলাপ করা অভিচার করার সমান হবে। অর্থাৎ হিত না করে অহিতই করা হবে। তীর্থভ্রমণে এসে উনি ললিতমোহনকে অভিষেক করিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এ কিরকম প্রতিশ্রুতি পালন করা অসীমানন্দের। ওঁর কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে আমার, কাপালিকে আর ওঁতে কোন তফাত নেই। তফাত ধরন-ধারণে কথাবার্তায়, বেশভূষা আর পুজো-পদ্ধতিতে।

প্রথমটা বেশ ভালো লেগেছে। মাটির বেদীর ওপর অভিষেক-কলসকে দেবীশক্তি জ্ঞানে পুজো করার সময়। তারপরও ভালো লেগেছে, ললিতমোহনকে দিয়ে অসীমানন্দের প্রার্থনা করানোয়। ললিতমোহন বলল, ত্রাহিনাথ কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ…। প্রভু উদ্ধার করুন আমায়…। অসীমানন্দ উত্তর দিলেন, মনোরথময়ী সিদ্ধি জায়তাং…। মনস্কামনা পূর্ণ হোক তোমার, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হোক।

এরপর লাল কাপড়ে চোখ বেঁধে বুকের ওপর ত্রিশূল ছুঁইয়ে রেখে যখন অসীমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কি অনুভব করছ তুমি? ললিতমোহন বলল, ধারালো অস্ত্র। এবারেও আমার মনে কোন সন্দেহের দানা বাঁধেনি। ভয় পেয়ে গেছি আমি গুরু-শিষ্যের দুটি বিশেষ কথা শুনে। অসীমানন্দ বললেন, তোমার জীবন শেষ করে দিতে পারি ত্রিশূলের আঘাতে?

পারেন। এ দেহ আপনার। যা খুশি করতে পারেন। হাসিমুখে বলল ললিতমোহন।

ললিতমোহন বলার সঙ্গে সঙ্গে অসীমানন্দ ত্রিশূলের ফলা তিনটে যেন জোরে বসাতে চেষ্টা করছেন ওর বুকে। আগের কাপালিককে আমি চোখে দেখিনি, তার বর্ণনা ললিতমোহনের কাছ থেকে শুনেছি। এবারে যেন তাঁকেই প্রত্যক্ষ করছি আমি অসীমানন্দের মধ্যে।

ললিতমোহনকে বাঁচাতে হবে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে যাচ্ছি, মুখ বন্ধ হয়ে গেল আমার। অবাক হয়ে দেখছি আমি, ললিতমোহনের বুকের

ওপর থেকে ত্রিশূলটা তুলে নিলেন অসীমানন্দ। হাত ধরে সযত্নে তুলে ধরলেন ললিতমোহনকে নিজের বুকের কাছে। চোখ বাঁধা লাল-কাপড়ের এক একটা গিঁট খুলছেন সন্তর্পণে। কাপড়টা খুলে দু'চোখে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকাতে আদেশ করলেন। তাকাল ললিতমোহন। ওর দু'চোখে স্বর্গের সুষমা।

এতক্ষণ ধরে মনে মনে গড়া ভুলের হানাবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গেল নিমেষে। আমি দেখছি আর শুনছি। অসীমানন্দ বলছেন, ত্রিশূলের মর্ম বুঝলেই মানুষ অভিষেক ক্রিয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারবে অনায়াসে। ত্রিশূলের তিনটে ফলা—তম-রজ-সত্ত্ব। অর্থাৎ অন্ধকার-আলো-আনন্দ। মানুষের অন্ধকার-অজ্ঞান তার জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট। আলোর জীবনে এসব না থাকলেও থাকে জ্ঞানের অহংকার। আনন্দের জীবনে শান্তি। সাধক এই তিনটে জীবন দেখবে নিজের মধ্যে। দেখবে অন্যের মধ্যেও। আবার তার মন থাকবে এ তিনটের ঊর্ধ্বে। সবেতে থেকেও নেই সবে। সব নিয়েও সে একা। এ কথা মন্ত্রের মতন মনে গেঁথে রাখলে, জপ করলে, স্তম্ভনশক্তি আপনা হতেই জন্মায় সাধকের ভেতর। এই শক্তির প্রভাবে শোক যেমন স্পর্শ করতে পারে না তাকে, সুখও তেমনি আত্মহারা করে ভুলতে পারে না। তার কাছে এলে, অন্যমনের শত্রু-ভাব নিবৃত্ত হয়ে যায়। সাধকের এই অবস্থাটা প্রকৃত অভিষেক সিদ্ধির অবস্থা।

ললিতমোহনকে জ্যোতির্ময় পুরুষ বলে মনে হচ্ছে আমার। অমরালোকের আনন্দ-জলে ওর সর্বশরীর ভিজে ভিজে উঠছে। ও যেন নতুন শক্তি পেয়ে নতুন জগতের মানুষ হয়ে উঠছে।
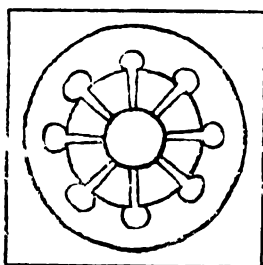
আমার দু'দিকে দু'জনে দাঁড়িয়ে ওরা। ডানদিকে রমাবতী আর বাঁদিকে গোপালমোহন। ওদের দৃষ্টি আমাকে ঘিরে রেখেছে—বেশ বুঝতে পারছি। আড়চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়েই দেখেছি, ওরা আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে আছে। আমার মুখে মনের কি লেখা ফুটে উঠেছে কে জানে। লেখা পড়ে আমার ওপর কি-রকম ধারণা জন্মাছে তা-ই বা কে জানে।

'ধারণা ওদের যা-ই জন্মাক—আমি কিন্তু দু'জনের মাঝে পড়ে খুব বিব্রত বোধ করছি। এক-একবার মনে হচ্ছে, লাজ-লজ্জার আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই ওদের কাছ থেকে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করি নিজেকে আড়াল রেখে। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। এমনিতেই ওরা বেশ সচেতন। একটু নড়লেই টের পেয়ে যাবে সেই মুহূর্তে। নিষ্ফল চেষ্টার জন্য হাস্যাস্পদ হতে হবে শেষ অবধি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমার।

আমি সম্পূর্ণ রমাবতী আর গোপালমোহনের নিয়ন্ত্রণে। ওদের নির্দেশে চলতে হবে ফিরতে হবে সব কিছু করতে হবে যখন, তখন ওদের ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করে থাকা যুক্তিসঙ্গত। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলুম আমি।

সামনের দিকে দেখছি। বিরাট মিছিলটা এগিয়ে আসছে। একটা জনসমুদ্র যেন ঢেউ তুলে তুলে আমাদের কাছে আছড়ে পড়বার জন্য এগিয়ে এগিয়ে আসছে। এদিকের রাস্তাটায়ও লোকে লোকারণ্য। বেলগাছের তলায় উঁচু ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা তিন জনে। মিছিল এগোবার সঙ্গে সঙ্গে রমাবতীর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে শুরু করেছে। আমার কানের নীচে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাসের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘন ঘন। গোপালমোহনের আবার রমাবতীর বিপরীত অবস্থা। আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরেছে বটে, কিন্তু রমাবতীর ওপর আটকেছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। রমাবতীর দু'চোখ মিছিলের ওপর চক্কর দিয়ে আসছে এবার থেকে থেকে। অম্বিকার দিকে তাকিয়েই নিজের দিকে তাকাচ্ছে আবার তক্ষুণি।

অম্বিকার দু'চোখের তারায় সেই ভয়ঙ্কর রক্তমাখা ঘরটার বীভৎস দৃশ্য ভেসে উঠছে যেন। আমার দু'চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখছি আমি বুকের রক্ত জমাট বাঁধা সেই দৃশ্য।

জায়গাটা খুব নির্জন। কাছাকাছি জনপ্রাণী নেই বললেই চলে। দিনের বেলাতেও ওদিকে পা বাড়াতে গা ছম ছম করে ওঠে। দূরে দূরে দেবদারু শিশু আর শাল গাছ। ভরদুপুরে বাতাসে গাছগুলোর ডালপালা নড়ে উঠলে মনে হয় এক একটা দৈত্য হাত বার করছে গাছের ভেতর থেকে। সুবিধে পেলে, আগন্তুককে ঝাপটে ধরে গিলে খাবে চক্ষের নিমেষে। এই রকম জায়গায় শেষের দিকটায় যে বাড়িটা রয়েছে, ওইটাই মানুষের বিভীষিকা।

'বাড়ির ভেতর ঢুকতেই পাশের বড় ঘরখানা খুলে দেওয়া হলো। ঘর থেকে একটা উৎকট গন্ধ বেরিয়ে এলো। কেমন যেন স্নায়ু অবশ করা গন্ধ। যারা

অম্বিকাকে নিয়ে ঢুকেছিল, দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। যে যেদিকে পারল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল শুধু নয়, পালিয়ে যেন প্রাণে বাঁচল তারা। অম্বিকা দাঁড়িয়ে আছে। ধীর স্থির। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করল। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। চতুর্দিকের দেয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে। টকটকে লাল তাজা রক্ত। রক্ত পড়ছে। অম্বিকার মাথায় গায়ে সর্বদেহে। ভয়-ডরের কোন চিহ্নই ফুটে উঠছে না অম্বিকার চোখে-মুখে। ও শুধু দেখছে আর দেখছে, অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে ফিরছে ঘরময়। এত রক্ত আসছে কোত্থেকে? পড়ছে কোত্থেকে?

অনুসন্ধানের শেষ হলো অম্বিকার।

অন্ধকারে চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে আবিষ্কার করল অনেকটা উঁচুতে চারিদিকের দেওয়ালে বড় বড় মোষের সিং আটকানো রয়েছে। এক একটা রক্ত মাখানো মোষের সিং থেকেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে।

ঘরের মাঝখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছে অম্বিকা। বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি বলে কেন তাকে নিয়ে আসা হলো এখানে? কেন তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল সবাই? 'কেন'র উত্তর পেল অম্বিকা একটু পরেই। যারা একা ছেড়ে পালিয়েছিল, ফিরেছে সকলে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে এক এক করে। ঘরের ভেতর সাত বছরের অম্বিকাকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদতে বা চিৎকার করতে দেখবে কিংবা বেহুঁশ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখবে এটাই ভেবেছিল হয়তো তারা। যেটা হয় অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে। অনেক কেন—বলতে গেলে সব মেয়েরই। ব্যতিক্রম ঘটে কখনো কখনো দু-এক-জনের। এই দু-একজনদের দলে অম্বিকাকে দেখে দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের আনন্দে। কারো কারো এত আনন্দ যে দু'চোখের কোণ বেয়ে জল ঝরতে লাগল টস টস করে। সাক্ষাৎ দেবাদর্শন করছে যেন তারা অম্বিকার মধ্যে, অনেক জীবনের অনেক সুকৃতির জোরে, অনেক সৌভাগ্যগুণে।

সমবেত কণ্ঠে সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয় দেবী কুমারী, জয় জয় কুমারী মাতা!

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ওরা। নুয়ে পড়ে মাথা ঠেকাল মেঝেয়। প্রণাম জানাল অম্বিকাকে। অম্বিকা দেবী। কুমারী দেবী মানবীর দেহ ধারণ করে এসেছেন নেপাল রাজ্যে। সাধারণ হলে, মানবী হলে, ভয় পেত এ পরিবেশে এসে। ভয়ের পরীক্ষায় স্বয়ং দেবী ছাড়া উত্তীর্ণ হতে পারেন না আর অন্য কেউ।

এরপর মহারাজার নির্দেশে প্রথানুযায়ী অম্বিকাকে নিয়ে যাওয়া হলো রাজ-

প্রাসাদে। মহারাণীর মনোমত শাড়ী পরিয়ে, গয়নায় সর্বাঙ্গ মুড়ে দিয়ে, ফুলে ফুলে ঢাকা রথের ভেতর সোনার সিংহাসনে বসানো হলো কুমারী দেবী অম্বিকাকে।

সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বসে আছে সিংহাসনের ওপর অম্বিকা। সামনে পুজোর প্রদীপ জ্বলছে। গা-ভর্তি জড়োয়ার গয়না ঝকমক করে উঠছে। লাল নীল সবুজ নানা রং ঠিকরে পড়ছে পুজোর উপচারের মধ্যে। জরির ফুল দেওয়া জরিপাড় লাল বেনারসী শাড়ীটার আঁচল দুলছে হাওয়ায়। অম্বিকাকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই দেবী দুর্গার প্রতিমূর্তি। রক্তমাংসের শরীরের মানুষ নয় ও একদম। ওর মুখখানা জুড়ে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি খেলে বেড়াচ্ছে। পুজো করলেন মহারাজ অম্বিকাকে দেবী ভবানীর কুমারী রূপের প্রতিনিধি হিসাবে। তন্ত্রমতেই নিবেদন করলেন তিনি কুমারীকে ফুল-ফল ধূপ ভোগের সমস্ত বস্তু।

পুজোর সময় নিজের ভেতর নিজেকেই যেন নতুন করে খুঁজে পেল অম্বিকা। এক অজানা অব্যক্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল বুকটা। হৃৎপিণ্ডের মৃদু মৃদু আওয়াজে চুপি চুপি কে যেন কথা কয়ে উঠছে। আমাকেই সবার মঙ্গল করতে হবে। আমাকেই রক্ষে করতে হবে মানুষকে। মঙ্গল হোক, সকলের মঙ্গল হোক। জয় হোক, সকলের জয় হোক।

রথের দড়ি ধরে তিনবার টানলেন মহারাজ। এবার সমবেত সকলে রথের দড়ি ধরে টানতে লাগল। রথ চলছে ধীরে ধীরে। নগর পরিক্রমা করে আবার ফিরে আসবে।

রথ চলছে রাস্তা পেরিয়ে। এক রাস্তা শেষ করে, অন্য রাস্তা শুরু করে। দু'সারি লোক আর লোক। অম্বিকাকে প্রণাম জানাচ্ছে ওরা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে। শঙ্খধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। সেই সঙ্গে বাঁশী ঢাক আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ। ছেলের দল নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। মৃদঙ্গের তালে তালে পা ফেলছে। সারেঙ্গীর সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইছে। ---জয় জয় হামরা নেপাল, সুন্দর বিশাল—জয় জয় কুমারী মাতা ভওয়ানী··· রথ এগিয়ে এসেছে একেবারে আমাদের কাছ-বরাবর। অম্বিকাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, স্বর্গ থেকে ভবানীদেবী স্বয়ং মর্ত্যে নেমে এসে রথের সিংহাসনে বসে ভক্তদের করুণা করছেন দর্শন দিয়ে। জীবন সার্থক করে তুলছেন, পুণ্যময় করে তুলছেন, আনন্দময় করে তুলছেন। নেপালের এই রথযাত্রা-উৎসব, এই কুমারী রথযাত্রা, জায়গাটাকে স্বর্গরাজ্য করে তুলেছে।

আমার ভেতরটায় একটা অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কাছে ডাকতে ইচ্ছে করছে সকলকে। এ আনন্দের ভাগী করতে ইচ্ছে করছে সকলকে।

ডানপাশে মুখ ফেরালুম। রমাবতীর দু'চোখে জল ঝরছে। আনন্দে নয়। বেদনায়। কিসের ব্যথা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি। আমি জানি ওর ব্যথাটা কিসের, ব্যথাটা কোথায়। এ ব্যথা ওর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যাবে না বুঝি। কুমারী দেবীকে দেখলে, রথযাত্রা দেখলে, ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে জানতুম বলেই আসতে বারণ করেছিলুম। শোনেনি। অতিথি আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে নতুন জিনিস দেখে। পরিব্রাজক অতিথির তন্ত্র গবেষণার সুবিধা হলেও হতে পারে কিছু। ওরই পেড়াপীড়িতেই আসতে হয়েছে আমায়। রথ সামনে দাঁড়ালে ও যে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না, কান্নায় ভেঙে পড়বে—এটা আগে থেকেই জেনেছিলুম, যখন ও আমায় অম্বিকার কুমারী হবার কাহিনী শুনিয়েছিল। কাহিনী শেষ করেই ছুটে বেরিয়ে গেছল ঘর থেকে। সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়তেই আমার ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। রথ তখন দূরে। মন চাইছিল ওর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে। ওরই মুখ চেয়ে পালাতে পারিনি আমি।

রমাবতীর কান্না বন্ধ করবার কোন সান্ত্বনা নেই আমার হাতে। নিরুপায় নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া কোন উপায় নেই আমার।

রমাবতীর কুমারী হবার সাধ ছিল বছর পাঁচেক বয়েস থেকেই। বাবার কাছে বসে বসে শুনেছে, বাবার তান্ত্রিকগুরু সিদ্ধাচার্য চেতনাথের মুখ থেকে তন্ত্রের কুমারী পূজো সম্বন্ধে অনেক কথা। শুনে শুনে রমাবতী কল্পনার ডানায় ভর করে বেড়াত রাত দিনে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখত, সে কুমারী দেবী হয়ে রথে বসে রয়েছে। রাস্তার দু'দিকের লোক ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পূজো করছে তাকে।

অনেক লোকের মাঝে পড়শী খেলার সঙ্গী গোপালমোহনের মুখখানা ভেসে উঠেছে খুব বড় হয়ে। হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডেকেছে তাকে প্রণাম করবার জন্যে। মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে, মুখ লুকিয়ে নিয়েছে ভীড়ের মধ্যে গোপালমোহন। গোপালমোহনের এ অপমান, এ অগ্রাহ্য—অসহ্য রমাবতীর কাছে। ভিড়ের ভেতর থেকে খুঁজেপেতে বার করে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসবার ইচ্ছে পেয়ে বসল রমাবতীকে। রথ থেকে লাফিয়ে পড়ল

রাস্তায়। আর্তনাদ করে উঠল রমাবতী। ঘুমের ঘোরে পড়ে গেছে খাটিয়া থেকে মেঝেয়। বাঁদিকের ভুরুর ওপরটা কেটে গেছে। রক্তে রক্ত। স্বপ্ন ভাঙার মতন কুমারী হওয়ার দুরাশাটাও ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে রমাবতীর ভবিষ্যৎ জীবনে।

রমাবতীর হতাশার অন্ধকারে নতুন করে আশার আলো জ্বালতে অনেকবার চেষ্টা করেছেন সিদ্ধাচার্য চেতনাথ। বলেছেন মহারাজাদের কুমারী পূজোর আদিকথা। মহারাজ জয়প্রকাশমল্লের সময়ে রাজবংশের কুমারী পূজো আর কুমারীর রথযাত্রা চালু হয় প্রথম। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। পূজারী বংশের একটি কুমারী মেয়ে হঠাৎ একদিন বসে বসেই বাড়ির সকলকে ডেকে বলল, সে দেবী ভবানী। তারপর বাবা মা কারো বারণ না শুনে, কারো কোন কথায় কর্ণপাত না করে সারারাজ্যে প্রচার করে বেড়াতে লাগল—সে কে।

জয়প্রকাশমল্ল শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মানুষ হয়ে দেবীর আসনে বসা, দেবী বলে প্রচার করা—অমার্জনীয় অপরাধ। ছেলে হলে হয়তো প্রাণদণ্ডই দিয়ে বসতেন তিনি। মেয়ে বলে সেদিকটায় করুণা করলেন। কিন্তু মেয়েটির বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে বার করে দিলেন। মনে মনে খুশি হলেন। উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অপরাধিনীকে। দেবীর আশীর্বাদ নেমে আসবে নিশ্চয় তাঁর মাথায়। তখনো বোঝেন নি তিনি দেবীর ত্রাস তাঁর সব খুশি শুষে নেবে রাত্তিরে।

রাণী ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হয়ে পড়তে লাগলেন রাতে। অর্ধচৈতন্য অবস্থায় রাণীর অজানা ব্যাপারটাই মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল বার বার। কুমারীকে তাড়ানো হলো কেন? কুমারী দেবী। মহারাজ স্তম্ভিত ভীত। পরের দিন কুমারীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন মহারাজ। দেবীজ্ঞানেই পূজো করলেন কুমারীকে। সেই থেকে প্রায় তিনশো বছর ধরে চলে আসছে মহারাজদের এই কুমারী পূজো।

কান্না-ভেজা গলায় জানতে চেয়েছে রমাবতী—তাকে কি জয়প্রকাশমল্লের কুমারী পূজোর মতন রাজরাজড়াদের কেউ এসে পূজো করবেন না কখনো?

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন চেতনাথ, সবই মহামায়ার ইচ্ছে। বলেছেন, এখানে একটা বিশেষ পূজারী বংশের মেয়েকেই কেবল ভয়ের পরীক্ষা করে কুমারী করা হয়। কুমারীতন্ত্রে কিন্তু কুমারীর কোন জাতিভেদ রাখে নি। সব জাতের মেয়েই কুমারী হবার উপযুক্ত। এখানকার মতন সাত বছরের মেয়েই যে কুমারী হবে শুধু, এরকম কথাও বলা

হয়নি। বলা হয়েছে, এক থেকে ষোল বছর . অবধি কুমারী হতে পারে মেয়েরা। অর্থাৎ কুমারী দেবী ভেবে পুজো করতে পারা যায় ওই মেয়েদের। এক এক বয়সের মেয়েদেব এক এক নামের কুমারী বলে সম্বোধন করেন উপাসক। এক বছরের সন্ধ্যা, দুয়ের সরস্বতী, তিনের ত্রিধামূর্তি, চারের কালিকা, পাঁচের সুভগা, ছয়ের উমা, সাতের মালিনী, আটের কুব্জিকা, নয়ের কালশঙ্কর্ষা, দশের অপরাজিতা, এগারোর রুদ্রাণী, বারোর ভৈরবী, তেরোর মহালক্ষ্মী, চোদ্দর পীঠনায়িকা, পনেরোর ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোলর অম্বিকা। অম্বিকা নামটা শুনে আশ্বস্ত হয়েছে রমাবতী। কুমারী হবার বয়স তার পেরিয়ে যায়নি এখনো। বারো গিয়ে তেরোয় পড়েছে। মহালক্ষ্মী হবার সুযোগ তো আছেই। তাছাড়াও বাকি থাকছে তিন বছর। অম্বিকাই শেষ সুযোগ তার। এই মুহূর্তে নিরাশ হবার কিছু নেই। হলেই বা নেওয়ার বংশের মেয়ে সে—কুমারীতন্ত্রে তো কোন জাতের বংশের বালাই নেই।

মনে পড়েছে কীর্তিপুরের উত্তরদিকের পাহাড়টাকে। পাহাড়ের ওপর গণেশ মন্দিরেব কি সুন্দর তোরণ! তোরণে পাথরে খোদাই করা দেবদেবীর কি অপূর্ব ছবি। খিলেনটার বাইরে, মাঝখানে গণেশ। গণেশের বাঁদিকে পর পর ময়ূরবাহিনী কুমারী, মহিষাবোহিণী বারাহী আর শিবারোহিণী চামুণ্ডা। গণেশের ডানদিকে পর পর গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী, ঐরাবতারোহিণী ইন্দ্রাণী আর সিংহবাহিনী মহালক্ষ্মী।

মহালক্ষ্মী দেখে কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হয়ে গেছল রমাবতী। ওই পাথরে খোদাই মহালক্ষ্মী যেন তার বুকের ওপর খোদাই হয়ে বসে গেছল। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল রমাবতী কিছুক্ষণের জন্য। বাবা আর চেতনাথের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল। গণেশের ওপরে মধ্যিখানে শিব-ভৈরবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন চেতনাথ, তন্ত্রের অষ্টমাতৃকার মূর্তি এখানেই রয়েছে সব। শিবের বাঁয়ে হংসারোহিণী ব্রহ্মাণী আর ডাইনে বৃষারোহিণী রুদ্রাণী। যিনি এইভাবে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয় তান্ত্রিক মহাসাধক ছিলেন। সে চিহ্ন কাল গ্রাস করতে পারে নি আজ। ছোটো দরজার কোণেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্‌কোণি যন্ত্র। একটা ত্রিকোণের ওপর আর একটা ত্রিকোণের অদ্ভুত মিলন ঘটানো হয়েছে। ঊর্ধ্ব ত্রিকোণ আর নিম্ন ত্রিকোণ। শিব আর শক্তির মিলন ঘটেছে রেখার প্রতীক চিহ্নে। পুরুষের শক্তি প্রকৃতি। আর প্রকৃতির শক্তি পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতি ভিন্নভাবে প্রকাশ হলেও অভিন্ন। জলে স্থলে শূন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই অদৃশ্য শিবশক্তির

খেলা চলছে। দৃশ্যে প্রকৃতির বুকে। সূর্যে-চন্দ্রে গ্রহে-নক্ষত্রে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের ভেতর। জীবজন্তুর ভেতর। সমস্ত—সমস্ত বস্তুর ভেতর।

এসব কথা শুনেছিল রমাবতী। শুনেইছিল কেবল। মানে কিছু বোঝেনি। কানে কথা শুনেছিল বটে, কিন্তু চোখ দুটো আটকেছিল তার তোরণের মহালক্ষ্মীর দিকেই। আটকে থাকলেও চেতনাথের শেষের কথাটা সজোরে ধাক্কা মেরেছিল যেন রমাবতীর কানের পরদায়। ভেতরে গেঁথে বসে গেছল। —১৬৬৫ সনে শেরিস্তা নেওয়ার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জৈষীজাতের শেরিস্তা নেওয়ার। মহারাজা জয়প্রকাশমল্লের কুমারী পূজোর প্রায় শ'খানেক বছর আগে।

গেঁথে বসা কথাগুলো পুরনো দিনের মতন নতুন করে আলোড়ন তুলছে আবার ভেতরে।

ধড়ে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে বুঝি রমাবতী। আকাশটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে। একটু আগের তুলো পেঁজা টুকরো টুকরো মেঘগুলো কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। রমাবতীর চোখ শুধু নীল আর নীল। রাজার কুমারী পূজোর কুমারীর বয়স নেই সত্যি তার। জাতেও সে ওঁদের কুমারীর জাত নয়। সব জেনে-শুনেও আশা জলাঞ্জলি দিতে গিয়েও হোঁচট খেয়েছে সময় সময়। অন্য কুমারী হলে এ সম্মান পাবে না তো সে। দেশের লোক দেবী বলে চিরদিন শ্রদ্ধা করবে না। কুমারী দেবীর বাড়িকে 'দেওতার মুকান' বলবে না। কুমারী দেবীকে বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না কেউ কখনো। তার ভরণ-পোষণের জন্য শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রণামী বাবদ কোন জায়গীরও পাবে না সে। চিরকুমারী হতে চেয়েছিল সে, হওয়া যাবে না হয়তো অন্য কুমারী হলে। এই ভাবনাটা মাথায় বুকে খচ খচ করে বিঁধত অনেক রাতে অনেক দিনে। পাগল করে দিত তাকে। সে পাগল করা ক্ষতে উপশমের প্রলেপ পড়েছে। পড়েছে চেতনাথের কথায় ওনার আগের কথা স্মরণ হওয়ায়। তার বংশেরই শেরিস্তা নেওয়ার যদি মন্দিরে তন্ত্রের দেবীমূর্তি এঁকে যেতে পারেন কাঠমাণ্ডুর মহারাজার কুমারী পূজোর আগে, তাহলে, সে-ই বা নতুন নজির রেখে যেতে পারবে না কেন নিজে মহালক্ষ্মী বা অম্বিকা হয়ে? নিশ্চয় পারবে। পারবে, পারবে।

এই ধ্যান এই কুমারী হবার বাসনা সফল হয়নি রমাবতীর। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। রাজা-মহারাজারা না ডাকুক, কোন সাধু মহাপুরুষ বা কোন মন্দিরের পূজারী ডাকবে নিশ্চয় তাকে। স্বপ্নে তার

দেবীরূপ দেখে কেউ না কেউ ডাকতে বাধ্য হবে তাকে। শূন্যে প্রাসাদ তৈরী করেছিল রমাবতী। সে প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ষোল বছর পেরুতে। কেউ ডাকল না। কেউ স্বপ্নে দেখল না তাকে। এমন কি চেতনাথও না।

রমাবতীর মনে হলো, দেবী ইচ্ছা ক'রেই তার সব আশা ব্যর্থ করে দিয়ে চরম আঘাত হেনেছেন। এ আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। দেবীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে সে। চেতনাথ বলেন, দেহ দেবী, প্রাণ দেবী, আত্মা দেবী, তবে আত্মাকে মারা যায় না। আত্মা মরে না কখনো। ঠিক আছে। আত্মাকে কিছু করতে পারা না যাক, দেহটাকে মারতে পারা যাবে তো।

রাণীপোখরা সরোবরের পশ্চিম তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল রমাবতী। সেতুর ওপর দিয়ে গিয়ে দেবী-মন্দিরের সামনে মাঝখান থেকে ঝাঁপ দেবে জলে। বাড়িতেই দু-তিন দিন ধরে হাব-ভাব কেমন কেমন দেখে একটা বিপদের আঁচ পাচ্ছিল যেন গোপালমোহন। ওর সঙ্গ ছাড়েনি সে। অলক্ষ্যে অনুসরণ করে চলেছিল সর্বক্ষণ। সেতুতে উঠে দৌড়বার মুখে পেছন থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরেছিল রমাবতীকে। বেহুঁশ হয়ে গেছল রমাবতী।

বাড়িতে ফিরিয়ে এনে চোখের পাহারায় রেখেছিল রমাবতীকে কিছুদিন গোপালমোহন। তারপর রমাবতী স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল রমাবতীর। ঘৃণায় বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই লোকটাও অন্তত কিছু আশা পূরণ করতে পারত তার। তার মনের ভাব জানে। দেবী বলে, কুমারী বলে পূজো করে তাকে শান্তি দিতে পারত অনায়াসে। সে চেষ্টা করেনি একদিনের জন্য। লোকটা পশু একেবারে। পশুর অদম্য কামনা বাসনা নিয়েই পেছনে ঘুরেছে স্রেফ। নির্মম সাজা দিতে হবে একে।

ভুল করেছিল রমাবতী। গোপালমোহনকে সাজা দিতে গিয়ে নিজেই সাজা পেয়েছিল যথেষ্ট। গোপালমোহনের চোখের সামনে জিদ করে বিয়ে করেছিল গাঁজাখোর মাতাল বদ্রীপ্রসাদকে।

বিয়ের একবছর না যেতে যেতেই রমাবতীর ভেতরটা অশান্তির দাবানলে জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগল। স্বামীর মতামত না নিয়েই পালিয়ে আসত বাবার কাছে। বাবার পা দুটো মাথায় চেপে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে সারা হতো। স্বামী তাকে দেবী বলে নিতে চায় না। চায় অন্যভাবে। জীবন গেলেও ওভাবে মিশতে পারবে না সে।

আসত গোপালমোহন। দেখত এ দৃশ্য। রমাবতীর জীবন-যন্ত্রণায়

অংশীদার হয়ে পড়ত সে নিজের অজান্তেই। এর জন্য যেন কতকটা দায়ী সে-ও। রমাবতীকে ঠিকমতন সম্মান দেখিয়ে শান্তি দেবার চেষ্টা করেনি কখনো। রমাবতীর চোখের জলে চোখে জল এসেছে। আড়ালে গিয়ে দু'চোখ মুছে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আবার।

এই দাঁড়াতে দাঁড়াতেই একদিন অঘটন ঘটল। দেয়ালে টাঙানো ছবির ভগবতীর মুখের আদল দেখল যেন রমাবতীর মুখে। কেমন যেন হয়ে গেল গোপালমোহন। ফুল নিয়ে এসে রমাবতীর পায়ে দিয়ে পূজো করল। পাথর-মূর্তির মতন বসে রয়েছে রমাবতী। খানিক বাদে সচেতন হয়ে উঠল। মুখে পরিতৃপ্তির আমেজ। বহুদিন পর হাসছে আবার রমাবতী। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এসে পড়ল বদ্রীপ্রসাদ। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গোপালমোহন। রমাবতীর শান্তির মুহূর্তে অশান্তি আনা ঠিক হবে না। বাবার বাড়ি আসা নিয়ে, গোপালমোহনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নিয়ে অনেক নোংরা কথা শুনতে হয় রমাবতীকে। শোনায় বদ্রীপ্রসাদ। শুধু শোনায় না রটায়ও পাড়া-প্রতিবেশীর ডেরায় ডেরায়।

চলে গিয়ে শোনা থেকে রেহাই দিতে পারেনি রমাবতীকে গোপালমোহন। বিচারকের সামনে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল নরহত্যা দেখবার জন্য। গোপালমোহনের মৃত্যু দেখবার জন্য। বিচারে ব্যভিচারী গোপালমোহনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সবার সুমুখে স্ত্রীর উপপতিকে হত্যার ন্যায়দণ্ড তুলে নেবে নিজে হাতে বদ্রীপ্রসাদ। গোপালমোহনের দেহের যেখানে-সেখানে ধারালো ভোজালি চালাবার অবাধ স্বাধীনতা তার। এ স্বাধীনতাকে খর্ব করে দিতে পারে, রুখতে পারে, একমাত্র রমাবতী। বিচার-সভায় দাঁড়িয়ে যদি রমাবতী বলে, গোপালমোহন তার দ্বিতীয় উপপতি, তাহলে রমাবতী নিজেই ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন হবে। আর গোপালমোহন? বেকসুর খালাস। মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি।

কাউকে দ্বিতীয় উপপতি বলে বাঁচিয়ে কোন মেয়ে এভাবে সমাজের চক্ষে দেশের লোকের চক্ষে চির-কলঙ্কিনী হয়ে থাকতে চায় না। সে সত্যি সত্যি ব্যভিচারিণী হলেও না। এক্ষেত্রে রমাবতী কি বলবে? স্বামীকে স্বামী বলে গ্রহণ করেনি সে। আর গোপালমোহনকে? উপপতি হিসেবে নয়, তার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব কথা বলা বৃথা। অনেকে বলেছে। কেউ সত্যি বলে স্বীকার করে নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। রমাবতী বাঁচাবে কেমন করে গোপালমোহনকে?

বিচার-সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গোপালমোহন। সামনা-সামনি ভোজালি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদ্রীপ্রসাদ।

মাথাটার ভেতর কি রকম করছে রমাবতীর। ভেসে আসছে কানে চেতনাথের একসময়ের উপদেশ। আত্মদর্শনে পরিতৃপ্তিই মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় জীবন। দ্বিতীয় জীবনেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে নিজের আত্মাই তার পতি। এই আত্মার ওপরে বিশ্ববিধাতা। পতির ওপরে তিনিই উপপতি সবার। এই উপপতি প্রথম হয়ে দ্বিতীয় হয়ে তৃতীয় হয়ে আসেন, মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। তমপতি হয়ে আসেন তিনি অজ্ঞান নষ্ট করবার জন্য আঘাতের মধ্য দিয়ে। রজপতি হয়ে আসেন তিনি জ্ঞানের উন্মেষ করাবার জন্য, অন্তরের অন্তস্তলে অদৃশ্য শক্তির লীলা দর্শন করাবার জন্য, আর সত্বপতি হয়ে আসেন তিনি সংজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখে শাশ্বত আনন্দ-রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য। এই তিন রকমের উপপতিরই আনাগোনা চলে ভেতরে। এটা তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়তত্ব।

গোপালমোহনের আত্মার আসনেই রমাবতীর দ্বিতীয় উপপতি এসেছেন। নিজেকে চিনেছে রমাবতী। ওর পূজোয় নিজের দেবীসত্তাই জেগে উঠেছে। গোপালমোহন রমাবতীর দ্বিতীয় উপপতি।

বিচারকের সামনে জোর গলায় ঘোষণা করল রমাবতী—গোপালমোহন তার দ্বিতীয় উপপতি।

হাতের ভোজালি হাতেই রইল বদ্রীপ্রসাদের। গোপালমোহন মুক্তি পেল প্রাণদণ্ড থেকে।

সেদিনের সেই তরুণী রমাবতী আজ প্রৌঢ়া। বয়সের অঙ্কে প্রৌঢ়া হলেও তরুণীর লাবণ্য এখনো অস্ত যায়নি। দেহ থেকে মুখ থেকে। রমাবতী কুমারী-রথযাত্রা দেখতে এসেছে আমাকে নিয়ে। আমি ওর কান্নার মর্ম বুঝি। রথের কুমারী মেয়েটির নাম অম্বিকা। এ অম্বিকা—আর রমাবতী, ষোল বছর বয়সের কুমারী, অম্বিকা হবার জন্য হাপিত্যেশ করে বড় আশায় বুক বেঁধেছিল একদিন।

কিন্তু এ বেদনা এ কান্না সাজে না ওর। রথের কুমারী দেবী এইভাবে রথে পরিক্রমা করে তিন চার বছর। নতুন কুমারী আসবে আবার এর জায়গায়। কিন্তু রমাবতীর দেহরথের ভিতর যে কুমারী বাস করছে, সে চিরকুমারীর জায়গায় অন্য কোন কুমারী এসে বসবে কি কখনো? রমাবতীর দেহরথ বেঁচে থাকতে নয়। চেতনাথ বলেছেন, রমাবতী তন্ত্রের যথার্থ কুমারী দেবী।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, দেবী মনোভাব এসে যাবার পরেও মানুষের অতীত ক্ষোভ দুঃখ চোখ জ্বালা ধরায়, জল ঝরায় ?

ভাবনায় ছেদ পড়ল আমার। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে যেন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে, কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই রমাবতী নিজের মনোভাবের কথা জানাল আমায়।

রথের অম্বিকাকে দেখে রমাবতী ওর মধ্যে নিজেকেই দেখেছে। আর নিজের মধ্যে ওকেই দেখেছে। চোখের জল তার দুঃখের নয়। অফুরন্ত আনন্দ ওপচানোর।

আমি অভিভূত। রমাবতীকে নিষ্পলক চোখে দেখছি।

দেখছি আমার ডানপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তন্ত্রের ষোড়শী কুমারী অম্বিকা।
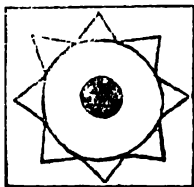
কামরূপ-কামাখ্যায় এসেও নেপালের রমাবতীকে ভুলতে পারিনি আমি। ভুলতে পারিনি তার দেবীমূর্তি। পথে-ঘাটে পাহাড় পর্বতে ক'দিন ধরে ঘুরছিল যেন দেবীমূর্তি আমাকে ঘিরে। এ এক অপূর্ব অনুভূতি আমার। অফুরন্ত স্বর্গীয় আনন্দ পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠা-নামা করছিল সর্বক্ষণ। কিন্তু সে-আনন্দ থমকালো, সে-অনুভূতি চমকালো পণ্ডিত উমাকান্তের কথা শুনে।

কুমারী জীবনের কি বিপর্যয়! কি নিষ্ঠুর পরিণতি! কোথায় রমাবতী আর কোথায় নীলপ্রভা! দু'জনেই তন্ত্রের কুমারী সাধিকা। কিন্তু দু'জনের তন্ত্রসম্বন্ধে ধ্যানধারণা একেবারে আকাশ-পাতালের তফাত।

একজন চিরকুমারীর পবিত্র জীবন যাপন করে দেবী হবার ব্যর্থ প্রয়াসের কাছে হার মেনে মেনেও নিষ্ঠা থেকে সরেনি একচুল। তাই সে বিয়ে করেও কুমারী। স্বামী তার স্বামী নয়। প্রেমিক তার প্রেমিক নয়। নিজে মানবী হয়েও দেবী ভগবতীর চিন্তায় দেবীস্বরূপ হয়ে উঠল। আর অন্য জন? অন্য জনের বিয়ে না করেও বহু স্বামী লোলুপ দৃষ্টিজালের শক্ত বাঁধনে বাঁধা। প্রেমিক না থেকেও প্রেমিকের মুখোশ পরে সাধনার নাম করে বহু দুশমনের আনাগোনা তার যৌবনের আঙিনায়।

একটি পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্না। সে রমাবর্তা। অন্যটি অমাবস্যার ঘন অন্ধকার ঘেরা নিশীথিনী। সে নীলপ্রভা।

বিকৃতিরুচির লোকদের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়েছিল কি নীলপ্রভা? না। তবে তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যার মোহিনীশক্তির ফাঁদে স্বেচ্ছায় পা দিয়েছিল কি? না, তাও না। উঁচু পাহাড়ের চুড়ো অনেককে ভয় ধরায় ওপরে উঠতে। আবার অনেককে মোহ ধরায় ছুটে এসে কাছে হাজির হতে। দর্শক-আগন্তুক যদি নিজেকে সচেতন না রেখে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে মোহাবিষ্টের মতন শিখর-প্রাঙ্গণে পৌছুবার জন্য অবিন্যস্ত পদক্ষেপে ওপরে উঠতে থাকে, তাহলে শূন্যে পা ফেলে, পাশের মরণখাদে পড়ে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় না সে কিছুতেই।

এক্ষেত্রেও ঘটেছিল ঠিক তা-ই! আহোম রাজবংশের মহারাজ শিবসিংহের তন্ত্রসাধিকা রাণী ফুলেশ্বরীকে আদর্শ খাড়া করে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নীলপ্রভা। অভীষ্ট-লক্ষ্যে উপস্থিত হবার জন্য রাতের ঘুম দিনের আহার ছেড়েছিল। ফুলেশ্বরী যদি গরীবের মেয়ে হয়েও আজ রাজেশ্বরী হতে পারে, সে হবে না কেন? শোনা যায় ফুলেশ্বরী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী ছিল। অষ্টাদশী নীলপ্রভাও তো কিছু কম যায় না। মধ্যপ্রদেশের বিলাস-পুরের যত মেয়ে আছে সবারই তো ঈর্ষার পাত্রী নীলপ্রভা।

প্রতিবেশী যুবক চন্দনলাল তার রূপের তারিফ করে বেড়ায় মহলে মহলে! চন্দনলালই বাবার সঙ্গে কামরূপ-কামাখ্যা ঘুরে এসে ফুলেশ্বরীর কাহিনী আর তন্ত্রকথা আর তন্ত্রসাধনায় অপরিসীম শক্তিলাভের ঘটনা শুনিয়েছে মাটির ঘরের দাওয়ায় একপাশের দড়ি-ছেঁড়া খাটিয়াটার ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে বসে।

কথা বলতে বলতে কখনো উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছে চন্দনলালের সর্বশরীর। কখনো রোমাঞ্চ হয়েছে। কখনো আনন্দে জল ঝরেছে দু'চোখের।

নীলপ্রভা বিস্মিত। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ। মানুষটা সাধারণের মতন নয়। কথায় বার্তায় চালচলনেও অসাধারণ। চোখদুটো আর জোড়াভুরু দেখে মনে হয় পৃথিবীর অনেক গোপন-রহস্যের দরজা খোলার চাবিকাঠি যেন একা ওরই হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে রহস্যলোকের দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে সমস্ত যে-কোন সময় যে-কোন লোককে। মাঝ-কপালে পর পর লালচন্দন আঁকা অর্ধচন্দ্র তিনটের ওপরে বড় লাল টকটকে সিঁদুরের টিপটা জ্বল জ্বল করে সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে

বুঝি। লাল রংয়ের ধুতি-চাদর আর রুদ্রাক্ষের মালায় একটা অপার্থিব মানুষ হয়ে উঠেছে। দেবতার সমতুল্য। দেবতাদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সব কিছু যেন ওর নখদর্পণে। কোন্ দেবতাকে কিভাবে তুষ্ট করে নিজের কার্যসিদ্ধি করা যায়, ভালোরকমই জানা আছে ওর। ওর কাছেই তন্ত্রসাধনা শিখে নিজের কামনা পূরণ করতে হবে। রাণী হতে হবে।

রাণী হবার মানসে বাবা-মা দেশ-ঘর সব ছেড়েছে। চন্দনলালের সঙ্গে নিভৃতে অনেক শলা-পরামর্শ করে ওরই হাত ধরে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছে। নিশুতি রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছে দু'জনে।

কামরূপে চলে আসার সময় নীলপ্রভা নিয়ে এসেছে তার প্রিয়সঙ্গিনী সই মালতীকে। আর চন্দনলালও এনেছে অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু সুখদেওকে।

পলাশবাড়ি গাঁওয়ের একটু ভেতর দিকে। ঘরটা আম-কাঁঠালগাছে ঘেরা। জায়গাটা লোকালয়ের বাইরে বলে তপোবনের মতন মনে হয়। চতুর্দিকের শান্ত পরিবেশে সংযমের লাগাম-ছেঁড়া বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল দুরন্ত মনও শান্ত হয়ে পড়ে। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। দ্বিধা-সংশয় ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে ভেতরে। নরককুণ্ড ছিল নাকি এক সময় জায়গাটা। মানুষের মৃত্যুগহ্বর ছিল নাকি। পৈশাচিক উল্লাসের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে দূষিত হয়ে থাকত নাকি এখানকার আকাশ বাতাস।

আমি অতীত ভাবছি আর বর্তমান দেখছি। দক্ষিণদিকে কাঠের বড় পিলসুজের ওপর পেতলের প্রদীপটা জ্বলছে। অন্যমনস্ক হয়ে হরিণছালের ওপর হাঁটু মুড়ে পায়ের পাতায় বসে আছে উমাকান্ত পণ্ডিত। কি যেন কি দেখছে প্রদীপের শিখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সামনে কম্বলের আসনে বসে আমি। কথা কইতে কইতে সন্ধ্যে যে চুপি-চুপি কখন সরে গেছে, সে খেয়াল দু'জনের কারোই নেই। প্রদীপের হাল্কা আলোটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আছড়ে পড়ছে। বাইরেটা আরো জমাট অন্ধকার হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে অতীত এগিয়ে আসছে আমার সামনে। সত্যি যেন জায়গাটা প্রেতপুরী। উমাকান্ত পণ্ডিতের খানিক আগের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমার নিজেরই বুকের তলা থেকে।

এ ঘরটার মতন এদেশে কোন ঘরের ভেতরেই এরকম সিঁদুর দিয়ে আঁকা ত্রিকোণ দেখতে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটা ত্রিকোণেরই নীচের দিকে মুখ

চারদেয়াল জুড়ে—দেয়ালের নীচে থেকে ওপর অবধি অসংখ্য ছোট বড় ত্রিকোণ আর ত্রিকোণ।

এগুলো ওদের স্মৃতি। নীলপ্রভা চন্দনলাল সুখদেও আর মালতীর। ওদের হাতেই আঁকা। ওরা এই ঘরেই থাকত। সাধনা করত। ভক্তরা এই ঘরেই কুমারী পূজো করতে আসত। ভক্তদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসত দু'জন কুমারীর দু'জন পুরুষ অভিভাবক। নীলপ্রভার চন্দনলাল আর মালতীর সুখদেও।

ঘরের উত্তর দক্ষিণ কোণে—দু'দিকে দুটো জলভরা মাটির প্রদীপে ভিজে সল্‌তে জ্বলন্ত দাউ-দাউ করে। মেঝেয় মাটির ত্রিকোণ-যজ্ঞবেদীর তিনকোণে তেল-জলশূন্য শুকনো প্রদীপে শুকনো সল্‌তে জ্বলন্ত। এক কথায় ঘরটা বিস্ময়-বিমূঢ় দর্শক-ভক্তদের চোখে অজানা লোকের মোহ বিস্তার করত।

এই মোহের টানে আর দুটি রূপসী তরুণীর মৃদুহাসির আকর্ষণে ভক্তের দল একবার এলে বার বার আসতে শুরু করে দিত।

যখুনি কেউ এসেছে, যজ্ঞকুণ্ডের আগুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নীলপ্রভা। দাঁড়িয়েছে মালতীও। ভক্তরা ফুল-ফল নৈবেদ্য দিয়ে পূজো করেছে ওদের। কেউ কেউ লাল শাড়ি গয়না পরিয়ে সাজিয়েছে। রূপোর টাকা সোনার পাতও যে দক্ষিণা না দিয়েছে চন্দনলাল-সুখদেওয়ের হাতে পূজোয় পুরোহিতগিরি করার জন্য দু-একজন অতি উদারচেতা, তা নয়। দিয়েছে। পুরোহিত দু'জন কুমারী দেবী দু'জনের ঠোঁটে ঠেকানো বাঁ দিকের ঘটে রাখা অমৃতপ্রসাদ খেতে দিয়েছে ভক্তদের। তাতে মাতাল হয়েছে ভক্তরা। অমৃতপ্রসাদ আসলে মদ।

মদের ক্রিয়ায় বিবেকহীন হয়েছে ভক্তরা অনেক সময়। বিবেকহীন মানুষের ভেতর কামনা-বাসনার অবাধ স্বাধীনতা। সেখানে লাজ-লজ্জা আর ভক্তির কোন বালাই নেই। নিজের আকাঙ্ক্ষার পূরণটাই প্রধান কাম্য হয়ে ওঠে। বিভ্রান্তি আচ্ছন্ন করে ফেলে তার চোখ-মন-মস্তিষ্ককে। পূর্বমুহূর্তের দেবী হয়ে ওঠে তার কাছে জন্ম-জন্মান্তরের দেহসঙ্গিনী।

ভক্তদের দেহসঙ্গিনী হয়েছে দিনের পর দিন নীলপ্রভা। মালতীও এই দেহের বেসাতিতে যোগ দিয়েছে নির্দ্বিধায়। দু'জনের মধ্যে একজনের মনের কোণেও কোনদিন অন্যায়বোধ উঁকি মারে নি এসবের জন্য। বরং এটাকেই প্রকৃত তন্ত্রসাধনা ভেবে নিয়েছিল ওরা। ওদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল—সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে ওরা ক্রমে। চন্দনলাল আর

সুখদেওয়ের মনেও ঠিক একই ধারণা। যা করছে সব ঠিক। নীলপ্রভা আর মালতীর সঙ্গে ওদের মিলনটাও অবৈধ নয় একদম। ওটা তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধনা। একসঙ্গে চতুর্বর্গের ফল। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ।

ধর্ম আর মোক্ষের কথা বাদ দিলে থাকে অর্থ আর কামের কথা। অর্থ হয়েছিল ওদের প্রচুর—যদিও এক কপর্দক রাখতে পারে নি ওরা। তাছাড়া কামনা-বাসনা ভোগলালসা চূড়ান্তভাবে মিটিয়েছে, কোনদিক থেকে বাধা পায় নি ওরা এতটুকুও। একেবারে যে বাধা পায় নি, বললে ভুলই বলা হবে; উমাকান্ত পণ্ডিত অনেক বুঝিয়েছিল ওদের—এ পথ ধ্বংসের পথ। কাশ্যপতন্ত্রের মত-পথ অনুসরণ করে চললে আত্ম-উন্নতি হয় না। অবনতিই হয়। কাশ্যপতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপে লোককে ধোঁকা দিয়ে ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে বেড়ালে তন্ত্রসাধনা নিষ্ফল হবে। তন্ত্রের ওপর একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা হবে। কাপড়ের টুকরোর একপিঠে গন্ধক আর একপিঠে মোম লাগিয়ে সল্‌তে করে জলের প্রদীপে জ্বালিয়ে অজ্ঞ মানুষের কাছে বাহাদুরি পেলেও, পুণ্য-সঞ্চয়ের থলি ভর্তি করা যায় না। অপরকে প্রবঞ্চনা করলে নিজেকেই করা হয়।

ওদের বিবেক ফিরিয়ে আনার জন্য কেঁচো শুকিয়ে, ন্যাকড়া জড়িয়ে পলতে পাকিয়ে, তেল-জলশূন্য শুকনো খটখটে মাটির প্রদীপে পলতে জ্বালিয়ে দেখিয়েছে—এ জাদু সে-ও জানে, করলে করতে পারে। কিন্তু করে কোন লাভ নেই। আসলে জমার ঘরে ফাঁকি। মানে শূন্য।

পণ্ডিতের কথা সৎ-উপদেশ কানে নেয় নি ওরা। অগ্রাহ্য করেছে। উপহাস্য করে বলেছে পণ্ডিতকে, নিজের চরকায় নিজেকে তেল দিতে। তাদের কাছে আসতে বারণ করেছে। পরের ভালো কাজে ঈর্ষাপরবশ হয়ে অনাহূতের মতন স্বেচ্ছায় এসে বাধা না দিতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

তবুও পণ্ডিত ছায়ার মতন ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, ওরা বধির উন্মত্ত জেনেও অনেক অকথ্য ভাষা শুনেও অনেক লাঞ্ছনা সয়েও, সময় পেলেই সৎ উপদেশ দিতে ছাড়ত না।

মালতীর চেয়েও নীলপ্রভার জন্য ভেতরে একটা অসহ্য ব্যথার খোঁচা বিঁধত থেকে থেকে। বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন কারো ভবিষ্যতে কোন মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ দেখলে, অচেনা লোককেও উপদেশ দিতে, সতর্ক করে দিতে, রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে ছাড়ে না, তেমনি দিব্যচক্ষে নীলপ্রভার আত্মঘাতী অবস্থা দেখে, ওকে জীবনপণ করে মরণখাদ থেকে টেনে তোলার চেষ্টা

করেছে। ভুল পথ থেকে ফিরে আসার জন্য দীক্ষা দেবার সময় কানের কাছে ইষ্টবীজ বলার মতন ফিস ফিস করে বলেছে, বাঁচতে গিয়ে মরছ, রাণী হতে গিয়ে দাসীর অধম হতে বসেছ—সময় থাকতে ফিরে দাঁড়াও। সংযমই প্রকৃত শান্তি, দেহ-ভোগে নয়। মহানির্বাণতন্ত্রে লেখা আছে পরিষ্কার—কুমারী পূজোয় সাধক বা সাধিকাকে সদ্যোজাত শিশুর মতন মন তৈরী করতে হবে। নির্বিকার নিস্পৃহ। মায়ের কোলে শুয়ে আছে যেন। এ ভাব না এলে কুমারীকে জননীর আসনে বসানো যায় না। বসানো না গেলে কুমারী সাধনা বা কুমারী পূজো ব্যর্থ হতে বাধ্য। কুমারী পূজো পবিত্রতার পূজো। বিশ্বপালিকার অদৃশ্য শক্তির তত্ত্ব অনুসন্ধান আর সেই শক্তির সর্বত্র অবস্থান অনুভবই উপাসকের সঙ্গে দেবীপ্রতীক মাতৃজাতি কুমারীর অন্তরাত্মার মিলন। কুমারীর সঙ্গে দেহের মিলন নয়।

কা কস্য পরিবেদনা। হেসে কুটিকুটি হয়েছে নীলপ্রভা। জানিয়েছে, কামরূপ-কামাখ্যা শক্তিপীঠ। এখানে কামাখ্যা দেবী সবার কামনা সিদ্ধি করেন। দেবী কুমারী। গুরুদেব বলতেন, একটি কুমারী পূজো করা মানেই সমস্ত দেবদেবীর পূজো করা। কালিকাপুরাণে কথাটার উল্লেখ রয়েছে। কাজেই তারা কুমারী। তাদের পূজো করছে যারা তারা পরমপদ পাবে। মোক্ষলাভ করবে। দেহের মিলনে তাদের দোষ নেই। কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করে মদন তার প্রকৃত রূপ ফিরে পেয়েছিল। রতি তার পতিকে আগের মতনই কাছে পেয়েছিল আবার। মদন আর রতিই পুরুষ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে মিলছে পরস্পরের সঙ্গে। অতএব তাদের অন্যপুরুষের সঙ্গে মিলন মদন-রতিরই মিলন। নিজেদের নয়।

আত্মরক্ষার জন্য নিজের কাজের সাফাই গাইবার জন্য এ কি শাস্ত্রের কদর্থ! এ কি জঘন্য ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা! মুখে কথা সরে নি পণ্ডিতের। হতবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে কেবল নীলপ্রভার মুখের দিকে। দেখেছে মালতীর দু'চোখ। ওদের চোখের ভেতর দিয়ে মুখের ভেতর দিয়ে অন্য কিছু দেখতে চেষ্টা করেছে পণ্ডিত। আসল মনের রূপটা দেখতে চেষ্টা করেছে। দুটি শিশুসরল মুখ-চোখে কুটিলতার চিহ্ন নেই। কালিমার ছাপ নেই। অথচ এরকম যুক্তি-ব্যাখ্যা ওদেরই একজনের ওই মুখ দিয়ে ওই জিভ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেরুল কি করে? বিচিত্র প্রকৃতির মেয়ে!

পণ্ডিতের ভেতর কে যেন বলেছে থেকে থেকে, ওরা সত্যিই সরল, সত্যিই সুন্দর। যে পথে নেমেছে ওরা, সে পথ ওদের কাছে শ্রেয়। এমনিই

অন্ধবিশ্বাসী ওরা যে, অন্যায়কে ন্যায় ভাবছে। এই ভাবার রাজ্যে এত ডুবে আছে ওরা, এত তন্ময় হয়ে আছে—এ রাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ওদের পক্ষে। মুক্তি না পাওয়ার জন্য ওদের কোন অনুশোচনা নেই, নেই কোন বেদনা। মুক্তি পাবার চেষ্টাও ওরা করবে না কখনো। জীবনভোর নিজেদের ওই গণ্ডীর মধ্যের কুৎসিত আনন্দকে স্বর্গীয় আনন্দ ভেবে মশগুল হয়ে থাকবে। কারো কথায় কর্ণপাত করবে না কখনো। চেতনার শাসন বরদাস্ত করতে পারবে না ওরা আর একদম। তাই দিন-রাত মদ গিলে গিলে মৃত চেতনাকে আরো মৃত করে রাখতে চায় বেঁচে ওঠার ভয়ে।

এই অন্ধকার রাজ্য থেকে এদের আলোয় আনা অসম্ভব পণ্ডিতের। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে পণ্ডিত।

খিলখিল করে হেসে উঠেছে নীলপ্রভা।

প্রতিদিন ঘরে নতুন কেউ এলে আনন্দে দশ হাত হয়ে ওঠে বুকখানা। এলো বুঝি রাজবংশের কেউ না কেউ। ফুলেশ্বরী মাঠে গোরু-ছাগল চরাতে চরাতে দেখতে পেয়েছিল পাল্কী চেপে মন্ত্রী রূপচন্দ্র যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা জানিয়েছে মন্ত্রীকে। সহানুভূতি এসেছে মন্ত্রীর। মেয়েটি রূপসী বটে। তাছাড়া সুলক্ষণা। বড়ো হলে, যৌবনে—রাজবংশের কারো না কারো নজরে পড়লে ভাগ্য ফিরে যাবে ওর নিশ্চিত। দু'হাত বাড়িয়ে পাল্কিতে তুলে নিয়েছিল ফুলেশ্বরীকে মন্ত্রী।

মন্ত্রীর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ফলেছিল শেষ অবধি। যৌবনে স্বয়ং মহারাজ শিবসিংহের নজরে পড়েছে ফুলেশ্বরী। রাণী থাকা সত্ত্বেও ফুলেশ্বরী রাণী হয়েছে। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে রাজা-রাণী। রাণীই রাজার শক্তি হয়ে উঠেছে। মহারাজ তন্ত্রসাধনায় মগ্ন হয়েছে রাণীর ওপর রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে। রাণী ফুলেশ্বরী রাজ্যশাসন করেছে রাজছত্রতলে বসে।

নীলপ্রভা রাণী না হোক, রাজবংশের কারো না কারো ঘরণী তো হবে নিশ্চয়ই। রাণী হবার পর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল ফুলেশ্বরী। তন্ত্রসাধনায় পারদর্শিনী হয়েছিল। কিন্তু নীলপ্রভা? নীলপ্রভা রাজমহলে যাবার আগেই তো সাধিকা ফুলেশ্বরীর চেয়ে অনেক—অনেক বড় হয়ে উঠেছে। যে-আশায় এসেছে কামরূপে, সে-আশা সফল হয়েছে খানিক, হতে চলেছে আরো—ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হবেই হবে।

ভুল ভুল—সব ভুল।

ভুলের বটগাছ নীলপ্রভার মনে ইমারতকে শেকড়ে শেকড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এ থেকে রেহাই নেই, নিষ্কৃতি নেই ওর।

নীলপ্রভার ভুল সংশোধন করতে না পারার আপসোস পণ্ডিতের বুকের ভেতর অহর্নিশি দাপাদাপি করে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছে। হৃৎপিণ্ড থেঁতো করা দম বন্ধ হওয়া যন্ত্রণা।

নিজেব নিজের পথ থেকে আর ফিরবে না কেউ জেনেও নীলপ্রভাদেব ফেরাবার শেষ চেষ্টা, বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছে তবু পণ্ডিত। ওদেব চারজনকে—নীলপ্রভা মালতী চন্দনলাল আর সুখদেওকে—প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব—মাটি-জল-তেজ-বাতাস-শব্দের গুণধর্মের সঙ্গে দেহের পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূতের মিলনে আত্মদর্শন আর আত্মসংযমেব প্রধান সোপান 'ভূতশুদ্ধি'র তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে করে বুঝিয়েছে। তন্ত্রের তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শী কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে কামেশ্বরী মূর্তির রূপ-বর্ণনার মধ্যে দিয়ে।

পাথরের সিংহাসনে পাঁচটি স্তর পর পর। তার ওপর সিংহ। সিংহের ওপর শব, শবের ওপর লাল পদ্ম। তার ওপর দেবী স্বয়ং। কালিকাপুরাণ খুললে দেখা যায় দেবীর এ রূপ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক। সিংহপালনী শক্তি বিষ্ণু, শবরূপ শিব লয়শক্তি, পদ্ম সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মা। স্থিতির পর লয়, লয়ের পর আবার সৃষ্টি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের খেলা খেলছেন দেবী স্বয়ং। তাই দেবী সবার ওপরে। মহাশূন্যে শত শত ব্রহ্মাণ্ড শক্তি আর সেই শক্তি পরিচালনার আদি অদৃশ্য শক্তির প্রতীক কামেশ্বরী দেবী।

মানুষের দেহাত্মবোধ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে অন্যের দেহের দিকেই লক্ষ্য রাখবে। ভেতরের আসল শক্তিটার ঠিকমতন ধারণা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। নিজের ভেতব চিনতে না পারলে অন্যের ভেতর চেনা যায় না। চেনা যায় না বোঝা যায় না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-শক্তির লীলাখেলা। উপলব্ধি করা যায় না যে, ব্রহ্মাণ্ডশক্তিই নিজের সবার ভেতরের শক্তি। ব্রহ্মাণ্ডের ভেতব সকলে, সকলের ভেতর ব্রহ্মাণ্ড। কামনা বাসনাতে দিন-রাত লিপ্ত হয়ে থাকলে এ জ্ঞান আসে না। তাই নিজের প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কথা, ভূতশুদ্ধি করার পর দেবী আরাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে তন্ত্রে।

মনকে সমস্ত প্রবৃত্তির আকর্ষণ থেকে নিবৃত্ত করে রাখার কি সুন্দর পথ এই ভূতশুদ্ধি।

চতুর্দিকে জল আর জল। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপে একটি কল্পবৃক্ষের নীচে বসে আছে সাধক। গাছটি নানা রঙের ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ। কত বিচিত্র রঙের পাখিরা মধুর আওয়াজ তুলছে ঠোঁট কাঁপিয়ে।

গাছের তলায় আসনের ওপর বসে বসে দেখছে সাধক। সমুদ্র ভয়ানক মূর্তি ধরে তেড়ে আসছে দ্বীপের দিকে। উত্তাল তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়তে লাগল অবিরাম। দ্বীপ কাঁপছে থর থর করে। কাঁপছে ঢেউয়ের আঘাতে। ফাটল ধরছে দ্বীপে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জলের তলায় মিলিয়ে গেল দ্বীপটি। আসনে বসা অবস্থায় জলের ওপর ভাসছে সাধক।

সমুদ্রজলে বাষ্প উঠছে। বাষ্প থেকে আগুন জ্বলে উঠল সারা সমুদ্রে। আগুন আর আগুন। আকাশচুম্বী আগুন। সমস্ত জল শুষে নিয়ে নিঃশেষ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাধকের দেহটাও পুড়িয়ে ছাই করে দিল। জোরে জোরে বাতাস বইছে। দেহপোড়া ছাই উড়ছে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সাধক দেখছে সব। তার শরীর নেই, নেই পৃথিবী, কিন্তু তবু সে আছে। তার রক্ত-মাংসের শরীরের দু'কান নেই বটে, কিন্তু তবু সে শুনছে অমরালোকের এক সুধাক্ষরা কণ্ঠের 'হ্রীঁ-হ্রীঁ-হ্রীঁ' সঙ্গীত। সাধক অনুভব করছে তন্ত্রের এই শক্তিবীজই আদিশক্তির শব্দশক্তির প্রতিধ্বনি।

এই ভূতশুদ্ধি। মনকে ভূতশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে হ্রীঁ-শক্তি ধরে রাখার অভ্যাসেই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। সাধক হয়ে ওঠে। অপরের দেহ-সৌন্দর্যে দু'চোখ কামনাতুর হয়ে ওঠার ভয় থাকে না আর সাধকের। এই অবস্থাতেই সাধক কেবল কুমারী পুজোর অধিকারী।

ভূতশুদ্ধিতে সিদ্ধ না হয়ে কুমারী পুজোয় পদস্খলন অনিবার্য। কুমারীরও মানবীর দেহবোধ ভুলে গিয়ে হ্রীঁময়ী ভাবতে হবে নিজেকে। না ভাবলে, তার ভুল পথের আকর্ষণ থেকে স্বয়ং শম্ভু এসেও ফেরাতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

উপাসক আর উপাস্য-কুমারী দু'জনেরই সংযমী না হলে আসল তন্ত্রসাধনার মর্ম বোঝা যাবে না।

যথা পূর্বং তথা পরং। ভূতশুদ্ধি বুঝিয়ে ফল ফলে নি কোন। বরং আগের চেয়ে নীলপ্রভাদের বেল্লিককাণ্ড বেড়ে উঠল আরো। বুঝল পণ্ডিত, একদিনে হবার নয়। অনেকদিনের অনুশীলনে যে মন তৈরী হয়, সে-মনকে ওদের মধ্যে থেকে এখুনি খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা। ওদের অভ্যস্ত সাধনার

রীতিনীতি ওদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। সহজে যাবার নয়। ওটাই ওদের বেশী প্রিয়, বেশী আপনার, তার ভূতশুদ্ধির ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যার চেয়ে। কামেশ্বরী দেবীর সিংহাসনের পাঁচটি স্তরই যে ভূতশুদ্ধির পঞ্চতত্ত্বের ইংগিত বহন করছে, এটাও বুঝল না বোধিরেরা। দিব্যচক্ষে দেখছে পণ্ডিত, ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছে ওদের। দু'চোখ ছল ছল করে উঠেছে পণ্ডিতের।

পণ্ডিতের দেখা ভয়ঙ্কর দিন এলো অম্বুবাচীর দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায়। আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ভরা তখন। সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; অসময়ে শীত নামিয়েছে। ঘরের ভেতর তখন মদের নেশায় টব ভক্তরা। নীলপ্রভা আর চন্দনলাল মিষ্টির থালাটা নিয়ে বারে বারে মালতীর মুখের কাছে ধরছে, ইশারায় সুখদেওকে তুলে নিয়ে মুখে পুরতে বলছে। মালতীও মদ-ভরা তাম্রকুণ্ডটা তুলে ধরছে নীলপ্রভার ঠোঁটের কাছে। চুমুক দিতে বলছে। হাত নেড়ে চন্দনলালকেও ডাকছে একটু চুমুক দিয়ে আনন্দের ভাগী হতে। ওদের এসব ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে সকলকে থাকতে নিষেধ করছে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলছে। এসব খাওয়া-খাওয়ি নাকি সাধক-সাধিকার গুপ্ত সাধনার একটা দিক। অন্যদের থাকলে দেখলে অনিষ্ট হবে।

চলে গেল সকলে।

এরপর যা ঘটল খুবই মর্মান্তিক।

মালতীর দেওয়া মদ গিলে নীলপ্রভা আর চন্দনলাল দু'জনেই মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে মিষ্ট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল অন্য দু'জনও। মালতী আর সুখদেও। শেঁকোবিষের প্রতিক্রিয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল ওরা। প্রণামীর টাকার হিসেব নিয়ে মন কষাকষি চলছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। মালতী-সুখদেও ভেবেছিল, নীলপ্রভা-চন্দনলাল মরে গেলে ভক্তদের কাছ থেকে পাওনার পুরোটাই তাদের হবে। ওই একই ভাবনা ভেবেছিল নীলপ্রভা-চন্দনলালও। মালতীদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। অর্ধেক দেওয়ার ব্যাপারটা থেকে রেহাই পাবে বরাবরের জন্য। কিন্তু দেবীর অভিশাপ এমন—একদিন একসঙ্গেই চারজনের মতিচ্ছন্ন হলো। নিজের নিজের মৃত্যুকেই আহ্বান করে বসল ওরা অন্যের মৃত্যু ঘটাতে গিয়ে। ভাগ্যলিপি খণ্ডাবে কে?

উমাকান্ত পণ্ডিতের প্রদীপের আলো থেকে দৃষ্টি ঘুরেছে খানিক আগে। স্থিরদৃষ্টি সুমুখের দেয়ালটার ওপর এবার।

উমাকান্ত উঠে এসেছে এ ঘরে নীলপ্রভাদের জীবনলীলা সাঙ্গ হবার পর। এ ঘরটা ভুলতে পারে নি। বেঁচে থাকতে সরল ভেবে নির্দোষ ভেবে শত চেষ্টা করেও যাদের ফেরাতে পারে নি, মৃত্যুর পরে তাদের আত্মার উদ্দেশ্যে তাদেরই হাতে সিঁদুরে আঁকা দেবীশক্তির প্রতীক ত্রিকোণযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ওদের বিভ্রান্ত আত্মার শান্তি-কামনা করে হয়তো ইষ্টদেবীর কাছে। নির্জনে-নীরবে এই ঘরে হরিণছালের আসনের ওপর এসে বসে।

আজও তাই করছে বোধহয় উমাকান্ত পণ্ডিত। দেয়ালের দিকে আমিও দেখছি। আমার মনে হচ্ছে, লাল ত্রিকোণের মাঝে-মাঝে অচেনা-অজানা দুটি তরুণ আর তরুণীর মুখ ভেসে উঠছে। প্রদীপের আলোটা বড্ড বেশী কাঁপছে। কামাখ্যা পাহাড়ের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়াটা ঘরে ঢুকছে জোরে জোরে। কান ছুঁয়ে যাবার সময় হাওয়ায় ফিস ফিস করে কথা কয়ে উঠছে কারা।—ভুল সাধনায় জীবনে ভুল করে কেউ যেন না নিজেকে উৎসর্গ করে বসে সম্পূর্ণ…

একটা চরম মুহূর্ত নেমে আসছিল মোক্ষম আঘাত হানার জন্য। গোটা বাড়িটার হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে-পিষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বলে। সেই আভাসই পাচ্ছিল কান্তিমোহন।

নিজেকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল যেমন তেমনি বাড়ির সকলে যাতে রক্ষে পায়—সে-পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টার অন্ত ছিল না তার। সারাটা দিন আর সারাটা রাত ধরে কেবল চিন্তা। চিন্তার সঙ্গে আবার ভয়। ছায়ার মতন মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে ঘিরে। আগলে রেখেছে তাকে। কারো জন্য কোন পথ খুঁজে বার করতে দেবে না। না কান্তিমোহনের নিজের, না অন্যের।

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে বাইরে, পারছে না। পালানোর কথা মনে হলে, অমনি সমস্ত দেহটা অবশ হয়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে পূব দেওয়ালে চলে যায় দু'চোখ তক্ষুণি। আর তারপর যা হচ্ছে

সর্বক্ষণ, সেটাই ভয়ানক ভাবে হতে থাকে। একটা দৃশ্য দেখে অনবরত—সেই দৃশ্য এমনিতেই ভয়ঙ্কর, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। সাধ্যি নেই এক পা-ও এগোয়। নিজেকে মনে হয় জড় পদার্থ, খুব ভারী। পাথর বললেও চলে।

তন্ত্রের সম্মোহন-ক্রিয়ার প্রভাব যে কি-রকম সাংঘাতিক হতে পারে—নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে কান্তিমোহন। ওর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে আমিও রোমাঞ্চকর নতুন অভিজ্ঞতার রাজ্যে শেষ পরিণতি জানার আগ্রহে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পা ফেলে ফেলে চলছি।

কান্তিমোহনের মন অতীতে ঘোরাফেরা করছে। ওর মনে আমার মন মিশে গেছে। দুটো দেহ মুখোমুখি বসে আছে বটে, কিন্তু দুটো দেহে এখানে একটা মনই কাজ করছে। স্মৃতির রেলিং ধরে অনুভূতির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠানামা করছে।

কান্তিমোহন একলা দেখলে না হয় মাথা খারাপ বা দেখার ভুল বলা যেতে পারত, কিন্তু সে একাই দেখছে না। দেখছে বাড়ির সকলে ছোট-বড় সব বয়সের পুরুষ-মেয়ে। কেউ কাউকে কোন কথা বলে কারো মনে দেখার কোন ছাপ এঁকে দিচ্ছে না যে সকলে একই দৃশ্য দেখে একই ভাবে ভয় পেয়ে আঁতকে উঠবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে। চার বছরের অবোধ শিশু যা-দেখেছে, ষাট বছরের জ্ঞানীবৃদ্ধও তাই দেখছেন। বারান্দায় লোহার দাঁড়ে বসে বসে বহুদিনের পোষা টিয়াপাখিটাও দেখছে। ডানা ঝটপট করে ওড়ার চেষ্টা করছে। শেকল কেটে পালানোরও। ভয়ার্ত চিৎকারে বাড়িময় ভয় ছড়াচ্ছে আরো।

ভয়ে ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে কান্তিমোহন। মাথাটাও বেঠিক হবার উপক্রম। সর্বক্ষণ এরকম দেখলে, কারই বা মাথার ঠিক থাকে? রক্তজবা বর্ণের একটি নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে। যত কাছে আসে, বর্ণের পরিবর্তন হতে থাকে। রক্তজবা মিশকালো হয়ে ওঠে। রক্তঝরা ডান হাতের খাঁড়াটা কাঁপে থর-থর করে। বাঁ-হাতে ধরা মূর্তির ছিন্নমুণ্ডটা ভীষণ হয়ে ওঠে।

একবার দেখলে, এ-মূর্তি আর সঙ্গ ছাড়বে না। জেগেও যেমন দেখবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তেমনি দেখবে। চোখের সামনে থেকে সরাতে চেষ্টা করে, মনের ভেতর থেকে বার করতে চেষ্টা করেও সরাতে পারা যাবে না, বার করতে পারা যাবে না। বরং মূর্তিটি পেয়ে বসবে আরো। ছিন্নমুণ্ডের

দু'চোখ দিয়ে লাল আগুন ঝরবে। মনে হবে এর চেয়ে মৃত্যু হওয়াই ছিল ভালো।

মৃত্যু হওয়াই ছিল ভালো এটা মনে হলেও কিন্তু মনের আসল কথা নয়। যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না বলে হতাশার কাতরকান্না এটা। আসল কথা বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

একদিকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আর একদিকে যন্ত্রণা-ভয়। দু'দিকের যুদ্ধে যোঝাযুঝি করে অবসন্ন হয়ে পড়েছে কান্তিমোহন। মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে মরণের মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়ার জন্যই বসে বসে ধুঁকছে।

তাকে উদ্ধার করার কেউ নেই এ-বাড়িতে। তাতে কান্তিমোহনের কোন দুঃখ-ক্ষোভ-অভিমান নেই কারো ওপর একজন ছাড়া। তিনি জ্যাঠাইমা—সুহাসিনী দেবী। কারো ওপর আশা না করলেও ওঁর ওপর আশা করাটা অন্যায় নয়। এটা ন্যায্য দাবি—জন্মগত অধিকার।

মাকে হারিয়েছে বারোয়, বাবাকে পনেরোয়। বাবা-মা হারা ছেলের কাছে অকূলের কূল হয়ে দেখা দিয়েছেন সুহাসিনী। এ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী বালবিধবা সুহাসিনী সন্তানস্নেহে বুকে টেনে নিয়েছেন। কোনদিন—যাঁরা গত তাঁদের অভাব বুঝতে দেননি। কান্তিমোহনের কাছে তিনি মা তিনি বাবা। আবার তিনি জ্যাঠাইমাও।

রাশভারী সুহাসিনী অন্যায় দেখলে যেমন নির্দয় হয়ে উঠতেন, শাসন করা ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না, বুঝতে চেষ্টাও করতেন না, তেমনি মানুষের মতন মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত করতেন। সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিতেও এতটুকু কার্পণ্য করতেন না। শাসন আর স্নেহের মিশেলে দীর্ঘ দশ বছর ধরে সযত্নে পালন করলেন সুহাসিনী কান্তিমোহনকে। একদিনের কিশোর তরুণ হয়ে উঠল।

সবার চোখে তরুণ কান্তিমোহন, কিন্তু সুহাসিনীর চোখে শিশু। সুহাসিনীর কাছে গেলে কান্তিমোহনের মনে হতো—সত্যি সত্যিই শিশু সে।

উনিই একমাত্র আশ্রয় কান্তিমোহনের। ওঁকে দেখলে যেটা হওয়া উচিত নয়, সেটাই হচ্ছে। অর্থাৎ ওঁতে আর রক্তজবা রঙের মূর্তিতে একটুও তফাত নেই। উনিই নিজের ছিন্নমুণ্ড বাঁ হাতে ধরে ডান-হাতে রক্তমাখা খাঁড়া উঁচিয়ে এগিয়ে আসছেন। মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—স্বর বেরোয় না। কান্তিমোহন বসে পড়ে দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে।

বুকটা হাপরের মতন এত ওঠানামা করে যে তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিতে হাঁপিয়ে ওঠে। প্রাণটা বেরিয়ে যাবে বুঝি দম বন্ধ হয়ে।

বাড়ির সবাই রক্তজবা মূর্তি দেখলেও সুহাসিনীকে তারা সুহাসিনীই দেখছে। কান্তিমোহনের মতন রক্তজবা মূর্তি আর সুহাসিনী অভিন্ন—এরকম দেখছে না এরকম ভাবছে না।

কান্তিমোহনের এ কি সাজা! কোন্ অপরাধে?

ভীতু লোকদের ঘেন্না করত। দু' চক্ষে দেখতে পারত না। সাহসী বলে নিজের খুব খ্যাতি ছিল। এখন খ্যাতির গরিমা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ের মুগুরের ঘায়ে ঘায়ে। লজ্জায় নিজের কাছে নিজেরই মাথা হেঁট হয়ে আসে। কি ছিল আর কি মানুষ হয়ে গেল হঠাৎ নিজের অগোচরেই। অনেক সময় মনে হয় আগের কান্তিমোহন মৃত। এসব কান্তিমোহনের প্রেতাত্মার নরকভোগ।

সুহাসিনী কথা দিয়েছেন। মর্যাদার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অমত করেও রেণুকাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তাই কান্তিমোহন। সুহাসিনী বলেছেন, পড়তি হলেও বনেদী ঘরের মেয়ে। ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও কুৎসিত নয়। রেণুকাকে দেখে চোখ-মন যে টানে না কারো, তা নয়। টানে। বেশ সুশ্রী।

সুশ্রী রেণুকাকে কিন্তু একদম চোখে ধরেনি কান্তিমোহনের। চোখে যাকে ধরেনি, তাকে মনের আসনে বসানোর তো কোন কথাই ওঠে না। কি কুক্ষণে অশুভ-লগ্নে না শুভদৃষ্টি হয়েছিল দু'জনের ছাদনাতলায়! রেণুকার মুখখানা হারিয়ে গেছল। ভেসে উঠেছিল শোভনার বিষণ্ণমধুর মুখ। যাকে জীবন-সঙ্গিনী করবে বলে ভেবে রেখেছিল কান্তিমোহন মনে মনে।

বছর দুয়েকের মধ্যে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে কোনদিন কোন সময়ের জন্য রেণুকা কাছে পায়নি কান্তিমোহনকে। অমন রূপ দেখতে ইচ্ছে করে না কান্তিমোহনের—তা দেখল নাই আর মুখ তুলে চোখ খুলে।

স্বামী-স্ত্রীতে মিল করানোর চেষ্টা করেছেন সুহাসিনী অনেক। ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে হার মেনেছেন তিনি কান্তিমোহনের কাছে। কান্তিমোহন কোন কুণ্ঠা না রেখে পরিষ্কার বলে দিয়েছে—ও বৌকে নিতে মন সায় দেয় না তার। এ নিয়ে কোন যুক্তি অনুরোধ উপরোধ শুনতে চায় না আর সে।

সুহাসিনী ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন রেণুকাকে আশায় বুক বেঁধে।

সময়ে ওদের দু'জনের মধ্যে প্রেম-প্রীতিটা জেগে উঠবে একদিন না একদিন। তিনি ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছেন না হয়, প্রেম-প্রীতিটা কান্তিমোহনের ভেতর আপনা হতেই জেগে ওঠা উচিত।

উচিত-অনুচিতের ঘড়ির কাঁটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সুহাসিনীর উচিতের ঘরে রেণুকার মন দাঁড়িয়েছিল তবু বছর দেড়েক। তারপর আর দাঁড়াতে পারেনি। দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছিল। এত দ্রুত যে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেও পারেনি। স্বামীর অবহেলা তাকে এত অশান্ত করে তুলেছিল যে, ঘরে তিষ্ঠতে পারছিল না মোটে। পালাই-পালাই ভাব সর্বক্ষণ। পালাল একদিন গহিন রাতে কান্তিমোহনেরই অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাত ধরে।

কান্তিমোহনদের নাম-ডাক-বংশের কপালে কালি মাখিয়ে দিল রেণুকা। এ কালি শতবার ধুলে মুছলেও যাবে না কখনো। ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল শত্রুপক্ষরা।

নিজেকে ঘিরে ব্যস্ত মানুষ নিজের দোষ দেখে না কখনো। অন্যেরটাই তার চোখে বড়। সেটার কারণ যদি আবার সে নিজেই হয়, সে-দোষের আঁচ যদি আবার গায়ে লাগে তার—তাহলে তো আর রক্ষে নেই। মরিয়া হয়ে উঠবে দোষীকে নির্মম সাজা দেবার জন্য। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। লোকের মুখে রেণুকা আর বন্ধুর কথা শুনে শুনে ক্ষেপে উঠল কান্তিমোহন। মাথায় রক্ত চড়ল। লাগছে দারুণ। রেণুকা বিষবৃক্ষ। কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে।

খুনের নেশা পেয়ে বসল কান্তিমোহনকে। কুল-মান রক্ষে করতে হলে কালবিলম্ব না করে রেণুকাকে যে-কোন উপায়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে চিরদিনের মতন। এ বিষয়ে যারা নিপুণ তাদের সঙ্গে চলল সেই শলা-পরামর্শ নিভৃতে।

কর্তার আমলের চাকর রামলোচনই সুহাসিনীর কানে তুলল কথাটা। জলখাবার দেবার জন্য ঘরে ঢোকার মুখে শুনে শিউরে উঠেছে। সুহাসিনীও শুনে শিউরে উঠলেন। সর্বনেশে ব্যাপার। শেষে কিনা কান্তিমোহনকে খুনী বলে জানবে সবাই। তিনি বেঁচে থাকতে এ জিনিস হতে দিতে পারেন না, পারেন না। যে-কোন উপায়েই হোক—তাঁর নিজের জীবন দিয়েও যদি কান্তিমোহনকে খুনের মহাপাপ থেকে বাঁচানো যায়—তিনি তাই করবেন।

খালি একই চিন্তা দিনরাত।

এমন কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, যা কাউকে বলা যায় না। বলার নয়। বললে বিপদ, না বললে বিপদ। অস্থির হয়ে তেমন লোকের কাছে বললে, জ্ঞাতিশত্রুর কানে পৌছলে কোথা দিয়ে কি যে হয়ে যাবে—তা দেবতারও অজানা। কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর কাছে বললে হয়তো কোন পথ পাওয়া যেত, না বললে—পথ না পেলে—সেটাও বিপদেরই সামিল। একলা ঘরে পায়চারী করেন সুহাসিনী বদ্ধ উন্মাদের মতন। কান্তিমোহনকে বলে কোন লাভ নেই। ও কোন কথা শুনবে না। বিয়ের পর থেকে সে-নমুনা পাওয়া গেছে বহু। বললে বরং কাজটা তাড়াতাড়ি হাসিল করার চেষ্টা করবে বাধা পাবার ভয়ে।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন সুহাসিনী দিন দুয়েক ধরে। হঠাৎ ছোটবেলার সই মাণিকমালা এলো দেখা করতে। সুহাসিনী যেন সাক্ষাৎ জগদম্বা দেখলেন সইকে। মনে হলো সকর্ণে শুনেছেন মা তাঁর অন্তরের আকূতি। সশরীরে এসে গেছেন বিপদ উদ্ধার করতে তাই।

সইয়ের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলেন। সেই সঙ্গে দ্বিগুণ মনের জোর। কে যেন ভেতর থেকে বলছে ভাবিসনে! বিপদ উদ্ধার হবিই হবি। তা না হলে এসময় তোর জন্যই বা অত সইয়ের মন কেমন করবে কেন—দেখতে ছুটে আসবে কেন অত দূর থেকে?

কেবলই মনে হতে লাগল সুহাসিনীর—সইয়ের কাছ থেকেই পথ পাওয়া যাবে।

সত্যিই পাওয়া গেল।

ওদের গ্রামে মাসাবধিকাল এক সাধু এসেছেন। তিনি তান্ত্রিক-যোগী। তন্ত্রের নবম-আচারের মধ্যে অষ্টম-আচার সিদ্ধ তিনি। যোগাচারী বলে পরিচিত। অনেকের অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করেছেন ক্রিয়ায়। প্রত্যক্ষ দেখা।

গাঁয়ে গেলেন সাধু-দর্শনে সুহাসিনী মাণিকমালার সঙ্গে। শরণাপন্ন হলেন যোগাচারীর। কান্তিমোহনকে বাঁচাতে হবে খুনের নেশা থেকে, ফেরাতে হবে খুনীর রাস্তা থেকে।

ছিন্নমুণ্ড হাতে দিগম্বরী ছিন্নমস্তার ছবিখানা হাতে নিয়ে কি যেন কি ভাবলেন খানিক যোগাচারী। তারপর লাল চন্দনের বাটিটায় বেলপাতার বোঁটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওপর দিকটায় লিখলেন হ্রীঁ হ্রীঁ..., নীচে দ্রীঁ দ্রীঁ...। চোখ বুজে রইলেন এবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে। চোখ খুলেও ছবির ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরল না। ঘণ্টাখানেক দেখলেন অপলক চোখে। দেখার শেষ

হতেই ছবিখানা সুহাসিনীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এমন জায়গায় টাঙাবে —ঘুরতে ফিরতে অনায়াসে দেখতে পায় যেন কান্তিমোহন।

…কান্তিমোহন দেখেছে। ছবিকে জ্যান্ত মনে হয়েছে। এগিয়ে আসতে দেখেছে, লাল থেকে কালো হতে দেখেছে। আর দেখেছে তাকে তাড়া করতে। সকলের মৃত্যু তার মৃত্যু।

কান্তিমোহনের পাগল হতে আর বাকি নেই। ও পাগল হয়ে যাক—আমি চাইনি। আমি কি বললুম, কি শুনলেন, কি করলেন বাবা! কাঁদতে কাঁদতে বললেন সুহাসিনী। চাদর জড়ানো ছবিখানা ফিরিয়ে দিলেন যোগাচারীকে।

বাড়ির অবস্থা দেখে, কান্তিমোহনের অবস্থা দেখে, লুকিয়ে ছবি নিয়ে চলে এসেছেন সুহাসিনী কাউকে কোন কিছু না বলে। সুহাসিনাও ছবির দৃশ্য দেখতেন, তবে কান্তিমোহনের মত অত ভয়ঙ্কর দেখতেন না।

যোগাচারী চাদর খুললেন ধীরে ধীরে। এবারও ছবিখানা দেখলেন ভালো করে একদৃষ্টে। কৌতুকের হাসি ঠোঁটে চোখে। ছবির ওপর সম্মোহন ক্রিয়ার প্রভাব বিস্তারের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে কিভাবে নিজের নাভি থেকে ধ্যান শুরু করেছিলেন।

নাভিতে আধফোটা সাদা পদ্ম। যুগলে শয়ান সেখানে রতি আর মদন। ওদের ওপর বসে আছেন দেবী ছিন্নমস্তা। বাঁ হাতে তাঁর নিজের ছিন্নমুণ্ড, ডান হাতে খড়্গ। দেবী বড় হতে হতে সমস্ত দেহব্যাপী হয়ে গেলেন। অর্থাৎ যোগাচারীর দেহটা ছিন্নমস্তার দেহ হয়ে গেল।

সেই দেহ ছবিতে মিশছে। জীবন্ত হয়ে উঠছে ছবি। রক্তজবা রঙ বদলে কালো হয়ে যাচ্ছে। জীবন্ত মূর্তি এগিয়ে আসছে, ঘুরছে ফিরছে চতুর্দিকে। মাঝে মাঝে সুহাসিনীর শরীরে এসেও মিশছে।

যোগাচারী হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে তা-ই পেয়েছ। নিজের মৃত্যুভয়ে খুনীর রাস্তা থেকে সরে এসেছে কান্তিমোহন। খুনের নেশা ছুটেছে তার। মাথা থেকে দুষ্টু মতলব উধাও হয়ে গেছে সব।

ছবির কাঁচে কোশার গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন যোগাচারী। লালচন্দনে লেখা আগের মন্ত্রগুলো হাতে করে মুছে দিলেন। তার জায়গায় সাদা করবী ফুলের বোঁটা দিয়ে সাদা চন্দনে লিখলেন—শ্রীঁ শ্রীঁ।…

ধ্যানে বসলেন।

নাভিতে শ্বেতপদ্মে দেবী ছিন্নমস্তা। শুভ্রবর্ণা। মুখের উগ্র-ভয়ঙ্কর ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে গেল একেবারে। প্রসন্নময়ী দেবী কমলার মুখ হয়ে উঠল। যোগাচারীও সঙ্গে সঙ্গে কমলার প্রতিমূর্তি হয়ে গেলেন যেন। প্রতিমূর্তি ছবির মূর্তির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। জীবন্ত হয়ে উঠছে ছবিখানা। জীবন্ত ছবি আবার মিশছে গিয়ে সুহাসিনীর দেহে।

ধ্যান ভাঙল যোগাচারীর। চোখ খুললেন। সুহাসিনীকে দিলেন ছবিখানা। বললেন, যেখানে টাঙানো ছিল ঠিক সেখানেই টাঙাবে। কান্তিমোহন পাগল হবে না। খুনের ইচ্ছেও আর পেয়ে বসবে না কখনো। শান্ত স্বাভাবিক সুস্থ মনের মানুষ হয়ে উঠবে এবার।

সুহাসিনী দেখছেন। ছবির মুখখানা কত কমনীয় মাধুর্যে ভরা। হাসি দিয়ে ঝরছে কত অভয় কত আশীর্বাদ। পবিত্র প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে সুহাসিনীর ভেতর।

কান্তিমোহনকে দেখে মনে হচ্ছে আমার সদাপ্রসন্ন এই পুরুষটির মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত প্রসাদগুণ এসে জমা হয়েছে একসঙ্গে।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী চোহানকে মানস সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখলুম আর বুঝলুম উনি পেছু ছাড়েননি। বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। দু দিনের বেশী এ জায়গায় থাকতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। দু দিনের জায়গায় তিন দিন হয়ে গেছে। গেলেও আরো দিনচারেক থাকার প্রবল ইচ্ছে আমার। দেখছি সে-সাধেও বাধ সাধছেন চোহান স্বয়ং। উনি বলেছেন, যখুনি ওকে নজরে পড়বে আমার, তখুনি কোন চিন্তাভাবনা না করে সেই স্থান যেন ত্যাগ করি আমি।

করেছিও তাই। আদেশ পালন করতে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল না আমার। একবার নয়, দু'দুবার করেছি। বর্খাপল্লা থেকে চমরীর পিঠে চেপে আসছি, পথে যেন দিনের আলোয় ভূত দেখলুম। একটা আধটা নয়, একেবারে দশ-বারোটা এগিয়ে আসছে আমার লক্ষ্য করে। আসছে দ্রুতপায়ে, আসার

ধরন মোটেই ভালো নয়। চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরার মতন। দস্যুদের দুর্দান্তগিরির কথা শুনেছি অনেক। আমি নিরস্ত্র। কাছে আসতে লক্ষ্য পড়ল ওদের হাতের ওপর। প্রত্যেকের হাতেই বড় বড় ভোজালি এক একখানা করে শক্ত মুঠোয় ধরা।

মুখগুলো যেন মানুষের নয়। যদিও মুখোশ পরেনি ওদের কেউ—তবুও প্রেতের মুখের মতন দেখাচ্ছে। এমনভাবে খয়েরগোলা মেখেছে মুখময়, মনে হচ্ছে সব মুখই একই রকমের। ইতরবিশেষ নেই কোন।

ভয়ঙ্কর ভাবটাও একই ছাঁদে ঢালা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি আমি।

তিব্বতে এসে অবধি স্থানীয় লোকের মুখে সাবধানবাণী শুনেও সতর্ক হইনি এতটুকু। কারো কথা মনে ঠাঁই দেবার যে প্রয়োজন আছে—তা ভাবিনি। গোঁয়ার্তুমির ফল—একা আমার জন্য—যা ফেলতে যাচ্ছে, যা ফলবে—চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। আমি নিরুপায়।

এলেন চোহান।

আমাদের মাঝখানে একেবারে। কেমন করে এলেন, চোখের পলক ফেলতে কোন্ মুহূর্তে এলেন, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এ যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা। বিপদে পড়লে মানুষ তার চেয়ে প্রবল শক্তিরই আশ্রয় খোঁজে, সাহায্য নিয়ে বিপদমুক্ত হতে চায়। এই ভাবটা জন্মানোর পর থেকেই মগজের ভেতর চেপে বসে থাকে গোপনে, তাই মানুষ আত্মরক্ষার জন্য এত ছুটোছুটি করে। অতলতলে তলিয়ে যাবার সময় খড়কুটোকে অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরে। ভুল করছে কি ঠিক করছে সে-জ্ঞান থাকে না। থাকে শুধু ভেতরে একটা হাঁকুপাকু ভাব। বাঁচার প্রেরণা।

নিজের মৃত্যুকে দেখেছিলুম আমি ওদের মধ্যে। বাঁচার প্রেরণাটাই আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়েছে হয়তো। শূন্যকে আশ্রয় করেছি আমি। শূন্যেই কল্পনার মূর্তি গড়েছি। দেখেছি চোহানকে। কিন্তু এ ধারণাটা আমার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। যারা এসেছিল আমার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ফালা ফালা করে দিয়ে প্রাণহীন দেহকে সাদা সাদা পাথুরে জমির ওপর ফেলে রেখে চলে যাবার জন্য, তারাও দেখল নিশ্চয় চোহানকে। তা না'হলে আমার দৃষ্টি পড়তে ওরকম ভয় পেয়ে চমকে উঠবে কেন? অপরাধী মুখ করে পেছন ফিরে অমন দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন?

চলে গেল ওরা দূরে—অনেক দূরে। আর দেখা যাচ্ছে না। চোখ

ফেরাতেই অবাক আমি। চোহান নেই। যাই হোক, চোহানের পূর্বের নির্দেশ স্মরণ করে ও জায়গায় দাঁড়ালুম না আর। চমরীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছি। বেশ খানিক রাস্তা যাবার পর আবার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন চোহান। এবারে কিন্তু আশেপাশে কোন লোকই দেখলুম না। চারদিকে তাকিয়ে কোন বিপদের আঁচ পেলুম না। তবু কেন এলেন চোহান? এবারেও বিস্ময়ের ধাক্কা ঘুরপাক খাচ্ছে ভেতরে। খেলেও একটা কথা বুক ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।—পথ ভুল হয়নি তো? পেছনে-সামনে ডানদিকে-বাঁদিকে—জনপ্রাণীশূন্য। কোন তীর্থযাত্রীর চলার আওয়াজ পর্যন্ত বাতাসে ভেসে আসছে না। কানে বাজছে না। ছাড়লুম এ রাস্তা। সঙ্গে সঙ্গে চোহানকেও দেখতে পেলুম না আর।

যে পথ ধরেছি—এ পথে অনেক লোকজন দেখছি। মনকে দেহকে তাজা করে তোলার জন্য যাত্রীরা হাসিখুশিতে মেতে উঠেছে। আমিও যোগ দিলুম ওদের এই বিশুদ্ধ আনন্দে। মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসে একটা মন-মাতানো সুগন্ধ ভেসে আসছে। মাথার ওপর মিঠে রোদ। পরিষ্কার নীল আকাশ। আমরা এগোচ্ছি। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকে গান ধরেছে।—হর হর মহাদেও, জগৎসোয়ামি পার্বতীনাথ অলখনিরঞ্জন।

এলুম সবাই মানস সরোবরের তীরে।

চতুর্দিকে পাহাড়-ঘেরা মানসসরোবর। নীল স্বচ্ছ জলে ভরা বিরাট হ্রদ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাছ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরে। উড়ছে রাজহাঁস, উড়ছে নানা রঙের পাখি। আকাশের রঙ বদলে সরোবরের জলের রঙ বদলে যাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য। নিজেকে ভুলে আত্মহারা হয়ে দেখছে সকলে। আমিও দেখছি, দেখছি উত্তর দিকে কৈলাস-পর্বতের চূড়ো। জমা বরফে যেন একটা শ্বেত-পাথরের শিবমন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত কারুকায। এ দৃশ্য দেখে এখান থেকে যেতে চায় না আর মন। দেখে দেখে চোখের পলক পড়তে চায় না। দেখার সাধ মেটে না।

পাশে-পেছনে ক্যারাগনার ঝোপ থেকে সাদা ধবধবে খরগোসগুলো বেরিয়ে যাত্রীদের পায়ের ওপর দিয়ে চলাফেরা করছে, লাফালাফি করছে, সেদিকে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনই তন্ময় হয়ে দেখছে সব।

তন্ময়তা ভাঙল আমার মন্দির দেখতে দেখতে চোহানকে দেখে। মন্দিরের গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোহান। বিরক্ত হয়ে উঠলুম আমি। এবারে আর ওঁর আদেশ মানবো না। এমন পবিত্র জায়গায় মৃত্যু হলেও কাম্য। এ জায়গা

ছেড়ে চলে যাবার, সরে যাবার কোন মানে হয় না। চোহান অর্থে তিব্বতীদের কাছে মহাত্মা। কেমন মহাত্মা উনি যে আমার তৃপ্তিটা আমার স্বর্গীয়-দর্শনটা সহ্য করতে পারছেন না? দু'দিন গিয়ে তিনদিনে পড়েছে সবে। এর মধ্যে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান কেন উনি? কেন উনি নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান? উদ্দেশ্য কি? এর ভেতর কি রহস্য আছে?

এবারে এক পা নড়বো না স্থির করলুম। দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি। কিন্তু মন্দির দেখছি না। দেখছি অন্য জিনিস। একটি মানুষের অতীত মনোভাব। এইটাই আমাব ভয় ধরাচ্ছে বেশী করে। চোহান বলেছিলেন তাঁর তান্ত্রিক গুরুর কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন আর শিখে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। জ্ঞাতিদের সঙ্গে প্রথম যে তান্ত্রিকের কাছে গেছলেন তিনি, তাকে পাগল করে ঘর-ছাড়া দেশ-ছাড়া করার জন্য নিজেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এক সময়।

সেই উন্মত্ততাটা ফিরে এসে আমার ওপব খড়্গহস্ত হয়ে উঠল কিনা কে জানে। যদিও এরকম হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই, তবুও সন্দেহ যাচ্ছে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, ওঁর কাছে যাবো না ফিরে যাবার সময়।

মনে হলো পাশের তুষাবনদার ওপর দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসছেন উনি সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা দিয়ে নেমে আসার মতন। লক্ষ্য আমার দিকে। একটু পরেই এলেন এপারে। আমাব পাশে। তারপর যেদিকেই চোখ ফেরাচ্ছি, সেদিকেই দেখছি আমি। অনেক আমি যেন গোল করে ঘিরে রাখছে। মাথাটার ভেতর কি বকম হয়ে যাচ্ছে আমার—এসব কি দেখছি!

এইভাবেই দেখতেন চোহান তাঁর জ্ঞাতিদের তান্ত্রিক বগলাশর্মাকে। দেখাটা অবিশ্যি আমার মতন ঠিক এইভাবেই নয়, কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। বগলাশর্মার কাছে নিয়ে গেছল তাঁকে তাঁর মামার দূবসম্পর্কেব ভাইপো দুলাল। উদ্দেশ্য কি প্রথমে বুঝতে পারেননি চোহান, পরে বুঝেছিলেন, দিনের আলোর মতন সব ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে গেছল তাঁর তান্ত্রিক গুরু দেবনির্মলের কৃপায়।

সাধুদর্শনে যাচ্ছে বলে নিয়ে যায় দুলাল চোহানকে। চোহানকে দেখেই বগলাশর্মা এমনভাবে তাকায়—বুকের ভেতর একটা অজ্ঞাত ভয়ে দুরু দুরু করে ওঠে। মনে হয় ওর রক্তচক্ষু তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি শুষে নিল এক নিমেষে। চব্বিশ বছরের যুবক নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ হয়ে গেল, চলার শক্তিও হারাল যেন।

বাড়ি ফিরে এসেও ভয় কাটেনি। ওর চোখই দেখেছেন কেবল। দেখেছেন

তাঁর পেছনে পাশে—চতুর্দিকে। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছেন, বেরিয়েছেন রাস্তায়—কোন জায়গায়ই ভয়ানক মুখের রাক্ষসে চোখের রোষদৃষ্টির আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি চোহান। যতই দিন যেতে লাগল ততই বেড়ে চলতে লাগল এই দেখা আর এই দেখার ভয়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ওই চোখ দেখেন, দেখেন ওই মুখ। আর্তনাদ করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়েন মেঝেয়। প্রতিকারহীন ভয়ের কাছে নিরুপায় তিনি। নিরুপায় বাড়ির সকলে। ডাক্তার-ওঝা-বদ্যি—কোন কিছু করতে আর বাকি নেই। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বাচ্চা ছেলের মতন দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে সারা হন চোহান। পাগল হবেন নাকি? পাগল হলেন নাকি তিনি?

বাড়ি থেকে আলমোড়ায় পাঠিয়ে দেয়া হলো তাঁকে। সেখানে আশ্চর্যভাবে চোহানের চোখের সুমুখ থেকে বগলাশর্মার ভয়াবহ মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল ভয়-ধরানো রক্তজবা চোখ দুটোও। দু'মাস ধরে নিদারুণ অস্বস্তি ভোগের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন চোহান। রাতের গভীর ঘুম নেমে এলো দু'চোখের পাতায় আবার। আগের মতন শান্ত সংযত—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন উনি।

রাণীক্ষেতে বেড়াতে বেড়াতে দেখা হয়ে গেছল দেবনির্মল তান্ত্রিকের সঙ্গে চোহানের। দেবনির্মল এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। হঠাৎ চোখাচোখি হতে আর উনি তান্ত্রিক শুনে হৃৎকম্প হয়েছিল চোহানের। আবার না অনর্থ ঘটে। অনর্থ ঘটেনি। চোহান বেশ বুঝতে পেরেছিলেন এ চাউনি বগলাশর্মার নয়। একদম আলাদা। স্নেহ সহানুভূতি ভরা।

এরপর দেবনির্মলের ডেরায় গেছেন। অতীত কাহিনা শুনিয়েছেন। আসার কারণ জানিয়েছেন। বাড়ি ফিরতে অনিচ্ছা তাঁর। বাড়ি-ভীতি ভয়ানক। ওটা মন থেকে দূর হই হই করেও হচ্ছে না।

নিঃসন্তান মামার পালিত একমাত্র ভাগ্নে চোহান পাছে ভবিষ্যতে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসেন—সেই ভয়ে জ্ঞাতিরা বগলাশর্মাকে দিয়ে উন্মাদ করে দিতে চেয়েছিল। বলেছিলেন দেবনির্মল। বলেছিলেন, তান্ত্রিক ক্রিয়ায় ওটা সম্মোহন বিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সব বিদ্যাই মানুষের মঙ্গলের জন্য করতে বলা হয়েছে। কারো অনিষ্ট করার জন্য নয়। প্রকৃত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মানুষের মঙ্গলের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন তান্ত্রিক ব্রতে। অসংযত ক্রোধী ঈর্ষাকাতর আর বিবেকহীন লোকের হাতে অস্ত্র

পড়লে অকারণে যেমন নির্দোষেরও প্রাণ যেতে সর্বনাশ হতে একটুও দেরী হয় না, তেমনি অসংযত লোভী আর বাসনামত্ত লোকের তন্ত্রশাস্ত্র আয়ত্তে এলে ইচ্ছেমতন ভালো করার জায়গায় ভয়ের ছবি এঁকে দেয় অন্যের মনে—তার জীবন-যৌবন চিরকালের মতন বরবাদ করার জন্য।

বিষাক্ত মনের মানুষদের কাছে ফিরে যেতে চাননি আর চোহান। যে ভয় পেয়েছেন নিজে—অন্য কেউ যাতে সে ভয় না পায় কখনো—সে ভয় দূর করার সাধনা শিখতে মনস্থ করেছেন। শিখেছেন নিজেকে অপরের কাছে—যেখানে সেখানে পাঠানো। শেখার পর অন্য মানুষ হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্বুদ্ধি চেপেছে মাথায়। প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। যেমন তাঁকে পাগল করে দিতে চেয়েছিল বগলাশর্মা, তেমনি তিনিও এবার ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে পাগল করে ছাড়বেন ওকে।

নিজেরই আর একটা রূপ—সূক্ষ্মশরীর পাঠিয়ে দেবেন বগলাশর্মার কাছে। পাঠাবেন রক্তচক্ষু করে ভয়াবহ মুখ করে। চিন্তাও যা কাজও তা। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন প্রতিবারে। যখুনি কাজে বসেছেন, তখুনি দেখেছেন দেবনির্মলকে। মনে পড়েছে দেবনির্মলের কথা।—এর জন্য তোমাকে শেখানো হয়নি। তুমিও এজন্য শেখোনি। প্রতিশ্রুতির কথা মনে কর!

প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি। সর্বনাশা রাস্তা থেকে ফিরে এসেছেন চোহান। এসেছেন দেবনির্মলের জন্যই। বিপদে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়।

বুদ্ধিনাশ হতে বসেছিল আমারো। চোহানের প্রতিশ্রুতি করার কথাটা মনে পড়তেই বুদ্ধিভ্রমের ঘোরটা কেটে গেল। সচেতন হয়ে উঠলুম আমি। আমার চেতনার আলোয় দেখলুম ওঁকে। বগলাশর্মাকে যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দেখিনি ওঁকে—ক্ষণেকের জন্য মনে হয়েছিল স্রেফ। সেটা মনেরই ভুল। দেখেছি সত্যিকারের ঋষি একজন। মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখছিও তা-ই, তবে নতুন করে।

দস্যুদের হাত থেকে রক্ষে করেছেন, হারানো পথের মোড়ে টেনে এনেছেন। এবারের দেখাবার মধ্যে নিশ্চয় কিছু বিপদের ইংগিত আছে। ওর আদেশটা আবার শিরোধার্য করার ইচ্ছে হলো আমার। চমরীর পিঠে চেপে বসলুম, ফিরবো। যাচ্ছি চোহানের কাছে। মাথার ওপর কালো মেঘ এসে ভিড় করছে। 'দিনের আলোটা নিভে আসছে। দুর্যোগের আভাস।

...পল্লীর মধ্যে এসে পড়লুম। গুহার মতন পাথরের ঘরে ভেতর দিকে

একটা চারপাট করা কম্বলের ওপর চোহান বসে আছেন। আদুড় গা, সাদা চাদরের একটা ফালি জড়ানো কোমরে। ধ্যানমগ্ন। দু'চোখ বোজা। বাইরের চোখ বোজা থাকলে কি হবে—ভেতরের চোখে দেখছেন উনি—দিব্যদৃষ্টিতে। দেখছেন মানুষের বিপদ। নিজের সূক্ষ্মশরীর পাঠিয়ে আমার মতন রক্ষা করছেন অপরকে।

এই সূক্ষ্মভাবে অপরকে রক্ষা করার তান্ত্রিক প্রক্রিয়া—অনুশীলনে যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হয়েছেন উনি, যে প্রক্রিয়ায় দুর্যোগের মুখ থেকে টেনে নিয়ে এলেন আমায়—সেই ধ্যান করার প্রক্রিয়াটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রথম আলাপেই। নিজের জীবন-কথা বলার সময়ে। ওঁকে দেখছি আর ওঁর ভেতরের ধ্যানের ছবি বাইরে—আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

চোহানের গায়ের রঙটা স্ফটিকের মতন হয়ে উঠেছে। এটা দ্বিতীয় উনি। ওঁর নিজের মেরুদণ্ডের শেষে এই দ্বিতীয় উনি দাঁড়িয়ে। ধীরে ওপরে উঠছেন। খানিক উঠতেই দেহের রঙের পরিবর্তন হয়ে গেল। লাল। আরো একটু ওপরে উঠতে সাদা।

তারপর সাদা রঙের উনি একজন ওপরে—মাথার মধ্যে গিয়ে, কিছুক্ষণ থেকে নেমে এলেন বুকের কাছে। শ্যামবর্ণের হয়ে গেলেন। এলেন কণ্ঠে। এখানে সবুজ। সবুজ উনি কপালের মধ্যিখানে গেলেন, হয়ে উঠলেন স্ফটিকের চেয়েও স্বচ্ছ। এখানে পর পর চারটে রঙ—সাদা, লাল, শ্যাম, সবুজ মিলে গিয়ে আলোর দেহ হয়ে গেল। আলোর দেহ চলে যাচ্ছে যেখানে-সেখানে। আবার ফিরে আসছে ওই একই জায়গায়। আসছে যাচ্ছে, যাচ্ছে আসছে ···।

না জানি কত দিন কত মাস কত বছর ধরে নিষ্ঠা ধৈর্য আর দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তন্ত্রের দূরগমন-দূরদর্শনের সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন আজ চোহান-মহাত্মা!
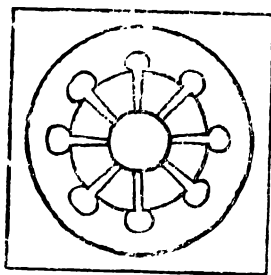
একসঙ্গে অনেক বলিষ্ঠ হাত এগিয়ে আসছে তিনদিক থেকে। সামনে দু'পাশে। মাটির দেয়ালে নয়নতারা লেপটে রয়েছে একেবারে। পালাতে গিয়েও পালাতে পারেনি। দরজার কাছ বরাবর এসেও পারল না।

ডানদিকে দু'জন, সামনে দু'জন, বাঁদিকে দু'জন। অসহায় চোখে দেখছে নয়নতারা। মানুষের খোলশে এক একটা দানব ছিল। সুযোগ বুঝে খোলশ ফেলে দিয়েছে সব। জোড়া-জোড়া লাল চোখের দৃষ্টিতে এক একটা মানুষখেকো উঁকি মারছে। রক্তের পিপাসায় কাতর।

নিঝুম রাত, নির্জন জায়গা। ধারে-কাছে লোকবসতি নেই যে, চিৎকারে এসে পড়বে কেউ। নয়নতারার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওরা টুটিটা টিপে ধরার আগেই হয়তো দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। মৃত্যু হোক দুঃখু নেই। কিন্তু এভাবে! যাকে অতি আপন ভেবে সঙ্গে এসেছে, সে-ই এগোলো প্রথম। শুধু এগোলো না, তাকে শেষ করার জন্য ওর হাতটাও এগোলো প্রথম। সেই সাহসেই অনুসরণ করেছে এরা। খুন চেপেছে এদের মাথায়।

নয়নতারার চোখ আর কারো দিকে নেই। কেবল শ্রীমোহনের দিকে। চেয়ে আছে একদৃষ্টে। মৃত্যুর আগেই মনে হচ্ছে মরে গেছে যেন সে। কোথায় চলে যাচ্ছে। এই কি পরলোকের পথ?

আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে সংবিৎ হারাতে বসেও পূর্ণ সংবিৎ ফিরে পেল আবার নয়নতারা। তীব্র-কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ। কুলার্ণব সাধু বলছে, ওর মৃত্যু ওভাবে নয়। ওকে বলি দেবো আমি নিজের হাতে। বলির খাঁড়াটায় মাথা ঠেকিয়ে, বেদি থেকে তুলে নিল কুলার্ণব সাধু।

খোড়ো চালের ঘরখানার আবহাওয়া বদলে গেল মুহূর্তে। বদলে গেল শ্রীমোহনের মুখ-চোখের চেহারাও। অত শক্তি যে ও কোথা থেকে পেল কেমন করে পেল কে জানে। কুলার্ণবের অনুগত শ্রীমোহন কুলার্ণবের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে, খাঁড়াটা কেড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। উত্তেজনায় সর্বশরীর

কাঁপছে। এমন ভাবে তাকাচ্ছে সকলের দিকে যে, সব ক'টার—কুলার্ণব সাধুরও মাথাটা ধড় থেকে না নামিয়ে খাঁড়াটা হাতছাড়া করছে না সে।

ব্যাপার সুবিধের নয়, গুরুতর। ঘর ফাঁকা হয়ে এলো। এক এক করে সটকান দিল সকলে। যায় কুলার্ণবও। গোটা ঘরটার চার দেয়ালে দু'চোখ চক্কর দিয়ে এলো একবার শ্রীমোহনের। খাঁড়াটা নামিয়ে রাখল যথাস্থানে—মাটির বেদির ওপর। নয়নতারার কাছে এসে চোখ বুলিয়ে নিল আপাদমস্তক।

খপ করে ডানহাতটা চেপে ধরে বলল, বাড়ি চল!

···বাড়িতে এলো ওরা দু'জনে।

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল শ্রীমোহন। রাজ্যের ঘুম যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসেছিল, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের পাতায় ভর করল। নাক ডাকছে। ঘুমে অচেতন মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে নয়নতারা। জানলার দিকে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে।

বসে থাকে রোজই। শ্রীমোহন রাত করে ফেরে। কোন কোনদিন ফেরেও না আবার। না ফিরলে এ ঘরেই থাকে আসার প্রতীক্ষায়ও। আর ফিরলে, শ্রীমোহন ঘুমিয়ে পড়ার পর নিজের ঘরে চলে যায়। একা ঘরে নানা চিন্তার জট পাকায় মাথায়। ঘুম এসে এসেও আসেও না। তন্দ্রা-জড়ানো চোখে পড়ে থাকে বিছানায়। আজ কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না মোটে এ ঘর থেকে। রাতভোর বসে বসে দেখতে ইচ্ছে করছে এই ঘুমন্ত মানুষটাকে। ওর ভেতরটাকে।

যত দেখছে তত নতুন ঠেকছে।

বিবেকের মাথাটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেনি এখনো সম্পূর্ণ। নিরাশ হয়ে ভেঙে না পড়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে একমনে। কোন ত্রুটি না রেখে। হয়তো একদিন বিবেক বাঁচবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমোহন নিজেও।

শ্রীমোহনকে বাঁচাতে গিয়ে ভালো করে না বুঝে-সুঝে যে মারাত্মক ভুলের পথে পা বাড়িয়েছিল, আর যেন সে ভুল না হয় জীবনে। নয়নতারাকে সতর্ক থাকতে হবে সদাসর্বদা। শির শির করে উঠল সারা শরীর। ভয়ের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছে, তবু ভয়। ভীষণ ভয়। প্রাণের চেয়েও মস্ত জিনিস হারাতে বসেছিল—নিজের সম্ভ্রম।

শ্রীমোহনকে দিয়েই ডেকে পাঠিয়েছিল কুলার্ণব। গেছল নয়নতারা নির্দ্বিধায়। নয়নতারাকে নিয়ে ছ'জন মেয়ে আর শ্রীমোহনকে নিয়ে ছ'জন ছেলে। মাটির হোমকুণ্ড ঘিরে, গোল করে সবাইকে বসিয়ে দিল কুলার্ণব। মধ্যিখানে—

হোমকুণ্ডের সামনে বসল কুলার্ণব স্বয়ং। তার পাশে অন্য একজনের স্ত্রী এসে বসল তারই ইঙ্গিতে। কুলার্ণবের নিজের স্ত্রী চক্রে অন্য এক পুরুষের পাশে বসে। নয়নতারা শ্রীমোহনের পাশে নয়, অন্য এক পরপুরুষের পাশে। কি যে অস্বস্তি, সে আর বলে বোঝানোর নয়।

দারুণ আপত্তি করেছিল বসতে। ধমকে চোখ রাঙিয়ে জোর করে বসিয়ে দিয়েছে শ্রীমোহন। কুলার্ণবের আদেশ দেবতার আদেশ ভেবে মেনে নিতে বলেছে। তখন থেকেই নয়নতারার ভেতরে আর্তনাদের সুরে কে যেন বলে উঠেছে, পালা পালা! বিপদ—মহাবিপদ!

চনমন করে তাকিয়েছে। কুলার্ণব আর শ্রীমোহনের শ্যেনদৃষ্টি তার ওপর। কুলার্ণব বলল, মোটে চঞ্চল হবে না কেউ। যা বলব, তা মনে-প্রাণে পালন করা চাই। হোমকুণ্ডে পর পর কাঠ সাজিয়ে, থাক থাক কাঠের ত্রিকোণের ফাঁক দিয়ে কর্পূরের ডেলাটা একেবারে তলায়—বালিতে আঁকা যোনি-যন্ত্রের ওপর ফেলে দিল। বলল, বাগীশ্বর-বাগীশ্বরী ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী। হোমকুণ্ড পুজোর জন্য বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীর মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে ধ্যান করবে। হোমকুণ্ডের ভেতর বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীর যুগল রূপ! যুগল-মিলনে রয়েছেন ওঁরা দু'জনে। ওই মিলন নিজেদের মনে মনে অনুভব করতে হবে। পুরুষ ভাববে সে বাগীশ্বর ব্রহ্মা শিব। আর মেয়েরা ভাববে বাগীশ্বরী ব্রহ্মাণী গৌরী। পাশাপাশি পুরুষ আর স্ত্রীতে—পুরুষ-প্রকৃতি ভেবে—যুগল-মিলনে আত্মহারা হয়ে উঠবে। চমকে উঠল নয়নতারা। এসব কি শুনছে?

এর পরেও বলল কুলার্ণব। চক্রে পুরুষের নিজের স্ত্রী নিজের নয়, পাশে বসা অপরের স্ত্রী-ই তার স্ত্রী। চক্রের বাইরে আবার নিজের স্ত্রী নিজেরই। অন্যের নয়।

নতুন কথা, অসম্ভব কথা। এসব শুনে, ছ' ছ'টা জোয়ান-মরদের মুখে-চোখে কোন প্রতিক্রিয়াই ফুটে উঠল না। এ ব্যাপারে ওরা নির্বিকার-নির্লিপ্ত যেন। নয়নতারা অবাক। এরা যখন এমন, তখন হয়তো কুলার্ণব তাকে পরীক্ষা করছে যা তা কথা শুনিয়ে শুনিয়ে।

না, ধারণা ভুল। বোঝা গেল একটু পরেই। মন্ত্র উচ্চারণ করছে কুলার্ণব—ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্যৈ নমঃ। সঙ্গে সঙ্গে চক্রের প্রতিটি পুরুষ দু'হাত বাড়িয়ে দিল তার পাশের স্ত্রীলোকের দিকে। নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলার জন্য। কুলার্ণবও, শ্রীমোহনও।

পাশের পুরুষটির হাত তার গায়ে ঠেকতে সর্বাঙ্গ চন-চন করে উঠল। গরম

রক্তের স্রোত বইছে। পাশের মানুষকে জোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এলো চক্র থেকে। পালাবে।

সমস্বরে চিৎকার করে উঠল নারী-পুরুষ—সকলে। চক্র ভেঙ্গেছে, সাধনা পণ্ড করেছে। উচিতমতন শিক্ষা দিতে হবে ওকে। এগিয়ে এলো শ্রীমোহনই। শিক্ষা দেবে। টুঁটি টিপে শেষ করে দিয়েই।

যে মানুষ মেরে ফেলতে গেছল নয়নতারাকে, সেই মানুষই আবার বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়েও এসেছে। নয়নতারা দেখছে পা দুটো অল্প অল্প নড়ছে শ্রীমোহনের। ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ভাঙার আগের লক্ষণ এটা। মুখ ফিরিয়ে বাইরেটা দেখল। রাতের ঘন অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। বারান্দায় ছাতার কালো কাপড়ে মোড়া বেতকাঠির খাঁচাটা দুলছে। জেগেছে ময়না। নয়নতারার শেখানো বুলি কপচাতে শুরু করে দিয়েছে। সংসার করলে যখন পালন করো আগে, পরে কোরো সাধনা। সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে রোজ শুনতে শুনতে যদি মনের পরিবর্তন হয় শ্রীমোহনের কোনদিন।

বিয়ের পর শাশুড়ী বলেছিলেন নয়নতারাকে, বৌমা! শ্রীমোহনকে তোমার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলুম। কেন এ কথা বলেছেন শাশুড়ী, পরে বুঝেছে নয়নতারা। ছেলেকে ঘরবাসী করে বংশ-রক্ষের জন্য। যত পুরনো হয়েছে নয়নতারা, তত লক্ষ্য করেছে, স্বামী তার রূপে উদাসীন বিষয়ে উদাসীন। রাতে যখন ফেরে বাড়িতে, মুখে উগ্র গন্ধ। নয়নতারার মাথা ধরেছে, কাছে গেছে তবু। ঘরে ঢুকেই কিন্তু থাকতে দিতে চাইত না শ্রীমোহন। শুতে পাঠিয়ে দিত পাশের ঘরে।

ব্যতিক্রম কেবল দেখতে দেখতে চোখের সমুখ থেকে যে রাত সরে গেল। এত ঘুম চোখে—বলার অবকাশ পেল না—ওঘরে শুতে যাও।

কোথা থেকে আসে রাতে? কাছ থেকে সরিয়ে দেয় কেন তাকে? সন্দেহের দানা বাঁধতে লাগল নয়নতারার মনের কোণে। কোন বারবিলাসিনীর খপ্পরে পড়েছে হয়তো। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাতেই অনুসরণ করল। অবিশ্যি শাশুড়ীর মত নিয়ে, আর গোপনে দু'জন বিশ্বাসী লোককে সঙ্গে নিয়ে।

অম্বিকানগর থেকে বেশ খানিক ভেতর দিকে গাছ-গাছড়ায় ভরা জায়গাটা। একটু ফাঁকার দিকে কুলার্ণবের ঘর। মাটির দাওয়ায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ওই দাওয়ার ওপর দিয়েই ঘরে ঢুকল শ্রীমোহন। ঠিকানা দেখে ফিরে এসেছে নয়নতারা। পরের দিন দুপুরে গেছে। যে সময় বাড়িতে থাকে শ্রীমোহন। কেঁদে বলেছে তার স্বামীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে।

ফিরিয়ে দেখা চুলোয় গেল, উল্টে নয়নতারাকে চিরদিনের মতন হারিয়ে যাওয়ার পথে ঠেলে দিচ্ছিল। সাধনাপাগল শ্রীমোহন সংসার না করুক, তার ওপর মায়া-মোহ না থাকুক—কোন খেদ নেই নয়নতারার। সাধনা করতে চায় করুক। নয়নতারা এগিয়ে দেবে। কোন বাধা দেবে না, আটকাবে না। যে রাস্তায় চলছে, এ রাস্তা ঠিক নয়। প্রকৃত রাস্তা এটা নয়। নয়নতারার মন বলছে।

ঘুম ভেঙেছে। বিছানায় উঠে বসল শ্রীমোহন। দু'হাতে চোখ রগড়ে নিয়ে তাকাতেই ভূত দেখল যেন। বলল, তোমাকে না ডাকলে আসতে বারণ করেছি না?

নির্বাক মুখে বেরিয়ে গেল নয়নতারা ঘর থেকে। আগের মানুষের সেই মুখ সেই ভাষা! তা হোক, একটা পরিচয় তো পাওয়া গেছে। ও পরিচয়টা যাতে জেগে ওঠে সেই চেষ্টাই করতে হবে তাকে।

সমস্ত বিষয়ে অসদ্ভাব। শুধু একটা বিষয়ে নয়নতারার সঙ্গে খুব সদ্ভাব জমে উঠল শ্রীমোহনের। সেটা বহু সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীমোহনের যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারে। তীর্থভ্রমণে প্রকৃত সাধুর দর্শনলাভের কথাটা মাথায় ঢুকিয়েছে নয়নতারাই।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এ তীর্থ থেকে ও তীর্থ, ও তীর্থ থেকে সে তীর্থ—ঘুরে বেড়ানো চলল বেশ কিছুদিন। প্রকৃত সাধু আর মেলে না। হতাশায় স্বামী-স্ত্রীর দু'জনেরই মন ক্লান্ত। দেহটাকে টেনে নিয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে ইচ্ছে করছে না আর। ফিরব ফিরব করছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল নয়নতারা—সাধক শ্রীমোহনের গরবে গরবিনী হয়ে ফিরবে শ্বশুর বাড়ির দেশে বাঁকুড়ায়—অম্বিকানগরে। সে আর হলো না।

জগতের কুলুজিতে 'হলো না' বলে যে কোন কথা নেই, সেটা জানতে পারল ত্রিলোকনাথ যাওয়ার পথে। উদয়পুর গাঁয়ের শেষের দিকে এসে। পাহাড়ের একটু ওপরে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দির দর্শন করে, আরো খানিকটা এগিয়ে।

বাতাস গাইছে মন্ত্রের গান। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে তীর্থযাত্রীরা। আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা…। সুর-শ্লোক ভেসে আসছে যেদিক থেকে, সেই দিকে এগোচ্ছে সবাই। একটা ছোট্ট তুষার ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কাছে আসতে দেখা গেল, পাহাড় নয়। একটা তাঁবু। ভেতরে সাদা কম্বলের ওপর মুণ্ডিতশির দিব্যকান্তি পুরুষ স্বামী গুণানন্দ মহারাজ বসে আছেন চোখ

বুজে। খালি গা সাদা কপনি পরা। ইনিই গাইছেন গম্ভীর মধুর কণ্ঠে।...
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিমুচ্যতে।

ডানদিকে লাল কম্বলের আসনের ওপর লাল কপনি পরে বসে আছে দশ থেকে বারো বছর বয়েসের গোটা আষ্টেক ছেলে। ওরা যে-কোন রোগের জীবাণু নষ্ট করার শক্তি বৃদ্ধি করছে নিজেদের। প্রত্যেকে ডান পায়ের উরুর ওপর বাঁ পায়ের পাতা আর বাঁ পায়ের উরুর ওপর ডান পায়ের পাতা রেখে পদ্মাসন করে আছে। মেরুদণ্ড সিধে, দৃষ্টি বুকে। ডান হাত ডান হাঁটুর ওপর, বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর ওপর। টাকরায় জিভের ডগা লাগানো। জালন্ধরবন্ধ মুদ্রা।

তাঁবুটা যেন ঋষিমুনির তপোবন। নয়নতারার খুব ভালো লাগছে। এমনটি যেন খুঁজছিল সে। ভেতর বলছে, গুণানন্দ জন্ম-জন্মান্তরের অতি আপনজন। গুণানন্দই শ্রীমোহনের প্রকৃত সাধনপথের পথপ্রদর্শক।

চোখ খুলে যা বললেন গুণানন্দ, নয়নতারা আরো আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। এ যে অন্তর্যামীর কথা। তার সব প্রশ্নের মীমাংসা। তার জন্যই এই গান গেয়ে ডেকে এনেছেন তাকে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-তত্ত্ব শোনানোর জন্য। শুনিয়েছেন।

আকাশই লিঙ্গ শিব পুরুষ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতিই পৃথিবী যোনিপীঠ মহামায়া। আকাশের আশ্রয়ে পৃথিবী। শিবের কোলে মহামায়া। যুগলে হরগৌরী।

শিবের মঙ্গল রূপের প্রকাশ গৌরীর মিলনে—গৌরীর মধ্যে দিয়ে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবধারা খেলা করে বেড়ায় সর্বক্ষণ, সে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যে সন্তানের আগমন, সে সন্তান দেবশিশু, মঙ্গলের প্রতিমূর্তি—দেশের মঙ্গল জগতের মঙ্গল বর্তমানের মঙ্গল ভবিষ্যতের মঙ্গল।

গৃহী হয়েও এরকম স্বামী-স্ত্রী প্রকৃত শিব-পার্বতীর সাধক-সাধিকা। সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী এরা সংযমী এরা।

গুণানন্দের শিক্ষাদীক্ষা আর আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে নয়নতারা শ্রীমোহন।

নয়নতারা আর শ্রীমোহনের বয়েস হয়েছে অনেক। কত—দেখে বোঝার উপায় নেই। ওদের দিকে তাকিয়ে যখুনি বয়েসের হিসেব করতে গেছি, তখুনি সব ভুলে গেছি। শিব-পার্বতীকেই দেখেছি শুধু চোখের সামনে। ওদের চিন্তা করলে এখনো আমি দেখি তা-ই। আর শুনি—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিমুচ্যতে।
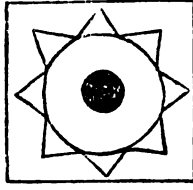
ভয় পাওয়াটাই কাল হলো সরসীর।

ছুটতে ছুটতে চলে আসছে বগুা গাঁয়ের দিকে। পাহাড়ী জায়গা। ভরসন্ধ্যেয় মাঝরাতের অন্ধকার নেমে গেছে। হাড়-কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে।

ভেবেছিল রোদ পড়ার আগেই ডেরায় ফিরবে। হলো না। পালকি থেকে বরকে বরণ করে নামাতেই তো যত দেরী। সেই দেখতে দেখতেই বেলা গেল। আর বিপদ এলো ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে সামনে এগিয়ে।

খুড়তুতো ভায়ের বিয়ে। ভাই বলেছিল কিছুটা পথ সঙ্গে যেতে। এ ভাইকে সরসী হতে দেখেছে, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে মায়ের মতন। ভাই সরসীর চেয়ে বছর দশেকের ছোট। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় সরসীর শাড়ির আঁচল ধরে কি কান্না। যেতে দেবে না কিছুতেই। তখন সরসী ষোড়শী। আর ভাই ছ'য়ে পড়েছে।

বছর চারেক শ্বশুরবাড়ি ছিল সরসী। তারপর ভাগ্যবিধাতা অদৃশ্য হাতে এয়োতীর চিহ্ন মুছে দিল তার। বাপের বাড়ি সব হারানোর দুঃখ বুকে চেপে ফিরে এলো। ভাই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। বলল, দিদি কাঁদিস না অত। কাঁদলে, জামাইবাবুর মতন আমিও চলে যাব কিন্তু।

সরসী চমকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলেছে চোখের জল।

ভায়ের বিয়ে হচ্ছে শ্বশুরবাড়ির গাঁওয়ে।

বর নামানো দেখে, ভাইকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করে ফিরে আসছে একা সরসী, অনুসরণ করল নানকুলালের দলবল। বিধবা হওয়ার পর থেকেই বাপের বাড়িতে রয়ে গেছে সরসী। বাপ-মা যেতে দেয়নি। শাশুড়ীর ভীষণ দুর্ব্যবহার। বিশ বছর বয়সে এসেছে, তিরিশ চলছে—শ্বশুরবাড়ির গাঁওয়ের ধারে কাছে যায়নি একদিনও। এবারে গেছল শুধু ভায়ের কাকুতি-মিনতিতে।

ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে দিয়ে আসছিল। সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছুনোর রাস্তা এটা। ক্ষেত পেরিয়ে মহুয়াবনের কাছাকাছি আসতেই, একসঙ্গে অনেক

পায়ের শব্দ শুনতে পেল। থমকালো একটু। পায়ের শব্দও থেমে গেল। চলা শুরু করল, শব্দও শুরু হলো আবার।

চলতে চলতে মাঝে মাঝে থেমেছে, শব্দও থেমেছে। চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে, দেখতে পায়নি জনপ্রাণীকে। জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ই নজরে পড়েছে কেবল।

পাহাড় দেশের মেয়ে সরসী। জাতে ছত্রী। ভীতু মেয়ে বলে অপবাদ দেবে না কেউ। এরকম অন্ধকারে পথ হারানোর ভয় নেই তার। সেই কত গুপ্তেশ্বর তীর্থযাত্রীকে পথ বাতালে দিয়েছে কত সময়। এগোন! এখান থেকে খানিক গেলেই পাহাড়ের বিরাট গুহা পাবেন। তার ভেতরেই গুপ্তেশ্বর শিব।

তীর্থযাত্রীরা যদি অনুসরণ করত, এমন নেপথ্য থেকে লুকিয়ে করত না। সামনাসামনি এসে দাঁড়াত, জিজ্ঞেস করত। তবে এরা কারা? কেন এভাবে পেছু নিয়েছে তার? জন্তু-জানোয়ারের পায়ের শব্দ নয়। এ মানুষেরই। একজনের নয়, কয়েক জনের।

পা চালিয়ে চলেও নিস্তার পাচ্ছে না সরসী। নেপথ্যের লোকরাও ওর সমান তালে পা ফেলছে। দুঃসহ পরিস্থিতি। ও গাঁওয়েও ফেরার উপায় নেই। জনবসতি ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে এসেছে। বণ্ডাতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ বণ্ডায় পৌঁছুনোও দুষ্কর হয়ে উঠছে! সময় যাবে খানিক।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সরসীর, ঘন জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে। মনে হলো, যারা আড়ালে আসছিল, ফাঁকায় আসবে না হয়তো। কিন্তু যা ধারণা করেছিল, তার উল্টোটাই হলো।

ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে আসতেই, একটা চেনা গলার আওয়াজ শুনে, বুকটা কেঁপে উঠল। বুক শুধু নয়—পায়ের তলার মাটি অবধি। এখান থেকে পালানোর কোন উপায় নেই তোমার। চারিদিকে ঘিরে ফেলেছি আমরা।

সুমুখে এসে দাঁড়াল নানকুলাল। মুখে শয়তানি হাসি।

এই লোককে অনেক হেনস্তা করেছে সরসী। গাঁওয়ে ঢোকার মুখে কুয়োর ধারেই ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হত দু'একদিন ছাড়া। ইচ্ছে করেই আসত। কাঠ ফেলত, পাথরের টুকরো ফেলত কুয়োর ভেতর। সরসীকে দেখিয়েই দেখিয়েই ফেলত এসব।

প্রথম দিনে কাঠকয়লা তৈরীর আধপোড়া কাঠটা জল তোলার সময় হাত ফসকে পড়ে গেছল কুয়োয়। জল আনতে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন সরসী।

হাসতে হাসতেই বকেছিল অসাবধানের জন্য। এরকম করে জল নোংরা করলে হাত দু'খানা কেটে ফেলে দেবো।

জল খাওয়া বন্ধ হলো। নানকুলাল ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, চলে গেল তখুনি কোন কথা না বলে। আবার এসেছে দু'দিন বাদে, কাঠ ফেলেছে, পাথর ফেলেছে জলে সরসীর দিকে চেয়ে চেয়ে। এবারে হাসেনি সরসা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, বেহায়া বেসরম! দূরের যাত্রীরা জল খেয়ে প্রাণে বাঁচে—সেটাও সয় না। এমনতর হাড়বজ্জাত লোক তো দেখিনি কখনো।

এ গাঁওয়ের ওপাশে যেখানে কাঠকয়লা তৈরী হয় সেখানে আসে দু'একদিন বাদে বাদে নানকুলাল। আর পায়ে পা দিয়ে যাকে ঝগড়া করা বলে, তাই করতে চেষ্টা করে। সরসা ওর দু'চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেত। কিছু বলত না আর। চাউনিটা অন্য ধরনের। এরপর আর আসত না সরসা কুয়োর ধারে মোটে।

নানকুলাল আসত যেমন, তেমনি এসেছে। কুয়োর পাড়ে বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। বিমর্ষ মুখে ফিরে গেছে।

নানকুলালকে দেখে হৃৎকম্প হওয়ারই কথা। দৌড়ল দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। উদ্ধার হতে পারল না ওর কবল থেকে।

চিৎকারে পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে প্রতিধ্বনি ঘুরে-ফিরেছে শুধু। কেউ শোনেনি সরসীর আকুল আহ্বান। সাহায্যের জন্য আসেনি কেউ। পালানোর প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সরসার। ধস্তাধস্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষীণকণ্ঠে বলেছে, তোমার প্রকৃতির কথা কোন গাঁও জানতে বাকি থাকবে না, কি হাল হয় তোমার দেখ। ছেড়ে দাও আমায়।

মুহূর্তে লোকটা কেমন হয়ে গেছে। আস্ত একটা হিংস্র-শ্বাপদ। চোখ দুটো রক্তজবা। লোহার মতন শক্ত হাতে সজোরে টুঁটি টিপে ধরেছে। কর্কশ গলায় বলেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরোবার আগেই কথা বন্ধ করে দিচ্ছি চিরজীবনের জন্য।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের চেয়ে আরো ঘন অন্ধকার যে থাকতে পারে, সরসী জানত না। জানতে পারল। এই অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। ডুবে যাচ্ছে কোন্ অতল তলে—কোথায় কে জানে!

অনেক—অনেক দূর থেকে সরসীর কানে ভেসে আসছে কার কথা।—মরে গেছে রে। কুলাচার্যীর বাগানে ফেলে দিয়ে আসি চ। ওর ঘাড়েই দোষ পড়বে।

চেতনাটা আবার অল্প অল্প করে জেগে উঠছে সরসির। বেহুঁশ ভাবটা কাটছে আস্তে আস্তে। পিঠে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে নানকুলাল তাকে। দম বন্ধ করে রইল সরসী।

কুলাচারীর বাগানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল নানকুলালরা। সরসীর নড়াচড়ার কোন ক্ষমতা নেই। কাউকে ডাকাডাকিরও না। গলায় দারুণ ব্যথা। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

রাতভোর পড়ে রইল শিশিরভেজা ঘাসের ওপর। সকালে পূজোর ফুল তুলতে এসে অবাক কুলাচারী। তার বাগানে মড়া! তাও আবার স্ত্রীলোক। ইষ্টদেবী কালীকে স্মরণ করলেন উনি।—একি করলি সর্বনাশী?

মনে হলো চোখ পিট-পিট করে তাকাচ্ছে মড়া। কাছে এগিয়ে এলেন। দেখলেন ভালো করে। চেয়ে আছে একদৃষ্টে সরসী। সরসীকে তুলে নিয়ে গেছেন কুলাচারী পাঁজাকোলা করে। কালীমূর্তির সামনে শুইয়ে দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করেছেন একান্তমনে।

সরসী সুস্থ হয়ে উঠেছে দু'দিনে।

পরে সরসীর মুখে সমস্ত শুনেছেন কুলাচারী। বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। এও বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, সরসী যাই করুক, তাকে না জানিয়ে যেন কিছু না করে।

বাড়িতে গেছে সরসী।

দু'দিন বাইরে থাকার জন্য, একঘরে হওয়ার ভয়ে আশ্রয় দেয়নি কেউ তাকে। চেনা লোকেরা অচেনা হয়ে গেছে তার কাছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে। কথা কইলে পাছে জাত যায়, বংশের মর্যাদা নষ্ট হয়। যে ভায়ের বিয়ে হলো, সে-ও চিনতে পারল না। সরসীকে দেখে মুখ ফ্যাকাশে। ভূত দেখল যেন আচমকা। সরে পড়ল বাড়ি থেকে।

কুলাচারীর কাছে এসে কেঁদে পড়েছে সরসী। কেন বাঁচিয়ে তুললেন? এর চেয়ে মরে যাওয়াই যে ছিল ভালো। আত্মহত্যা ছাড়া আর অন্য কোন পথ দেখা যাচ্ছে না।

ধমকে উঠলেন কুলাচারী।—কোনদিন ওকথা মুখে আনবে না।

তন্ত্রের কুলচক্রের সাধনা করেন কুলাচারী। কুলচক্রে যে-সব পুরুষ বসেন তাঁর নির্দেশ, তাদের মুখের ওপরই দৃষ্টি ওঁর ঘুরছে-ফিরছে। চোখের তারা দুটি নীরবে কত কি প্রশ্ন করছে কে জানে। কত কি উত্তর পাচ্ছেন বোধহয়। সরসী দেখছে ফ্যাল ফ্যাল করে।

কুলচক্রের সাধকদের প্রত্যেকের বীর আখ্যা আর তাদের স্ত্রী—সাধিকাদের ভৈরবী। যে ক'জন বীর এসেছিল লাল রঙের ধুতি পরে আদুড় গায়ে রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে কুলাচারীর প্রধান শিষ্য দীপচাঁদ বলল, আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত। আপনারা দয়া করে আজ্ঞা করুন!

সকলে সমস্বরে বলল, আন্তরিক সম্মতি জানাচ্ছি আমরা। ভৈরবীদের দিকে মুখ তুলতে, তারাও বীরদের কথারই পুনরুক্তি করল।

তন্ত্র শৈববিবাহে জাত-বর্ণ-বয়েসের কোন ভেদাভেদ রাখেনি। অপাংক্তেয়কে সমাজের মাথার মণি করে তোলার জন্য কি মহৎ প্রচেষ্টা। বললেন কুলাচারী।

সরসী বিস্মিত-বিমুগ্ধ। নতুন জগতে এসেছে যেন। নতুন রকমের কথা শুনছে। ভেতরের জ্বালাটা কমেছে। শান্তির প্রলেপ পড়ছে।

পরমেশ্বরি স্বাহা। একশো আটবার জপ করল দীপচাঁদ। কালীমূর্তির চরণে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল। সরসীর সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমার স্ত্রী হবে। আমাকে বরণ কর।

শৈববিবাহের নিয়ম দেখিয়ে দিলেন সরসীকে কুলাচারী। দেবতা জ্ঞানে ফুল দিয়ে পুজো করতে বললেন দীপচাঁদকে।

পুজো করল সরসী। কুলাচারীর নির্দেশ মতন দু'হাত বাড়িয়ে দিল। নিজের দু'হাতে সরসীর দু'হাত ধরে রইল দীপচাঁদ।

কুলাচারী মন্ত্রপাঠ করছেন আর অর্ঘ্যপথের জল ছিটোচ্ছেন দু'জনের মাথায়। সরসীর-দীপচাঁদের।...রাজরাজেশ্বরী কালী তারা বগলা ভুবনেশ্বরী নিত্যা ভৈরবী—এঁরা তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমাদের রক্ষা করুন।

এক দুই তিন...দশ এগারো বারো। দ্বাদশবার এই অভিষেক ক্রিয়া করার পর, সরসী দীপচাঁদ—দু'জনে প্রণাম করল কুলাচারীকে। কুলাচারী ওদের কানের কাছে মুখ নামিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, ঐঁ শ্রীঁ।

মানুষের অতি সুখ বুঝি সয় না। অপ্রত্যাশিত সম্মানও বুঝি মাথায় তার বোঝা হয়ে দেখা দেয়। নামিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে, নিষ্কৃতি পায়। সরসীর কি তাই হয়েছে? দীপচাঁদের কাছে যেতে পারছে না তাই সহজ হয়ে?

ভেবে কিছু ঠিক করতে পারল না সরসী নিজে। মনের যাতনা জানাল কুলাচারীকে। দীপচাঁদের চোখে চোখ পড়ল, স্বামীর চোখ ভেসে ওঠে। মনে পড়ে যায় স্বামীর করুণ মুখ। মনকে অনেক বুঝিয়েছে স্বামী তার অতীত, দীপচাঁদ তার বর্তমান। ফল হয়নি কিছু। ভেসে গেছে দীপচাঁদের মুখ, বড় হয়ে উঠেছে স্বামীর মুখখানা। বিরাট।

সরসীকে বললেন কুলাচারী গম্ভীর মুখে।—তুমি অন্য ধাতুতে গড়া। তোমার অবলম্বন অন্য জিনিস। একই অবলম্বন খাটে না সবার জীবনে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে দিয়ে যে অনন্ত শক্তি বয়ে চলেছে সর্বক্ষণ, সব কিছুর আদি-কারণ যে শক্তি, তন্ত্রে সেই শক্তিকেই দশমহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যা বলা হয়েছে। তৃতীয় মহাবিদ্যাকে ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী বলেও পূজো করেন সাধক। মৃদু হেসে বললেন কুলাচারী, এই শক্তিরই শক্তি তুমিও। ষোড়শী-সাধনায় তৈরী হতে হবে তোমায় সেইভাবে। তুমি আর দেবী অভিন্ন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে তোমার যে শক্তি ঝরে পড়বে ফুলের ওপর, সেই শক্তিই মূর্তিকে জীবন্ত করে তুলবে ফুলের সঙ্গে গিয়ে ঘটে। আবার ঘটের ফুল তুলে নিয়ে আঘ্রাণ করলে, তোমার শক্তিই ফিরে আসবে তোমার মধ্যে। তোমার শক্তিরই পূজো হচ্ছে বাইরে। বাইরে থেকে ভিতরে এসে চৈতন্যময়ী হয়ে উঠছে সেই একই শক্তি, সচ্চিদানন্দময়ী—চিরকালের চিরস্থায়ী বিশুদ্ধ আনন্দ।—ষোড়শীর ধ্যানপূজো করতে হবে তোমায় এইভাবে। কুলাচারীর আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে সরসী।

সরসীর সঙ্গে আলোচনা করে কথা কয়ে দেখছি আমি—সত্যিই পার্থিব জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিশুদ্ধ আনন্দের প্রতিমূর্তি একখানা।

পূজো শেষ হলো। সরসীর পূজো দেখার জন্য বসেছিলুম। আরতি করতে করতে উঠেছে। কাঁসার থালায় সোনার জেল্লা। মাঝখানের বড় প্রদীপটা নিয়ে ন'টা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের আলোয় প্রভাতী-সূর্যের উদয়ের রঙটা ঠিকরে ঠিকরে সরসীর সর্বাঙ্গে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আরতির থালা ঘোরার সঙ্গে গায়ের রঙটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ন'টা প্রদীপের একসঙ্গে। থালা ঘুরছে। সেখান থেকে মূর্তির গায়ে লেপে যাচ্ছে আলোর লাল। মূর্তির গা থেকে আসছে আবার থালায়। থালা থেকে আবার সরসীর সারা শরীরে। এই আসা যাওয়া চলছে একটা অব্যক্ত আনন্দের সেতু ধরে।

অভিভূত হয়ে পড়ছি আমি।

সরসীর দু'পাশে দু'জন স্ত্রীলোক ঘণ্টা বাজাচ্ছে। অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেতরটা ভরে উঠছে আমার। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে আমার ঘণ্টা বাজছে তালে তালে। ঢং ঢং...। সরসীর মুখের বীজমন্ত্রের উচ্চারণ চলছে শব্দে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ...।
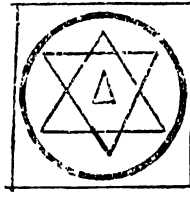
চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল নলিনী। হাত দিয়ে মনীষার মুখখানা চেপে ধরল খপ করে। হকচকিয়ে গেছে মনীষা। নির্জন জায়গায়—হঠাৎ এমনতর অদ্ভুত আচরণে বুকের ভেতরটা যে মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠেনি তা নয়, উঠেছে। উঠেছে একটা অজানা ভয়ে!

নলিনীর ওপর অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। তবুও এ রাস্তায় এসে পড়ার মুখে বিশ্বাসের পর্দায় সন্দেহের ছায়া দুলে উঠেছিল। ওর হাবভাব চালচলন যেন কেমন কেমন। রাস্তার যা বর্ণনা দিয়েছিল—একটুখানি পথ—কিছু মিলছে না। পথের বুঝি শেষ নেই। চলছে তো চলছেই। মনীষা বলেছে, ফিরে চল নলিনা। ভুল পথে চলেছিস মনে হয়।

ওকে অবিশ্বাস করছে,—বুঝতে পারে পাছে, তাহলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে—তাড়াতাড়ি ঢাকতে গিয়ে বলেছেন, তুই সঙ্গে—ভয় নেই। তবে কিনা বাড়িতে বলা-কওয়া নেই, একেবারে লুকিয়ে আসা—দেরী হলো, অফিস থেকে এসে পড়লে, খোঁজাখুঁজি করলে জানাজানি না হয়ে যায়।

চাপতে চেষ্টা করলেও, মনীষার মনের কথা স্বকর্ণে শুনতে পেল যেন নলিনী। বলল—বৌদি! বড়দের মুখে শুনেছি, সময় খারাপ হলে নাকি ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো ভাবে মানুষ। এতদিন তো দেখছ আমায়—আর একটু গেলেই, ঠিক জায়গায় পৌছে যাব। এসে পড়েছি বলে।

এর ওপর আর কি বলবে মনীষা? এই বলে বলে তো এতখানি পথ নিয়ে এসেছে। একদম লোকালয়ের বাইরে। দীঘিরহাট পেরিয়ে অনেক দূরে। চতুর্দিকে বাঁশঝাড় আর ঘন জঙ্গল। ঘরের বাইরে পা বাড়ায় নি কখনো বললেই চলে। সেকেলে কুলবধূ একেবারে মনীষা। এই প্রথম। খানিক গোরুর গাড়ি, তারপর পায়ে হাঁটা। জঙ্গলের কাছ-বরাবর আসতে তবু ছায়া পড়েছে মাথায়। তার আগে তো ভরদুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর ঘোমটা ঢাকা তালু জ্বালিয়ে একশেষ করে দিয়েছে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

একটু ছায়াঘেঁষা হয়ে চলতে গিয়েই মুখ চেপে ধরল নলিনী। বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে খুন করে ফেলবে হয়তো। মনীষা দুর্বল,

নলিনী সবল। নলিনীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করে পেরে ওঠা যাবে না কিছুতেই। না পারা গেলেও, সহজে কি মৃত্যুবরণ করে নেয় সব লোক—না নিতে পারে? যে যত দুর্বলই হোক না, আত্মরক্ষার চেষ্টা একটু করবেই।

গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে, হাত দিয়ে নলিনীর হাতটাকে মুখের ওপর থেকে টেনে, ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে মনীষা। নলিনীও দ্বিগুণ জোরে চেপে ধরে ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছে তালগাছটা। নীচে দিয়ে, বিষধর সাপ একটা এগিয়ে আসছে। ইশারায়ই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে। একটু নড়লে চড়লে, চিৎকার করে পালালে, সাপটার ছোবলের মুখেই পড়তে হবে দু'জনকে। দু'জনের একজনকে আর বেঁচে বাড়ি ফিরতে হবে না।

কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল ওরা দু'জনে। দম বন্ধ করে রেখেছে। নিঃশ্বাসের আওয়াজেও যদি ভয় পেয়ে গিয়ে ফণা তুলে বসে। এমনভাবে গেল সাপটা যেন ওদের পায়ে গা ঠেকিয়েই গেল। সাপ চলে যাওয়ার পর বিপদ মুক্তির আনন্দে নলিনীকে জড়িয়ে ধরেছে মনীষা।—কতদিকে লক্ষ্য রে তোর। উনিশ-বিশ হয়ে গেলে, গেছলুম আর কি!

সন্দেহের মেঘ মনীষার মনের আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল নিমেষে।

যেখানে যার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলল নলিনী মনীষাকে—সেটা কি অজগরের গহ্বর নয়? সে লোক কি অজগর নয়?

আগের চেয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে নলিনীর। হাঁপাচ্ছে। দু'চোখের তারা ঘুরছে ঘন ঘন। কত কি দেখছে আর ত্রাসে চমকে চমকে উঠছে। একটা আধটা মুণ্ড নয়, কতকগুলো। সব ক'টা একসঙ্গে তেড়ে আসছে তার দিকে। গিলতে আসছে। এইভাবেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হবে বুঝি তার। প্রতিটি অঙ্গ কড়মড় করে চিবিয়ে শত টুকরো করে ফেলবে। তারপর যতটা পারে ততটা করে গিলবে এক একটা মুণ্ড। যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ পালা করে।

নলিনীর চোখমুখ দেখে, বেশ বোঝা যাচ্ছে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা ওর ভেতর কুরেকুরে খাচ্ছে। অন্যায়বোধের অনুশোচনা পাগল করে তুলেছে ওকে। আমার করার কিছু নেই। দর্শকের ভূমিকা। তীর্থঙ্কর সাধু তো ধ্যানমগ্ন। তিনি ত্রিপুরভৈরবী মূর্তির সামনে আসনে বসে। দেবীর রঙের লাল আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে তীর্থঙ্করের সর্বাঙ্গ। টকটকে লাল শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে দেবী। চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা গলায়। মুখে মৃদু হাসি, কপালে অর্ধচন্দ্র।

দেবীর দু'হাতে জপমালা আর জ্ঞানের ভাণ্ডার-বই। অন্য দুটি হাতে বর আর অভয়।

ত্রিনয়না দেবীর সাধনায় সিদ্ধ তীর্থঙ্কর।

তীর্থঙ্করের দেহ ধীরস্থির পাথরের মূর্তি যেন। কেবল নিঃশ্বাসের টানা ছাড়ার শব্দটাই শোনা যাচ্ছে। সে শব্দ জপ করছে দেবীর বীজমন্ত্র।—ওঁ হস্‌রৈং হস্‌ফলরীং হস্‌রৌং। সে শব্দ প্রার্থনা করছে মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে—বিশ্বের বিবেক জাগিয়ে তোল তুমি চৈতন্যময়ী। অশুভ বুদ্ধি অশুভ হয়েও তোমার ছোঁয়ায় শুভ হয়ে ওঠে। অশুভ থেকে ছিন্ন হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। তোমার গলায় ছিন্নমুণ্ডর মালা হয়ে দোলে। তোমার অভয় নেমে আসুক মানুষের ভয়ের রাজ্যে। তোমার আশীর্বাদে মানুষের পরিচ্ছন্ন বিবেক জেগে উঠুক, জেগে উঠুক।

উঠে পালাতে চেষ্টা করল নলিনী। পারল না। পা হাত অসাড় হয়ে গেছে। বিশ্বজোড়া ভয় গ্রাস করছে ওকে। দেবীর গলার মুণ্ডমালা ওকে ছাড়ছে না কিছুতেই। এখানে আসার সময় কিন্তু এমনটি হয়নি। মূর্তিকে দেখে মাটিরই মনে হয়েছে। তীর্থঙ্করকে দেখে সাধারণ মানুষ মনে হয়েছে। ধুনুচিতে গুগগুলের ধোঁয়া উঠছে। ভরে যাচ্ছে ঘর। চতুর্মুখী প্রদীপ জ্বলছে ঘটের দু'দিকে। কুশাসনের ওপর বাঘের ছাল পাতা। তীর্থঙ্কর এই আসনের ওপর বসে। পরনে লাল ধুতি। দাড়িগোঁফে মুখ ভর্তি। ঘাড় অবধি কুচকুচে কালো চুল। ষাটেও ছাব্বিশের লাবণ্য।

ধ্যান-জপ শুরু করলেন উনি। ওঁর নিঃশ্বাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। যে ক'জন বসে আছি আমরা, নিজেদের অজ্ঞাতেই 'বিবেক জেগে উঠুক' প্রার্থনার নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন উঠছে ভেতরে আশ্চর্যভাবে। অন্ধকারে জমাট বাঁধা হৃদয়ের তীর ভেঙে সঞ্চিত অন্যায়ের স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। বীরাচারী তীর্থঙ্করের কাছে সব প্রকাশ না করে নিষ্কৃতি নেই যেন, শান্তি নেই যেন। এমনই ওঁর জপ-ধ্যানের গুণ। দেবীর সাধনায় ওঁর সাধনা-লব্ধ বিবেক প্রভাব বিস্তার করে সকলের ভেতরে তাদের অজান্তেই। আচ্ছন্ন বিবেক জেগে ওঠে। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তারা।

ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নলিনী।

দেবীর মুখের হাসি ফুটে উঠেছে তীর্থঙ্করের মুখে। উনি যেন সকলের মন দেখছেন, মনের কথা বুঝলেন। বিবেক জেগে ওঠার আনন্দটা উপভোগ করছেন।

নলিনীর বুক ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে সেই গোপন রহস্য যেটা ঘটেছিল মনীষাকে নিয়ে। সুখেশের কাছে যে বিষয় অজ্ঞাত ছিল এতদিন। অত অনুগত স্ত্রীর মন থেকে কি করে হারিয়ে গেছল সে।

সুখেশও বসে আছে ঘরে।

দেবীর গলার মুণ্ডমালার দিকেই লক্ষ্য নলিনীর।

হ্যাঁ, সে-ই যত সর্বনাশের মূল সে যদি না সহায় হত বৌদি কি ওরকম হয়ে যেতে পারত? দোষী অপরাধী সে। স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য অশান্তি ঘটানর কারণও তো সে-ই।

জঙ্গলের মধ্যে ছিটেবেড়ার সেই ঘরেতে নিয়ে গেছল নলিনী মনীষাকে। মনীষার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছল ভয়ে। বড় একখানা ঘর। টিনের চালাটা কিন্তু অনেক উঁচুতে। ওঘরে থাকে না কেউ। ও ঘর যার, সে বাইরে শোয়। দড়মা ঘেরা দালানে। সে ঘরে এলো। চেহারাটা এমন বীভৎস ধরনের, দেখে শিউরে উঠল বৌদি। কাঁপছে। যে এলো, ইঙ্গিতে নলিনীকে ধরে বসিয়ে দিতে বলল। মনীষাকে বসিয়ে দিয়েছে নলিনী।

ওখানে নিয়ে যেতে বলেছিল বৌদির মেজ খুড়শাশুড়ী। লাগোয়া বাড়ি। উঠোনের মাঝখান দিয়ে আকাশছোঁয়া পাঁচিল উঠে গেছে। এ বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির জানলা দেখার জো নেই।

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নলিনীকে ডেকেছিল শাশুড়ী। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলেছিল, এ কাজটা অতি অবিশ্যি করবি কিন্তু। ঘুণাক্ষরেও কেউ না টের পায়। দিব্যি রইল। তোর বৌদিও না জানতে পারে যেন। খুব হুঁশিয়ার হয়ে সব করবি। ও জায়গাটা দূর থেকে আমিই তোকে চিনিয়ে দিয়ে আসব।

খুড়শাশুড়ী যে একটা অমন সুখের সংসারকে ছারেখারে দিতে বসেছে—এটা কেমন করে ঢুকবে নলিনীর মাথায়? শাশুড়ীর কথামতো সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় সমস্ত কিছু করে গেছে।

ওখান থেকে বাড়ি ফিরল বৌদি। একেবারে গম্ভীর। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা নয়। মানুষটা পালটে গেল একদম। এরপর থেকেই অশান্তির আগুন জ্বলল বাড়িতে। দাদাবাবুকে দেখলেই বৌদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেঁদে-কেটে সারা হয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে দাদাবাবুকে উদ্দেশ্য করেই বলে, তোমার জন্যই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, মুখ দেখতে চাই না, মুখ দেখতে চাই না।...

জেগে উঠলে দাদাবাবু কত না বুঝিয়েছে—কত না প্রশ্ন করেছে—কি ব্যাপার জানার জন্য। উত্তর মেলেনি। বৌদি নির্বাক। শুধু দু'চোখ উপচে জল ঝরেছে। সব দেখে-শুনে নলিনীও মুখ খোলেনি। খুলতে পারেনি আরো অনিষ্ট হওয়ার ভয়ে। জঙ্গলের মধ্যে সে শাসিয়ে দিয়েছিল, সেই ভয়ে। বলেছিল, যা হওয়ার তা তো হয়েইছে—এ সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেলে, তোর দাদাবাবুরই জীবন নিয়ে টানাটানি পড়বে শেষে। খুব সাবধান।

বৌদিকে সুস্থ করে তোলার জন্য, ডাক্তারবদ্যি দেখানোর কোন ত্রুটিই করেনি দাদাবাবু। ফল হলো কই? উল্টে আরো বেড়েই চলেছে, ডাক্তারদের অনেকেই বলেছে, মনের রোগ নাকি। তাদের ওষুধ-বিষুধে আগের মনের বৌদি আর ফিরে এলো না। বৌদিকে নিয়ে যখন হুলুস্থুলু চলেছে, তখন ওবাড়িতে হাসির হুল্লোড়। এ সবের জন্য দায়ী তো একমাত্র নলিনীই। নয় কি?

দেবীর বাঁদিকে একটু তফাতে একটা লাল কম্বলের আসনের ওপর বসে আছে মনীষা। তীর্থঙ্করের ভুরুর মধ্যিখানে দৃষ্টি। ওইখানেই লক্ষ্য রাখতে বলেছেন তীর্থঙ্কর মনীষাকে। বন্ধুর পরামর্শে সুখেশ নিয়ে এসেছে এখানে।

তীর্থঙ্করের ভুরুর মধ্যিখানে দৃষ্টি থাকলেও দেখছে মনীষা অনেক কিছু। দেখছে, তার মনে যে বদ্ধমূল ধারণা গেঁথে বসেছে—সেটার উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছিটেবেড়ার ঘরটায় ঢুকতেই নজরে পড়ল বিরাট কালীমূর্তি। টিনের চাল ছুঁই ছুঁই অবস্থা মুকুটের। এমন ভয়াবহ মূর্তি জীবনে দেখেনি মনীষা। জটেশ্বরী ঘরে ঢুকল। ওর কাছেই নিয়ে এসেছে নলিনী। ওর অনেক গুণের কথা বলেছে। ও নাকি অসাধ্য সাধন করে। যাদের করেছে, তারাই তো এখানকার খবর দিয়েছে নলিনীকে। মনীষার দুঃখমোচনের জন্য। মনীষার ব্যথায় কাত তারা—এমন পরোপকারীরা।

মনীষার ওপর যে নলিনীর আন্তরিক সহানুভূতি—মনীষা জানে ভালো রকম। তার বিয়ের আগে থেকেই নলিনী এসেছে। বিধবা হওয়ার পরে। নিজের ছেলে নেই, সুখেশকে ভালোবেসেছে ছেলের মতন। শাশুড়ী চলে গেছে বলে একদিনও বুঝতে দেয় নি মনীষাকে। কি প্রাণঢালা স্নেহ। নিজের মায়ের কাছেও অতটা পায় নি।

জটেশ্বরীর জটা নয় তো একটা অজগর। অজগরটাকে টেনে টেনে নিয়ে এসে, শীর্ণকায়া জটেশ্বরী ধপাস করে বসে পড়ল হরিণছালের আসনের ওপর। কেন এসেছে মনীষা—নলিনীর মুখে শুনল। শুরু করল পূজো। এ পূজো খালি

চাওয়া আর পাওয়া। খনখনে ভাঙাগলায় চিৎকার করে উঠছে জটেশ্বরী—দে, প্রসাদ দে।

জটেশ্বরী শূন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফল ফুল সন্দেশে দু'হাত ভরে যাচ্ছে। দেবীর প্রসাদ নে—বলে, মনীষার হাতে ফল মিষ্ট তুলে দিল। হেসে বলল, মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে গেলি। মা যা বলে শোন্। মুখের দিকে চেয়ে থাক্। মূর্তির মুখ দিয়েই যেন কথা শুনল মনীষা। ছেলে হলো আর মরে গেল। দু'দুটো। কেন জানিস? দোষ সুখেশের। ছেলে তোর মেজ খুড়শ্বশুর। আসছে আর যাচ্ছে। প্রতিশোধ নিচ্ছে। আরো নেবে। তোদের ওই অংশটা তার ইচ্ছে ছিল। পেঃনেরটা দিয়েছে সুখেশ। সুখেশের জন্যই তোর এই দুর্ভোগ সারা জীবন চলবে।

উপায় কি? কেঁদে বলেছে মনীষা।

কোন উপায় নেই। কেঁদে কেঁদে প্রায়শ্চিত্ত কর। ভাগ্য যদি ফেরে কোনদিন। হ্যাঁ, এসব কথা প্রকাশ যেন না হয়। হলে সুখেশের মৃত্যু অনিবার্য।

পাগলের মতন হয়েই বাড়ি ফিরেছে মনীষা।

তীর্থঙ্কর তাকালেন মনীষার দিকে। ওর ভুরুর মাঝখানে চোখ আটকেছে। এবার দেখছে মনীষা, বিরাট কালামূর্তি ফাঁপা। পেছন দিকে মূর্তির গায়ে একটা ছোট্ট দরজা বসানো। মনীষার ভেতর কে যেন কথা কয়ে উঠছে। —জটেশ্বরী যা দেখিয়েছে—ভেল্কি। কালী কথা কয়নি। কয়েছে মূর্তির মধ্যে অন্য মানুষ।

নলিনীর দিকে চোখ ফেরালেন তীর্থঙ্কর। একই দৃশ্য দেখল ও-ও। চিৎকার করে বলে উঠল, পালিয়ে এসো বৌদি! খুড়িমার কারসাজি বুঝতে পারা গেছে।

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল মনীষার। কেটে গেল নলিনীর। তীর্থঙ্করের ইঙ্গিতে সুখেশের পাশে এসে বসল মনীষা। ভেতরে আনন্দের ঢেউ। বাইরে মধুর হাসির ছোঁয়া মুখে।

সুখেশ দেখছে আগেকার মনীষাকে।

তীর্থঙ্কর দেখছেন, ত্রিপুরভৈরবীর সাধনা তাঁর সার্থক। এদের বিবেক জেগে উঠেছে। সত্য দেখেছে এরা। ভুলের ভূত পালিয়ে গেছে। অশান্তির আগুন নিভে গেছে। ধোঁয়াটা পর্যন্ত নেই।

ভৈরবী স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন তীর্থঙ্কর সুরে ছন্দে।··অভীষ্ট ফলাপ্তয়ে।···চৈতন্যমাত্রতনুমম্ব তবাশ্রয়ামি।

আশ্চর্য হয়ে গেছি, আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট একটি ছায়ামূর্তি দেখে। ছায়ামূর্তি নারীর। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। সাধনচক্রের সকলের পেছন দিয়ে ঘোরার সময় প্রত্যেকের মাথায় হাত ঠেকিয়ে গেল আলতোভাবে। নারীদেহের মাথা থেকে পা অবধি ফিনফিনে পাতলা চাদরে ঢাকা।

চোখ না খুলেই, যে যার মনের ইচ্ছে জানাল যোগিনীকে। আদেশ না পেলে, যোগিনীকে দু'চোখ খুলে দেখার নিষেধ ছিল নীলকণ্ঠের। ওরা কেউ বলল, যোগিনী, আপনি আমার মা। কেউ বলল বোন। কেউ বলল স্ত্রী। তন্ময়ও শেষের দলে। সে স্ত্রী হিসেবেই চাইল যোগিনীকে।

ভদ্রেশ্বরে নিয়ে এসে, নীলকণ্ঠের সঙ্গে তন্ময়ই আমায় পরিচয় করিয়ে দেয়। আছি ক'দিন। নীলকণ্ঠের সাধনা দেখেছি। আর দেখেছি তন্ময়ের সাধনা। তন্ময়ের বয়সী আরো আট ন'জন যুবকও বসে সাধনচক্রে। আমি ভাঙা শিব-মন্দিরটার এককোণে একটা কম্বলের আসনে বসে থাকি চুপচাপ।

সাধনচক্রে বসার আগে ওরা নেশায় টর হয়েই এসেছে রোজ। রাতের তৃতীয় প্রহরে সকলে মিলে সাধনা শুরু করেছে। নীলকণ্ঠ প্রতিদিনই আসনে বসার পর ওদের নির্দেশ দিয়েছে—তোমরা যোগিনীদেবীকে চিন্তা করবে। দেবী আসছেন তোমাদের কাছে। তাঁকে যেভাবে দেখতে চাইবে তোমরা—মা বোন স্ত্রী—সেই রূপেই তোমাদের দেখা দেবেন তিনি।

নীলকণ্ঠের কথায় অবিশ্বাস এলেও, ব্যাপারটা কি, দেখার কৌতূহল হয়েছে খুব। নিজে সচেতন থেকেছি, চোখও সতর্ক রেখেছি।

যোগিনীকে রোজ আসতে দেখে, আমার কেমন সন্দেহ হলো। মনে হলো যে আসে, সে রক্তমাংসের একটি সুশ্রী তরুণী। লোকের চোখে ধোঁকা দেয়ার ব্যবসায় নীলকণ্ঠের এ ভাড়া করা মেয়ে। যোগিনীর অভিনয় করে প্রতি রাতে।

তন্ময়কে বললুম মনের কথা। বললুম, মদে বুঁদ হয়ে না থেকে, চোখ খুলে ছাখো না একদিন! মেয়েটার পেছু নাও।

আমার কথামতন কাজ করেছে ও। আমার সন্দেহ অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ

হয়ে গেছে। সত্যিই একটি এই দুনিয়ারই মেয়ে—মানসী। তবে এ মেয়ে নীলকণ্ঠের ভাড়া করা নয়। নিজের। বিধবা। পাছে মানসী বিপথে যায়, সেই ভয়ে বাপই মেয়েকে যোগিনীর সাধনা শিখিয়েছে। ও নিজেকে যোগিনী ভাবে। মানবী ভাবে না। ওদের সাধনার সময় মানসীর মনে হয়, সত্যি সত্যিই তাকে ডাকছে সাধনচক্রের সাধকরা। আনমনে চলে আসে মানসী। আশীর্বাদ করে ফিরে যায় আবার।

হাসি চাপতে পারি নি আমি। হাসতে হাসতেই বলেছি, তোমার নীলকণ্ঠ ভালো গল্প বানাতে জানে দেখছি। যাই হোক, মহাখপ্পরে পড়েছ তুমি। হুঁশিয়ার না হলে বিপদে পড়বে।

মানসীর বিয়ের দু-একটা কথা না বলে পারি নি—যে-সব প্রশ্ন উঠেছিল আমার মনে। আচ্ছা, মানসী না হয় যোগিনীর ভাবে বিভোর হয়ে আছে দিনরাত, কোন কিছুতে আসক্তি নেই ধরে নিলুম, সংযমীও মেনে নিলুম, কিন্তু একটা কথা খোঁচা দিচ্ছে ভেতরে—স্বস্তি পাচ্ছি না। যেভাবে দেখতে চাইছে যে, সেই রূপে দেখা দেবে যোগিনী তাকে—এ কিরকম কথা? মা বোনে বাধা নেই। কিন্তু স্ত্রী?

আমি অবাক। নীলকণ্ঠ যে কতখানি শয়তান—তন্ময়ের জবাবে মালুম হলো।—উনি নিজেই বলেছেন, যারা অসংযমী, তাদের কাছে ওকথা না বললে ত্রিসীমানায় আসবে না আর। উচ্ছৃঙ্খল-জীবন থেকে রোখা দায় হবে ওদের। এলে গেলে, ওদের মন পরিবর্ত্তন উনিই করিয়ে দেবেন। ওরা তখন স্ত্রীর রূপে দেখার চিন্তাই করতে পারবে না মায়ের রূপ ছাড়া।

এরপর আর কি-ই বা বলার আছে আমার! স্থানত্যাগ করেছি। তন্ময়ের ভাগ্যে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে।

অনেকদিন বাদে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তন্ময়। হাসি হাসি মুখ। দু'চোখের তারায় খুশি নাচছে। আমি ভাবলুম, বলতে এসেছে বুঝি—নীলকণ্ঠের ওখানে যাওয়া ছেড়েছে। তা নয়। আমাব ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে, পঞ্চমুখে সুখ্যাতি শুরু করল নীলকণ্ঠের। সেই সঙ্গে মানসীরও।

বিরক্তির একশেষ। উঠতেও পারছি না, শুনতেও পারছি না। তবু বসে থাকতে হচ্ছে, শুনতে হচ্ছে। একনাগাড়ে মুখস্থের মতন বলে চলেছে তন্ময়। —কি ভুল যে করলেন জীবনে—নিজেও জানেন না। টিকে থাকলে অনেক কিছু দেখতে পেতেন, নীলকণ্ঠ মানসীকে তৈরী করেছে বটে। মেয়ের মতন মেয়ে।

সেদিন একটি স্ত্রীলোক এসে ধরে বসল মানসীকে। স্বামীর অত্যাচারে তিষ্ঠতে পারছে না ঘরে। মদে আকণ্ঠ ডুবিয়ে, প্রতি রাতে প্রহারে জর্জর করে ফেলছে স্ত্রীকে। মানসী বলল, নিয়ে এসো তোমার স্বামীকে—একবার দেখি।

স্বামী এলে, আচ্ছা করে শাসিয়ে দিল, ফের যদি কোনদিন গায়ে হাত তুলেছ তো তোমার কি হয় দেখো।

বিশ্বাস করে নি স্বামী। মুচকি হেসে বেরিয়ে গেছে।

পরদিন ভোর না হতেই, ছুটে এসেছে। মানসীর দু' পা জড়িয়ে ধরে বলেছে, ক্ষমা কর। বাঁচাও।

স্ত্রীকে আঘাতের উদ্দেশ্যে হাত ওঠাতেই, স্বামীর হাত অবশ হয়ে এসেছে। আর সেই সঙ্গে মানসীকে দেখেছে। রক্তচক্ষু—কি উগ্রমূর্তি। এখনো ভয় যায় নি।

নীলকণ্ঠ নাকি তন্ময়কে বলেছে, অনিমা-লঘিমা সাধনায় সব কিছুই সম্ভব। দেহ হালকা মনে হয়, মনে হয় শূন্যে ভেসে ভেসে যাচ্ছে মেঘের মতন—মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার দেহের ছাপটা—ইচ্ছে করলে—অপর জায়গায় গিয়ে হাজিরও হয় সঙ্গে সঙ্গে। অবিশ্যি দেহের ভার-ওজন নেই—হালকা হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—এ চিন্তা এ ধ্যান একমনে অভ্যেস করতে হয় বহুদিন ধরে। অভ্যেসে ফাঁকফাঁকি থাকলে, ফল হয় না।

একটুও বিশ্বাস করিনি তন্ময়ের কথা। নীলকণ্ঠ ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে। ওকে বলে কোন লাভ হবে না যে স্বামী-স্ত্রী নীলকণ্ঠের দালাল। ও বুঝবে না, শুনবে না; শুনবে না। অনিমা-লঘিমার ব্যাখ্যা যা করেছে নীলকণ্ঠ —পুঁথি থেকে সবাই পারে। কাজে ক'জন করে। নীলকণ্ঠ বা মানসী এই সাধনায় সিদ্ধ—এটা ঠিক নয়। ভেকধারীদের অনেক কিছু কণ্ঠস্থ করে রাখতে হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য, আর নিজেকে সত্যি সাধু প্রতিপন্ন করার জন্য। নীলকণ্ঠ ভীষণ ধুরন্ধর। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল আমার।

তন্ময় রেগে আগুন। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। কি বলতে যাচ্ছিল, বলল না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রায় চারপাঁচ বছর বাদে তন্ময়ের সঙ্গে আবার দেখা। অমরনাথের পথে। সঙ্গে মানসী। দেখা মাত্রই সার। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলিনি। কথা কইতে ইচ্ছে ছিল না আমার। তন্ময়েরও তা-ই হবে হয়তো। চোখাচোখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মানসীর হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে উঠেছে আমার।

ভালো ছেলে তন্ময়টাকে বোকা বানিয়ে কৃতিত্ব দেখানো হচ্ছে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে পেছু পেছু। লজ্জাসরমও নেই। দু'কান কাটা আর কাকে বলে।

অমরনাথ দেখে ফেরার সময়, ভুল করে যে রাস্তায় এসে গেছি আমরা, তন্ময়ের পাণ্ডাও সেই ভুল করেছে। ওরাও এসেছে। আবার আমাদের মুখোমুখি হতে হলো। জায়গাটায় প্রবেশ সহজ, কিন্তু বেরোনো খুব মুশকিল। চতুর্দিকে মৃত্যুর হাতছানি। পাণ্ডাদের হুঁশিয়ারি—কেউ একপাও নড়বে না। ঘোড়ার পা ডুবে যাচ্ছে বরফে। তলায় নদী আছে বোধহয়। আমাদের পাণ্ডা বলল, বরফের ঢালু জায়গা দিয়ে গেলে, রাস্তা পাওয়া যেতে পারে। তবুও চিন্তা করে দেখতে হবে।

এমন অবস্থায়—মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন যেখানে—তড়িঘড়ি কোন কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না। হঠকারিতা যেন না করে কেউ। ঢালুটার ওপর কেউ যেন না যায়, না বলা পর্যন্ত। ভালো করে পরীক্ষা করে নেয়া হোক আগে।

বারণ শুনতে শুনতে মানসীর মাথায় কি ঢুকল কে জানে। ঢালুর দিকেই দৌড়ল। পেছনে তন্ময়। একেই বলে মরণ টান। ওরা যেখান দিয়ে দৌড়চ্ছে, পায়ের চাপে পাতলা বরফ মড় মড় শব্দে ভাঙছে। জলের ফোয়ারা ছুটছে। জলে জলময়। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের।

বরফের ঢালু দিকটায় গিয়ে বসল ওরা। নামছে স্লিপ খেয়ে খেয়ে। আগে মানসী, পেছনে তন্ময়। তন্ময়ের পেছনে যে বরফের ধস নামছে, সে খেয়াল নেই কারো। ধসে ববফ ফাটছে, খসছে। তলার নদীর জল ক্রুদ্ধ আক্রোশে ওপরে ঠেলে উঠছে। সাদা ফেনায় তুষারের ঢেউ উথলে উথলে উঠছে যেন। এখুনি হয়তো বরফের চাদর ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে তলার বন্দিনী নদীটা মুক্তি পাবে। ছুটবে দুর্বার গতিতে। চক্ষের নিমেষে মানসী-তন্ময়কে ডুবিয়ে মারবে হিম-শীতল জলে।

পাণ্ডারা পাথর। গুজররা ঘোড়ার লাগাম ধরে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা নিস্পন্দ নিথর। কারো মুখে কোন কথা সরছে না। সবার যেন সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরে আনার সাহস নেই কারো।

টাল সামলাতে না পেরে, গড়াচ্ছে তন্ময়। আমাদের দিকে চেয়ে হেসে কুটিকুটি। ফুর্তি আর ধরে না। ভাবখানা—তোমরা যেমন এলে না, বোঝ এবার। পায়ের তলার বরফ গললে, ডুবে মরবে। আমরা? মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলুম কেমন। তন্ময় বুঝছে না—মৃত্যুর মরণ-থাবা ওর মাথায় আঘাত হানল বলে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢালু জায়গার সমস্তটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল একেবারে। বরফের কোন চিহ্ন অবধি রইল না। ভয়ঙ্করী নদীর কোলে আছড়ে পড়ল দু'জনে।

মানসী ভাসছে, কিন্তু তন্ময় ডুবে যাচ্ছে। জলের ওপর দু'হাত তুলে কিছু ধরার চেষ্টা করছে। পেছনে ঘাড় ফেরাতে মানসীর লক্ষ্য পড়ল। এতটুকু দেরী না করে শাড়ীর আঁচলটা ছুঁড়ে দিল তন্ময়ের দিকে। বলল, চেপে ধরে থাকো, ছাড়বে না একদম।

আমি বিস্ময়বিমূঢ়।

মানসী ভেসে চলেছে আকাশের মেঘের মতন দুলে দুলে। জলে থেকেও জল না ছুঁয়ে যেন। নিজের মতন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তন্ময়কেও। তন্ময়ের মুখ থেকে মৃত্যুভয়ের কালো ছায়াটা মুছে গেছে। দু'চোখে মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভয়। ও যেন মায়ের আঁচল ধরে মহাকালকে বিদ্রূপ করতে করতে ভেসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাকেও বিদ্রূপ করছে।—আমার কথা তো বিশ্বাস করনি। এখন চোখে দেখেও কি বিশ্বাস হচ্ছে না মানসীকে!

আমি দেখলুম, মৃত্যুগহ্বর থেকে অনায়াসে বেরিয়ে গেল ওরা। তীরে উঠে হাসছে মানসী। আমায় দেখছে।

আমার অন্ধদৃষ্টিতে মানসীকে এতদিন অন্ধকারই দেখেছিলুম। আলোর মানসীকে দেখলুম চাক্ষুষ। দেখলুম অনিমা-লঘিমা সাধনার শক্তি। যোগিনী সাধনার মহাশক্তি।

এপার থেকে অসংখ্য প্রণাম জানাচ্ছি আমি মনে মনে। মানসীকে—শক্তিকে—মহাশক্তিকে।
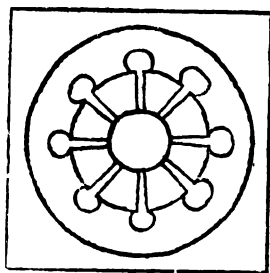
দু'চোখের তারায় আকাশের সবটুকু নীলে টইটম্বুর। দেখলে ভেতর জুড়িয়ে যায়, প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু এই নীলেও যে এক সময় কালো গরল উপচে পড়েছিল—কেউ কি বিশ্বাস করবে? করা কঠিন।

কঠিন হলেও মনোময় আমাকে জোর করে বিশ্বাস করাবে—সে একদিন অসৎ ছিল। অসতেরও নানা প্রকৃতি থাকে। সে চরম প্রকৃতির, অর্থাৎ খুনী। একটা জলজ্যান্ত জওয়ানকে ঠাণ্ডা মাথায় শেষ করেছে।

শুনে শিউরে উঠেছি। খুনের কাহিনী শুনতেও কেমন লাগছে আমার। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। সে উপায় নেই। বেরোনোর মুখে বসে রয়েছে মনোময়।

যার যে ভাবটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, সে ভাবটা চেঁচেছুলে মন থেকে তুলে ফেলতে গেলে বড় কষ্ট। ওকে দেখে ভালো লেগে গেছল। কতকগুলো জিনিস দেখেছিলুম বসে বসে। প্রশ্ন করেছি তাই। জানার কৌতূহল চাপতে গিয়েও চাপতে পারি নি। তার ফল যা ফলল, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন পস্তাচ্ছি। ওকে নিয়ে যে ধারণা করেছিলুম, কিছু না জিজ্ঞেস করলেই হত। প্রাণভরা আনন্দে বিষাদের ছায়া কাঁপত না তাহলে এমন করে।

বললুম, দরকার নেই শুনে। কার অতীত অন্ধকার ছিল কি আলোয় ঝকমক করত—এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমি। কে কার কথা শোনে, নাছোড়বান্দা মনোময়। তার কথা আমাকে শোনাবেই।

অগত্যা শুনতে হচ্ছে আমাকে। ওর কথাতেই বলি—

খুন করার পর এদেশ-ওদেশ করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। কোন জায়গায় স্বস্তি পাইনি, শান্তি পাই নি। কেবলি মনে হয়েছে, সাজা পাওয়া উচিত আমার। মৃত্যুদণ্ড হয়, হোক। এ পাপ মুছে যাক পৃথিবী থেকে, নরক-যন্ত্রণা থেকে অন্তত রেহাই পাই।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই অঞ্জন বছর আটেকের বড় আমার চেয়ে। ওর

তখন আটাশ, আমার্ কুড়ি। আটাশেই চরম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ল। রাতে প্রায়ই বাড়ি ফেরে না, দিনে ঘরে খায় না। মনোকষ্টে আর ভাবনা-চিন্তায় বৌদি শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। গায়ের রক্ত উবে যাচ্ছে, সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে একেবারে। চার বছরের বাচ্চাটার জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা।

একদিন আমাকে ডেকে বলল, আমার ওপর এত বড় অবিচার হচ্ছে মুখ খুলে তোমরা কেউ একটা কথাও বলবে না? আমার জন্য না হয়—পরের মেয়ে—তোমাদের বংশের রক্ত, দুধের বালক—ভাইপোটার হয়েও কি কিছু বলতে নেই? এইভাবে লোকটা ভাসবে, আর তোমরা বসে বসে দেখবে চুপচাপ? আটকানোর কি কোন পথ বার করা যায় না?

অনেক ভেবেছি আমি। শেষে উপায়ান্তর না দেখে, বৌদির সিঁথির সিঁদুর মোছার আমিই একমাত্র কারণ হয়ে উঠলুম। অঞ্জনদাকে ফেরাতে গিয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেললুম।

এতদূর অবধি শোনার পরও মনোময়ের কথা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। এই মানুষই আমাকে বাঁচানোর জন্য পাথরমূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। একটু নড়লে-চড়লে পাছে আমি লতাপাকানো দড়িটার ওপর থেকে পড়ে যাই নিচে খরস্রোতা কৃষ্ণগঙ্গার বুকে।

লতাপাকানো দড়িটা দু'পাড়ে দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা। তলার দড়িতে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি। ওপরের দড়িটাও দু'হাতে ধরা। মনোময় আমারই মতন ওইভাবে ওদিক থেকে আসছে এদিকে। আমি যাচ্ছি এধার থেকে ওধারে। দু'জনে মুখোমুখি। দু'জনের চলার ভারে পায়ের তলার দড়িটা দুলছে যত, হাতে ধরাটাও তত। এরকম দুলতে থাকলে পতন অনিবার্য।

বুদ্ধি করে এগোলো না আর মনোময়ই। যে পর্যন্ত এসেছিল, থেমে গেল। নির্বিঘ্নে আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিল। মানুষটাকে একটু আধটু নয়, সত্যি সত্যিই খুব ভালো লেগেছে আমার। এরপর নিজে থেকেই পরিচয় করেছি। সঙ্গে এই সারদাপীঠেও এসেছি।

সারদাপীঠে সারদাদেবী বলতে একটা আট-ন'ফুট সিঁদুর মাখানো পাথরের স্তম্ভ। কোন মূর্তি নেই। দেবীর পূবদিকের ঘরটা পুরোহিতের। পূজারী মনোময়কে একা থাকতে ছেড়ে দিয়েছে। উত্তরদিকের ঘরে কতকগুলো শিবলিঙ্গ। শঙ্করাচার্য যখন কাশ্মীরে আসেন, ওই ঘরে নাকি সাধনা করতেন। জায়গাটা বেশ মানারম। পবিত্র পরিবেশ।

এই পরিবেশ কথাবার্তায় মনোময় বিষাক্ত করে তুলেছে। দেবীর কাছে দেবী-আহ্বান শুরু হয়েছে। তিনজন পূজারী গলায়-গলা মিলিয়ে সুরে আহ্বান-মন্ত্র পাঠ করছে।—আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।...মৃদু বাতাসে ভেসে আসছে কানে। বড় মধুর লাগছে।

মনোময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত। ফের সচেতন হয়েই কানে বিষ ঢালতে শুরু করল।

বলল, আমার কাণ্ডকারখানা বাড়ির কেউ জানতে পারে নি। সকালে দেখেছে শুধু অঞ্জনদা নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। প্রাণহীন দেহ শক্ত কাঠ, বরফের মতন ঠাণ্ডা।

যে ক'দিন বাড়িতে ছিলুম, দম আটকে-আটকে যেত। তিষ্ঠোতে পারলুম না আর। রাতের অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম।

পাগলের মতন ঘুরেছি বনে-জঙ্গলে, হিমালয়ের গুহায় গুহায়। এমন একজনকে খুঁজে পাই নি যে, নিজের কথা বলে, মনের বোঝাটা কিছু হালকা করি। ঘুরছি তো ঘুরছিই। মানুষ আর মেলে না। কে-ই বা মুক্তি দেবে আমায়।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল। আত্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে। হরিপাহাড়ের ওপর। দুর্গের ভেতর কালো পাথরের নিখুঁত গড়নের আঠারো হাতের মহালক্ষ্মীমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। চোখ ফেরাতে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আত্মানন্দ। মুখে মৃদু হাসি। পাকা চুল পাকা দাড়িগোঁফ। গলা থেকে পা অবধি সাদা ধবধবে ভেড়ার লোমের আলখাল্লা। পায়েও লোমের জুতো। চোখে দিব্যজ্যোতি। যেন ওই আলোতে আমার ভেতর-বার দেখছে। খানিক দেখার পর হাতের ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

ন্যাসপাতিতলায় এসে বসল। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমিও বসলুম সামনে ওর আঙুলের ইঙ্গিতে। আমায় বলতে হলো না কিছু। নিজেই গড় গড় করে বলে যেতে লাগল আমার সমস্ত।

—তুই যে অপরাধ করেছিস, কোন ক্ষমা-ঘেন্না নেই। যে খুনী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত।

আমি বললুম, তা ই দাও। আমি মরতে চাই, কিন্তু মরতে পারছি না। আত্মঘাতী হতে গিয়েও ভয়ে পালিয়ে এসেছি। একে তো যে অপরাধ করেছি তার চারা নেই, দণ্ডে দণ্ডে মরছি বেঁচে থেকেও—তার ওপর অপঘাত মৃত্যু—এক পাপ থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে দ্বিগুণ পাপে জড়িয়ে পড়ার ভয়।

আত্মানন্দ বলল, তোর মৃত্যুর ব্যবস্থা, তোর মুক্তির ব্যবস্থা করছি আমি।

অনেক কথা বোঝাল আমায় আত্মানন্দ।

দেহের সমস্ত প্রবৃত্তি-ইন্দ্রিয়-রিপু থেকে মনকে সরিয়ে রাখতে না পারলে কোন প্রকার নিষ্কৃতি নেই। নিজের কাছ থেকেই নিজের মুক্তি আদায় করে নিতে হয়। নিজে মুক্ত হলে, তবেই না নরক-যন্ত্রণা থেকে রেহাই। মুক্ত হলে, তখন পরমশান্তি। নতুন জীবন। যে জীবন কলঙ্কমুক্ত অন্যায়মুক্ত অনুশোচনামুক্ত।

আত্মানন্দ শেখাল আমায় যোগতত্ত্ব। বলল, শব্দ তেজ জল বায়ু পৃথিবী সব নিয়ে তুমি পুরো মানুষ। এই ক'টি বস্তুর সঙ্গে তোমার নাড়ীর যোগ।...

সত্যিই আমি অনুভব করলুম আত্মানন্দের কথামতন তন্ত্রের যোগসাধনায়।

মেরুদণ্ডের নিচে মূলাধারচক্রের হলুদ রঙের 'লং' বীজ (পৃথিবীতত্ত্ব) ওপরে উঠছে বাঁ নাকে (ইড়ানাড়িতে) নিঃশ্বাস টানার সময়। তলপেটের নিচে এসে থামল। স্বাধিষ্ঠান চক্রে। এখানে রূপোর মতন জ্বল জ্বল করছে সাদা 'বং' বীজ (জলতত্ত্ব)। হলুদ 'লং' সাদা 'বং'-এ মিশে গেল।

'বং' উঠছে ওপরে। নাভির কাছ বরাবর মণিপুরচক্রে এসে থামল। লাল রং-বীজে (তেজতত্ত্বে) মিশে গেল। ওপরে উঠছে 'রং'। বাঁ বুকের কাছে এসে থামল। অনাহতচক্রে। ধোয়াটে 'বং'-বীজে (বায়ুতত্ত্বে) মিলিয়ে গেল।

'যং' উঠছে ওপরে। কণ্ঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাদা 'হং' বীজে (শব্দতত্ত্বে) অদৃশ্য হয়ে গেল। বিশুদ্ধচক্রে। 'হং' উঠছে ওপরে। উঠল তালুতে লালনাচক্রে। তারপর এলো ভুরুর মাঝখানে আজ্ঞাচক্রে। তারপর গেল আজ্ঞাচক্রের বিপরীত দিকে মাথার পেছনে (মনশ্চক্রে)। সেখানে লাল রঙের লং-বীজে মিশে গেল। 'লং' উঠল ওপরে সোমচক্রে। আরো ওপরে—নানা রঙের সহস্রারচক্রে—মাথায়। মহাশূন্যতত্ত্ব বা আকাশতত্ত্ব যেখানে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন এখানে। মহাশূন্য পুরুষ শক্তি। প্রকৃতি স্ত্রী শক্তি। প্রকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি লং-বীজের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে নানা বীজের রূপ নিয়ে ওপরে সহস্রারের শুভ্রজ্যোতি-বিন্দুতে মিলিয়ে গেল।

ডান নাকে (পিঙ্গলানাড়িতে) নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় সহস্রারের শুভ্রজ্যোতিতে ভেসে উঠল লাল রঙের 'লং' বীজ আবার। নামতে শুরু করল

ধীরে ধীরে। ওঠার সময় যেমন এক এক বীজের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে রঙ বদল করছিল, নামার সময়ও ঠিক সেই সেই চক্রে সেই সেই বীজের সঙ্গে মিশে রঙ পরিবর্তন করতে লাগল। সব শেষে মূলাধারচক্রে এসে আবার আগেকার লাল রঙের 'লং'-বীজ হয়ে উঠল।

যোগসাধনায় অভিজ্ঞ আত্মানন্দ এ ক্রিয়ার সঙ্গে আরো অন্য ক্রিয়া করতে উপদেশ দিয়েছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল, শিখিয়ে দিয়েছিল হাতে-কলমে তার ক্রিয়াপদ্ধতি। বলেছে, এসব জিনিস শুনে-পড়ে শেখার নয়। কাছে বসে দেখিয়ে দেয়ার। শিখে নেয়ার।

আত্মানন্দ যা যা বলেছে—সমস্ত শিরোধার্য করেছি আমি। দিনের পর দিন অভ্যেস করেছি। ভুলেছি অতীতের পাপবোধ। দূর হয়ে গেছে দুঃসহ যন্ত্রণা। মুছে গেছে মন থেকে—আমি খুনী।

খুন আমি করিনি অঞ্জনদাকে। মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত বলে,বলেছিলুম, এর চেয়ে মরে গেলে ভালো হত তবু। কাকতালীয়র মতন কথাটা ফলে গেছল। নেশায় টর হয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে যায় উঠোনে।

প্রচণ্ড চোট লেগেছিল মুখে মাথায়-ঘাড়ে। মদই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল অঞ্জনদাকে। এখন যা বুঝছি, দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের সামনে, তখন তা বুঝিনি। ভেবেছিলুম, আমার কথাটা লেগেছে খুব। অপমানের প্রতিশোধ নিল এইভাবে। আত্মঘাতী হয়ে। এ মৃত্যুর কারণ আমি, খুনী আমি।

আজ আমি সুস্থ স্বাভাবিক। আমি জীবন্মুক্ত। আর কোন কথা না কয়ে মনোময় সাধনা শুরু করল আবার। যা দেখে মনোময়কে প্রশ্ন করেছিলুম আমি—কেন এমন দেখলুম—এতক্ষণ আমার দেখার উত্তর দিয়ে গেল মনোময়—আবার সেই সব দৃশ্য দেখছি আমি।

আশ্চর্য, মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছি না—এমনই ওর মানসিক ক্রিয়ার প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছি আমি। আমি দেখছি, নিচে থেকে একটা হলুদ আলো—খুব ছোট্ট। ওপরে উঠছে। সাদা লাল ধোঁয়াটে কত রঙই না ধরছে নামা-ওঠার সময়।
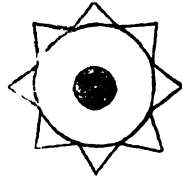
গুহার ভেতর নজর পড়তেই, চোখ বুজে ফেললুম। যে দৃশ্য দেখলুম, তা দেখা যায় না, দেখা উচিতও না।

যে লাল আলখাল্লা লাল টুপি পরা তিব্বতীটি সঙ্গ নিয়েছিল নাছোড়বান্দা হয়ে, ফিরে তাকালুম তার দিকে। শয়তান আর কাকে বলে। ছোট-ছোট আধবোজা চোখ দুটো কৌতুকের হাসিতে টইটম্বুর। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। গোড়া থেকেই কেমন কেমন লাগছিল ওকে। সন্দেহ ঘন হয়ে উঠল আরো। পরদেশে জানাশোনা নেই, কেমন করে উদ্ধার হব ওর হাত থেকে? এক সাজানো বিপদমুক্ত করার অছিলায় সত্যি সত্যিই আসল বিপদের মাঝখানে টেনে নিয়ে এসেছে এবার।

এখানে আসার আগে জেরাঙে যখন আসি, অবিশ্যি আমারও দোষ ছিল, শতজনের নিষেধ উপেক্ষা করে গোঁয়ের বশেই একা আসি, তখন ডাকাতদের হাতে পড়ে প্রাণ খোয়াতে বসেছিলুম। তলোয়ারের মতো ধারালো অস্ত্র আর বন্দুক নিয়ে ওরা আমায় আক্রমণ করে। আমাকে কপর্দকশূন্য করেও, মেরে ফেলার কেন উদ্যোগ করছিল, বুঝতে পারি নি।

জায়গাটায় যতদূর চোখ যায়, লোকবসতি লক্ষ্য পড়ল না। চিৎকার করে কোন লাভ হবে না, শূন্যে সাহায্য চাওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, সেই শূন্য থেকেই এই তিব্বতী লোকটির আবির্ভাব হলো হঠাৎ। জাদুর মানুষ যেন। অন্তত ওই সময় ওই রকমই মনে হয়েছে আমার।

লোকটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর কি যেন কি বলে উঠল। ভাষা আমি না বুঝলেও মন্ত্রের মতন কাজ করল। উদ্যত অস্ত্র বুক-মাথার ওপর থেকে মুহূর্তে সরে গেল। ওরা মাথা নিচু করে যে যেদিক দিয়ে পারল, ছুটে পালাল। চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য।

আমি স্তম্ভিত, আমি হতবাক। দাঁড়িয়ে আছি বরফের ওপর। বরফজমা মূর্তি একখানা। কাছে এলো তিব্বতী। ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে জানাল সঙ্গে যেতে চায়। মানস সরোবরের পথে সে-ও যাচ্ছে। রাক্ষসতালের—রাবণহ্রদের কাছাকাছি অবধি যাবে। ওই পর্যন্ত গেলেই যথেষ্ট। আর তেমন ভয়ের কারণ নেই। রাস্তাঘাটে তীর্থযাত্রীদের দর্শন মিলবে অনেক।

আমার যা হওয়ার তো হয়েই গেল। মরার পরে আর হরিনাম শুনিয়ে লাভ কি? বলেছি, সঙ্গীর প্রয়োজন নেই আর। হেসেছে শুধু। পাশে পাশে চলেছে, সঙ্গ ছাড়ে নি, আমার ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরে নি।

সংশয়ের দোলা দুলেছে আমার মনে। এ লোক ডাকাতদলের সর্দার হলেও হতে পারে। পাছে ডাকাতির কথা কাউকে বলে দিই, যাত্রীরা সতর্ক হয়ে চললে ওদের রুজি-রোজগারের ক্ষতি, তা-ই এই পাহারা। এদের অপকীর্তি জঙপঙের —শাসনকর্তার কানে যদি বাতাসে ভেসে পৌঁছে যায়, সেটাও একটা কারণ।

কানে বাজছে তিব্বতীর হাসি। বেশ জোরে জোরেই হাসছে আর বলছে, আমাদের এদেশে মেয়েরা একটা মজার গান গায়। গানটা তোমার বেলায় খাটছে দেখছি। মানস সরোবরে চান করলে দেহের ময়লা যায়, কিন্তু মনের ময়লা যায় না। তুমি অবিশ্যি চান কর নি এখনো, তোমার করলে কি হবে, জানি না। তবে এখানে এসেছ যখন, কিছু পরিষ্কার থাকা উচিত ছিল, তা-ও নেই দেখছি। চোখ বুজে—অত শুচিবায়ুগ্রস্ত কেন?

যতটা সম্ভব সতর্ক হলুম। কে জানে কি ফ্যাসাদ ঘটায় কি বদনাম রটায়। তক্ষুণি মনে হলো, কাছে কানাকড়ি নেই। কি উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য—একেবারে প্রমাণ লোপ। আমি যা বলব—সত্যি হলেও ঘুণাক্ষরে কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথার একবর্ণও। এখানে কেউ দেখলে—চিৎকার করে যদি লোক জড়ো করে সবাইকে চিনিয়ে দেয় আমায়—এই গুহায় ছিলুম, তাহলে তো চক্ষুস্থির। এদেশে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না কোথাও, কারো কাছে। আলো-আঁধারি গুহার পরিবেশ বিচ্ছিরি। স্তরে স্তরে জঘন্য নোংরামোয় ভরা।

তিব্বতীর গলায় অট্টহাসি। বলল, নোংরামোয় ভরা ভাবছ কেন? সাধে কি ভরে ওঠে মানুষের মন নোংরামোয়?

কথাটায় সপাং করে চাবুকের আঘাত খেলুম আমি। চোখ খুলে তাকালুম। গুহার ভেতর নয়, তিব্বতীর দিকে। ওর দৃষ্টি তীব্র-তীক্ষ্ণ। মুখের হাসি মিলিয়েছে। মুখখানা কঠিন। বলল, নলনের দিকে তাকাও না একবার। এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আর কাউকে দেখতে বলছি না, শুধু মাঝখানের লোকটিকে।

নলন অনেক জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে দেশত্যাগী হয়েছে। গার্বিয়াঙ থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তা না-হলে খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডে ইহলোক ছেড়ে পরলোকে ভূত-প্রেত হয়ে বেড়াতে হতো হয়তো।

রামবঙ—ওদের গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষের আসর জমানোর ঘর। রোজ সন্ধ্যেয় অবিবাহিত মেয়ে-ছেলেরা হাসি-মস্করায় মাতামাতি করে ওখানে। বিয়ের পূর্বরাগটা—পরস্পরের পছন্দ করাকরি—ওখানেই সারা হয়। ওখান থেকেই চারচোখের মিলনে নলনের বন্ধুবান্ধবের শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে গেল এক এক করে। বাকি রইল কেবল নলন একা। অপরাধ—দেখতে কুৎসিত। আর ট্যাঁকেরও জোর নেই তেমন। ব্যবসায় মাথা মোটা, তাই লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে নি বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করে।

মেয়েদের অবহেলা আর প্রত্যাখ্যান ক্রমে বিদ্রোহী করে তুলেছে ওকে। যে-কোন নারী-পুরুষকে একসঙ্গে দেখলেই পাগলের মতন ক্ষেপে উঠত। যাকে বলে, পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধানো—তুমুল বাকবিতণ্ডায় নারী-পুরুষে সে সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন না করে তৃপ্তি পেত না।

এই সাময়িক তৃপ্তি মারাত্মক আকার ধারণ করল একদিন। মারপিটে জয়ী হলো নলন, কিন্তু অপরটি প্রাণ খোয়াল।

তিব্বতে এসে দেখেছে নলন—সন্ন্যাসীদের রাজ-ঐশ্বর্য। শিষ্য-শিষ্যারা শ্রীচরণ ধরে পড়ে রয়েছে। এদের আশ্রয় নিলে, রমণী আর রত্ন অনায়াসে মিলবে তার।

মনে ছলকপট আর বাইরে গদ-গদ ভক্তি দেখিয়ে সন্ন্যাসী গোনপেরির শরণাগত হয়েছে। সেখানে লতাসাধনার কথা শুনতে শুনতে লোক্যাতুন সম্ভারামের তান্ত্রিক দেবতা সম্বর আর তার শক্তির যুগলমূর্তি ভেসে উঠত চোখে।

কিছুদিন থাকার পর গোনপেরির আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেছে নলন। একটা গুহা বেছে নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে বসে পড়েছে। লতাসাধনার দীক্ষা শুরু করে দিয়েছে সর্বসাধারণের মধ্যে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার রাজ্য গড়ে তুলল গুহার ভেতর। এমনিতেই নারী-পুরুষের পরস্পরের দুর্বার আকর্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচানো দুঃসাধ্য, তার ওপর সাধনায় দোষের কিছু নয় বলে, দুর্বলচিত্তের লোকের মনে আকর্ষণের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে লাগল নলন আরো।

কথা কানাকানি হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল দেশময়। কর্ণগোচর হলো শাসন-কর্তা জঙপঙের। আগুনের মতন জ্বলে উঠল জঙপঙ। দেশের সর্বনাশ, সমাজের সর্বনাশ, সমস্ত লোকের সর্বনাশ করছে নলন। নলনকে হটাতে হবে। দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নয়, দুনিয়া থেকে সরিয়ে। এ লোক বেঁচে থাকলে,

যেখানে যাবে, সেখানের আকাশ-বাতাস-মাটি বিষাক্ত করে তুলবে। একে জ্যান্ত ছেড়ে দিলে, মহাপাপের ভাগী হতে হবে। চমরীর চামড়ায় নলনকে মাথা থেকে পা অবধি সেলাই করে নদীর জলে ফেলে দেয়ার আদেশ দিল জঙপঙ।

নলন আশ্রয় নিল আবার সন্ন্যাসী গোনপেরির আশ্রমে। গোনপেরিকে শ্রদ্ধা করে জঙপঙ। গোনপেরিই একমাত্র লোক, যে এ যাত্রা দণ্ড মুকুব করিয়ে দিতে পারে জঙপঙকে বলে-কয়ে।

অমন শান্ত স্নেহমমতায় ভরা গোনপেরির দুর্বাসা মূর্তি দেখে বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল নলনের। গোনপেরি বলল, তুমি জঙপঙের দণ্ড থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু আমাদের দণ্ড থেকে আর মুক্তি নেই তোমার। বড্ড পালিয়ে গেছলে।

এতখানি বলে, আদেশের সুরে তিব্বতী বলল আমায়, গোনপেরি কি সাজা দিয়েছে জানো? তুমিই বা জানবে কেমন করে? ভালো করে ছাখো! আমার মুখের দিকে নয়, গুহার ভেতর। চোখ থাকলে দেখতে পাবে, কান থাকলে শুনতে পাবে।"

আমি সম্মোহিতের মতন তিব্বতীর কথা অনুসরণ করলুম। অর্থাৎ গুহার ভেতর তাকালুম বড় বড় চোখ করে।

যে মানুষটি বসে আছে, এক চিলতে কাপড় কেন, একটা সুতোও অঙ্গে নেই। ওর মুখোমুখি যে স্ত্রীলোক বসে, তারও তা-ই অবস্থা।

আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমি।

মানুষটির সর্বাঙ্গের মাংস ঝুলে পড়ছে। খসে পড়ছে। স্ত্রীলোকটিরও। দু'জনেরই ধীরে ধীরে হাড় বেরিয়ে পড়ল। মট মট করে হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। পুরুষের জায়গায় একটা শব্দ উঠছে—ঐং। শিব-বীজ। স্ত্রীলোকটির জায়গায় হ্রীং। শক্তিবীজ। দুটি মন্ত্রশব্দ নিচে থেকে ওপর অবধি উঠল। তারপর দুটি শব্দের অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন। হ্রীং শব্দ আছড়ে পড়ল মানুষটির জায়গায়, আর ঐং স্ত্রীলোকটির জায়গায়। যেন দুটি শব্দ দুটি জায়গায় আত্মসমর্পণ করছে পুজোর অর্ঘ্য হিসেবে।

দুটি শব্দই একসঙ্গে থেমে গেল। একটি মুহূর্ত কেবল। এবার একসঙ্গে হচ্ছে। মধ্যিখানে—পাশাপাশি। থেমে গেল। আমি বিস্মিত। আবার দেখছি, একটি নারী একটি পুরুষ বসে। এসব কি ভেল্কি নাকি?

তিব্বতীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনলুম। বলছে, ভেল্কি নয়। যা দেখলে, যা

শুনলে—সত্যি। যা দেখছ—তা-ও সত্যি। যেটা দেখলে, শুনলে—ওটা লতা-সাধনার গুপ্ত ধ্যান-ধারণা। স্ত্রী-পুরুষের মিলন পুজো আর একাত্মা হয়ে যাওয়া ওই ভাবে। দৈহিক মিলনে নয়। গোনপেরি এই ধ্যান দিয়েছিল নলনকে আর তার সঙ্গিনী সাধিকাকে। ওরা দুজনে এ সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিল। আমার আমিকে জেনেছিল। সে আমি পুরুষ নারী, স্থুল-শরীর সূক্ষ্মশরীর শব্দমন্ত্র! আবার পুরুষ আর নারীর উর্ধ্বে অদৃশ্য নিস্তব্ধ। এই আমিই তোমার আমার—জগদব্রহ্মাণ্ডের সবার আমি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিব্বতী বলল, যাদের দেখছ—এরা নেই। প্রাণ নেই, দেহটা আছে স্রেফ। একদিন বরফ বৃষ্টিতে গুহার মুখে বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। বরফ কেটে দেখা হলো যখন, তখন ঠিক এই অবস্থায় দেখা গেল ওদের। ঠাণ্ডার দেশ। ঠাণ্ডায় একটু শুকনো দেখালেও, এখনো প্রতি অঙ্গটি অবিকৃত। আমি নিত্য আসি ওদের পুজো করতে। এই আমার কৈলাস। এরাই আমার হরপার্বতী।

মহাশয়ের নামটা জানতে পারি কি? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, সুযোগ না দিয়ে তিব্বতী গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। নলনের দেহের আড়ালে [illegible] আমার চোখের আড়ালে ধ্যানে বসল।